তৃতীয় বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৮। [প্রথম সংখ্যা।

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ কার্য্যালয়

২৮।১ সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা /১০ পয়সা।

রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস

৪৪ খানি অত্যুৎকৃষ্ট হাফটোন ছবি ও ম্যাপ সহ, বহুমূল্য স্বদেশী য়্যান্টিক কাগজে অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত প্রকাণ্ড পুস্তক। অল্প মৎস্যভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপানিগণ, কি অপূর্ব্ব রণকৌশল ও বিজ্ঞানবলে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধিপতি ও ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান শক্তি রুষদিগকে প্রতিযুদ্ধে জলে ও স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে সার্পনেল, হাইআক্সেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যে সকল অতি ভীষণ গোলা আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার দ্বারা পোর্ট আথার প্রভৃতি মহাদুর্ভেদ্য দুর্গ সমূহ কি প্রকারে বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহা মনোমুগ্ধকর ফটোচিত্রের দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ যেন রুষ-জাপান যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত—অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাপানিগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান;—ইহা কত কৌতূহলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ড ১।০, একত্রে দুই খণ্ড লইলে ২॥০ টাকা।

মণিপুরের ইতিহাস

সুন্দর বাঁধাই ২য় সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা।

১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ প্রায় ৩৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মণিপুর—চিরস্বাধীন দেশ—কি প্রকারে ইংরাজ অধিকারে আসিল—কীর্ত্তিচন্দ্রাদি আর্য্য রাজগণের শাসন পালন ব্যবস্থা—নাগা কুকি প্রভৃতি জাতিগণের রহস্যপূর্ণ বিবরণ, অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, লোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের বৃত্তান্ত, বিচার, রাজনীতির গূঢ় রহস্যাদি, সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে।

মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কালকাতা।

কুশদহ

স্থানীয়

মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

সন ১৩১৮ সাল

তৃতীয় বর্ষ।



কুশদহ কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম এক টাকা।

কুশদহের তৃতীয় বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহর নিয়মাবলী

কুশদহ প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়; ১০ই তারিখের মধ্যেও কাগজ না পাইলে এবং যথা সময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দিলে অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। অমনোনীত প্রবন্ধের কারণ দর্শান এবং কাপী ফেরত দেওয়া যায় না। বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলেও সকল সংখ্যা লইয়া পূর্ণ বৎসরের গ্রাহক হইতে হইবে।

কুশদহ সংক্রান্ত চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি মনিঅর্ডার ও বিনিময়ের পত্রিকাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে ২৮।১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতা পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন—এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের জন্য মাসিক একপৃষ্ঠা ২৲ টাকা, আধপৃষ্ঠা ১৲, তাহার কম হইলে ৸০ আনা। কভারের পৃষ্ঠায়, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিন্তু পরিবর্ত্তিত বিষয় পূর্ব্ব মাসের ২০শের মধ্যে লিখিতে হইবে।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হয়ে,
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। বৈশাখ, ১৩১৮। ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা সঙ্গীত

ভৈরবী-বিভাস।—একতালা।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে।

নববর্ষ

জগতে নূতন কিছুই নাই, সকলই পুরাতন। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যে গাছ ফুলে ফলে সুশোভিত, বীজ রেখে সে অন্তর্হত হয়। এক যায় আবার আসে, তার মূলে একই পরমাণুর ক্রিয়া মাত্র. এ কথা আগে জ্ঞান-শাস্ত্রেছিল। তার পর যখন ভক্তি শাস্ত্র এলেন, তিনি বল্লেন, কেবল পুরাতন নিয়ে আমার দিন চলে না। আরো কিছু নূতন চাই। নূতন চোখ চাই, নূতন মন চাই, নূতন জীবন চাই। প্রতিক্ষণে বিশ্বময় যে নূতন দৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে তা দেখ্‌তে হবে। একি কেবল ভাবের কথা? না, সত্য।

এ জীবনে কতবার পড়ে গেলাম, নিরাশা এলো, অবিশ্বাস এলো, অন্ধকারে পড়লাম, আবার কোথা হ'তে নূতন বল এলো নূতন ভাব এলো, তাই নব-জীবন লাভ করা সম্ভব হো'ল। সেই একই অনাদি-অনন্ত-অপরিবর্ত্তনীয় মহামহিমান্বিত পরম-পুরুষ পরমেশ্বরই তো এ জগতে নিত্য অভিব্যক্ত হ'চ্চেন। জড়ে প্রকাশ হ'চ্চেন, চেতনে হ'চ্চেন। তবে কেন আমরা তা নবীন চোখে নূতন ভাবে দেখব না? এখন যেমন করে তাঁকে পেলাম এর চেয়ে আবার কত বেশী করে! নিকট করে! সরস করে তাঁকে পেতে চাই। প্রতিদিনের জীবন কি নূতন সমাচার দেবেনা? নূতন হ'তে নূতনতর, নূতনতম তাঁর বাণী কি শুন্‌ব না? তা না হ'লে কি সেই একই পুরাতন নিয়ে এ সুদীর্ঘ জীবনপথে চলা যায়? দুদিনে যদি জগতটা সমস্ত পুরাতন হ'য়ে যায়, জীবন নীরস হ'য়ে যায়, তা হ'লে তো মৃত্যু এসে গেল। ইহ জগতের যে টুকু জীবন তাই কি শেষ? তাতো নয়। পরজীবনে আরো সূক্ষ্ম জগত আছে, কত রকমের নূতন জীবন আছে, অনন্ত উন্নতি আছে।

এই যে আজ নববর্ষ, আজকার দিন কেমন নব জীবনের সমাচার দিচ্চে। "নববর্ষ" এই শব্দ কেমন একটা নূতন ভাব এনে দিচ্চে। আজ যেন সেই চির নূতন প্রেমময়ের পূজা করিতে পারি। যিনি আমাদের কাছে নিত্য নূতন অন্নজল, নূতন স্বাস্থ্য এবং নূতন জ্ঞান বুদ্ধি পাঠাচ্ছেন, আমরা তাঁর কাছে নবজীবন লাভের জন্য, নব উৎসাহে সেবার জন্য,—যেন বল ভিক্ষা করিতে পারি। আজ আমাদের জীবন যেন নূতন হ'য়ে যায়। নববিধানবাদী।

বিবিধ মন্তব্য

(বিগত কয়েক মাসের 'কুশদহ' বাহির না হওয়ায় তৎ সাময়িক ঘটনার প্রতি কয়েকটি মন্তব্য রহিল।)

বেলুড় মঠে মেলা—বিগত ২১শে ফাল্গুন বেলুড় মঠে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের অষ্টসপ্ততিতম জন্মোৎসব হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তথায় যে মেলা হয় তাহাতে প্রতিবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা একদিকে অবশ্য আনন্দের বিষয়, কেননা ইনিও বর্ত্তমান যুগের একজন প্রেরিত মহাপুরুষ। যাঁহারা সমাজ সংস্কার মূলক ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত, তাঁহারা তবুও "হিন্দুসাধক" "ভক্ত" বা "যুগাবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব" এই ভাবেও তাঁহাতে আস্থাবান্। কিন্তু তাঁহার সাধিত ধর্ম্ম, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত "হিন্দুধর্ম্ম" কে কি রকমে বুঝিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এই জন্য আর এক দিকে মেলা ক্ষেত্রে কেবল লোকের ভিড় দেখিয়াই তৃপ্ত হইবার বিষয় নহে। মহাত্মা-দিগের আবির্ভাব, ও তিরোভাব উপলক্ষে কত স্থানে মেলা হয়, তাহাতেও বহুলোকের ভিড় হয় কিন্তু উত্তর কালে মূলভাবের গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা চলিয়া গিয়াছে।

জাতীয় নামের পরিবর্ত্তন—বিগত ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ সর্ব্বত্র লোক সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। এবার এই তালিকায় অনেকে আপন আপন জাতীয় প্রচলিত নামের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে সচেষ্ট। সাধারণ মানুষ মাত্রেই সকল বিষয়ে আগে সহজ পথটাই অন্বেষণ করে। কিন্তু প্রকৃতির গঠন এমনই যে বিনা সাধনে—বিনা পরিশ্রমে, কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই আমরা বলি যাঁহারা আপন আপন শ্রেণীর উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক, তাঁহারা কি এতটুকু ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে উন্নতির বিঘ্নকর যে সকল বিষয় সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে, কেবল ভাল নাম লইয়া অধিক কি লাভ হইবে? কাজে এবং গুণে যে জাতি বড় হয় তাহাকে চিরদিন পড়িয়া থাকিতে হয় না।

বিফল প্রযত্ন—হিন্দু সমাজের মধ্যে কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি, ইচ্ছা, ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বঙ্গের সাহাজাতি 'বৈশ্য' বর্ণে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়া কাশীর হিন্দু সমাজ দ্বারা বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। কোন কোন সংবাদ পত্রে এইরূপ প্রকাশ যে, অর্থব্যয় করিয়া কাশীর পণ্ডিতের দ্বারা তাঁহারা যে শাস্ত্র সঙ্গত "বৈশ্য" এইরূপ প্রমাণ লেখাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কি জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পন্থা? শুনিতে পাওয়া যায় এ বিষয়ে নাকি নমঃশূদ্র দিগের চেষ্টা প্রশংসনীয়; তাঁহারা আগেই সমাজে একটা বড় স্থান লাভের জন্য তত ব্যস্ত নহেন কিন্তু সমাজ সংস্কারে যত্নদূর সচেষ্ট।

বিবাহ বিধি—১৮৭২ সালের ৩ আইন কি, যাঁহারা সবিশেষ অবগত নহেন তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজের পৌত্তলিকতা শূন্য অসবর্ণ বিবাহ যখন হিন্দু সমাজ অনুমোদিত উত্তরাধিকারীত্বে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা দাড়াইল, তখন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগত অনুষ্ঠানকে নিরাপদ করিতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ করেন। আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্রগণ এই আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে এক প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন যে, "আমরা যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নহি, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের জন্য আমাদের বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক।" তখন গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট পৃথক আইন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঐ আইনের একটি ধারায় এই কথা যুক্ত করিলেন "যাহারা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করে না তাহাদের জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হইল।"

বিবাহ বিধি সংশোধন—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৩ আইনের আপত্তি জনক ধারাটি বদলাইবার আকাঙ্ক্ষায় সংশোধন প্রস্তাব করিয়া এক পাণ্ডুলিপি বড়লাট সভায় পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি কোন ধর্ম্ম মানিনা" এই কথাটি আইন হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক। কেননা এমন অনেকে আছেন যে তাঁহারা হিন্দুর অনেক আচার মানিয়া চলেন, এবং

হিন্দুসমাজের উন্নতিকামী, তাঁহারা "হিন্দু" বলিয়া লিখিবেন না কেন? যিনি যে ধর্ম্ম শিখাইতে চাহেন তিনি তাহা শিখাইবার অধিকার পাউন।" বস্তুত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন অনেক পরীক্ষা সহ্য করিয়া আইন পাশ করাইয়াছিলেন, তখন সমাজের এরূপ অবস্থা ছিল না। এতদিনে সকল সমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতেই এখন ঐ ধারা বদলাইবার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সহযোগী 'বঙ্গবাসী' বিগত ২৭শে ফাল্গুনের কাগজে দুই কলম এক প্রবন্ধে তাঁহার চির অভ্যস্থ সংকীর্ণভাবের আবেষ্টনে ভূপেন্দ্র বাবুকে এবং সহযোগীর মতে যাহারা 'অহিন্দু' তাহাদের প্রতি যাহাতে সাধারণের ভেদ ভাব জন্মায় এমত ভাবে ও ভাষায় সমালোচনা করিয়া "হে ইংরাজরাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। সহযোগী কি মনে করেন, হাতের আড়ালে সূর্য্যের প্রকাশ ঢাকিয়া রাখিবেন?

সমাজ সংস্কারের আন্দোলন—আজকাল সমাজ সংগঠনে এবং সংরক্ষণে মহা আন্দোলন চলিয়াছে। বস্তুত কোন্ স্মরণাতীতকালে মানব সমাজ গঠন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কে জানে? যাহা জানা যায় তাহাতে ভাঙা আর গড়ার কাজই দেখা যায়। ভাঙা গড়া সৃষ্টির কাজ। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পঞ্চাশ ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হিন্দুসমাজের মধ্যে যে জীবন্ত সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহা সমস্ত দেশে প্রবিষ্ট হইয়া দিন দিন সমাজের আকার বদলাইয়া যাইতেছে। একদল লোক সমস্ত ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান, আর একদল ঠিক যেখানকার সেইখানেই সমাজকে টানিয়া রাখিতে চান। নব্য শিক্ষিত বিকৃতমস্তিষ্ক দিগের উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করাই তাঁহাদের চেষ্টা। সংস্কার আসে সংশোধনের জন্য অর্থাৎ ভাঙা কিনা গড়িবার জন্য। যতটুকুই হউক কিছু ভেঙে যে কিছু গড়িয়াছে, তাকে অস্বীকার করিয়া রক্ষণশীলদল বলিতেছেন ও কিছুই নয়, ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সংস্কারের মধ্যে রক্ষণশীলতার যে কিছু প্রয়োজন নাই, কাজ নাই, তা নয়, ভাঙা গড়ার মধ্যে ঐ যে বাধা পায়, তার দ্বারাই গঠন, সামঞ্জস্যের দিকে যায়। কিন্তু দলের মধ্যে বিদ্বেষ পোষণকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। সময়োপযোগী সমাজের আকার পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রাচীনের জীবনগত যেটা উচ্চ ধর্ম্মভাব এ দেশে আছে, তাহার বিশেষত্বে

লক্ষ্য রাখা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পত্রান্তর হইতে নিম্নে তদ্রূপ একটু আভাস দেওয়া গেল,—

"এখনকার লোকে জানে জগতে যত প্রকার জীব আছে তন্মধ্যে মনুষ্য জাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমি এক জাতীয় জীবের অস্তিত্ব অবগত আছি, তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্য অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ। সেই সকল জীব দেব যোনিতে জাত বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মনুষ্য সেই জাতীয় জীবের সাহায্য পাইলে সেই আগন্তুক সাহায্যকে 'দৈববল' বলিয়া থাকে। একথা কেবল কাগজ কলমগত নহে। এখনও এদেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা দেব জাতির সন্ধান রাখেন।"

(ত্রিশূল, ২রা চৈত্র। " ব্রাহ্মণ সভার উচ্চাঙ্গ।")

ভৌতিক গল্পের ফল—আজকাল বাংলা সাহিত্যে, কি পুস্তকে কি মাসিকে, এমন কি সাপ্তাহিক পত্রেও অনেক ভৌতিক গল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। ঘটনা সত্য হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা জন সমাজে ভূতের ভয়টা সত্য সত্যই জন্মিয়া থাকে। অসংখ্য লোক জীবনে কথনো "ভয়ানক ভূত" দেখিল না, অথচ তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে না পারিয়া মহাভীরুতা পোষণ করে, আর এমন মহাসত্য যে ভগবান্ তাঁহার অস্তিত্বে পরিস্কার বিশ্বাস করিয়া ভবভয় ত্যাগ করিতে পারে না। হায় রে মানব জীবন ! ! একদিকে যেমন মিথ্যা বস্তুর বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পার না, অন্য দিকে তেমন সত্য বস্তুতেও স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না।

অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম

অনেকে বলেন 'হিন্দুধর্ম্মই জগতের আদি ধর্ম্ম; আর আর যত ধর্ম্ম সকলই তাহার পরে হইয়াছে। এমন কি হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে যে সকল বৈদেশিক ধর্ম্ম আছে তাহাও হিন্দুধর্ম্মের ছায়া মাত্র। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং সার সত্য সনাতন ধর্ম্ম। জগতে কত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, ক্রমে তাহার পতনও হইল কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কেহ কিছুই করিতে পারে নাই, চিরদিন অক্ষয়রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত কথাগুলির সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বেদ তাহার সাক্ষী। কিন্তু বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম জিনিষটা কি? তাহা কি দেশ কালে বদ্ধ? হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ কি কোন এক কালেই শেষ হইয়া গিয়াছে? তাহার সমস্ত পূর্ণতা কি একদেশেই হইয়া গিয়াছে, এখন আর কোন উন্নতির বা সংস্কারের প্রয়োজন নাই! কাহার কাহার হয়ত এরূপ ধারণা থাকিতে পারে যে, নিত্য সনাতনধর্ম্ম যাহা. তাহা এককালেই প্রকাশ পায়, কিন্তু নিত্য নিত্য তাহা জন্মায় না। যাহা পরিবর্ত্তশীল, তাহা বাহিরের বিষয়, তাহাতে মূল ধর্ম্মের কিছু আসে যায় না। যুগভেদে সত্যধর্ম্ম কখন প্রকাশ পায় কখন কখন আপন স্বরূপে লুক্কাইত থাকে। ইহা ব্যক্তিগত জীবনেও হয়, এবং দেশে কালে সমাজগত ভাবেও হয়।

বিজ্ঞ সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্মের দুইটি দিক আছে, একটি অন্তরঙ্গ বা অধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিক, আর এক বাহিরঙ্গ বা অনুষ্ঠানের দিক। প্রথমত জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মানবাত্মার কোন কোন সত্যের জ্ঞান আদিকালে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে এখনও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই,—যেমন ঈশ্বর জ্ঞানময় চৈতন্য স্বরূপ এই সত্য উপনিষদ্‌-যুগে প্রকাশিত হইয়া তাহার সাধন প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর শান্ত, দাস্য সখ্যাদি ভাবগুলি যাহা ভগবানের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ বাচক—যাহা অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক বিষয়, তাহা এক কালে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব ইহা সত্য যে, ধর্ম্ম বিকাশের কোন কালে শেষ নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল এমন সাক্ষ্য দেয় না যে ধর্ম্ম একই অবস্থায় চির দিন ছিল বা থাকিবে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরই কেবল অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহার শক্তি ও ভাব মানবাত্মায়, যাহা ক্রমবিকাশ হইতেছে তাহারই নাম ধর্ম্ম, সে বিকাশ বা ধর্ম্মের শেষ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেন তাঁহারাই এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধ কল্পনা করেন। এবং আপন আপন কল্পিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্য সেইরূপ বিরোধ ভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম্মই কোন ধর্ম্মকে ছাড়িয়া উৎপন্ন হয় নাই। বিশ্বব্যাপী একই ধর্ম্ম-ধারা যুগে যুগে দেশে

দেশে প্রবাহিত হইতেছে, এবং যখনই ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী সময়ে আবার নূতন ভাবে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার সংস্কার সাধন এবং অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আদিধর্ম্ম হইলেও যুগে যুগে তাহা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া সামঞ্জস্যের দিকেই আসিয়াছে। সাময়িক নূতন সংস্কারের সঙ্গে যে পুরাতনের বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা ক্রমে সন্ধি স্থাপনের নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ নব সংস্কার পুরাতনকে উন্নতির দিকে—সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন হিন্দুধর্ম্ম হইতে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাঁহারা ভুল করেন। পুরাতন হিন্দুধর্ম্মকে সংস্কার করিয়া দেশ কালের উপযোগী আকার দিতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিলে এ কথা অতি সহজেই স্বীকার করিতে পারা যায় যে, যে সময় হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল তখনই দেশীয় লোকের মধ্যেই ধর্ম্ম এবং সামাজের সংস্কার উপস্থিত হইয়া সমাজ ও সংসারমুখীন ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতরণ হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের মূল ইংরাজী শিক্ষা ও শাসন প্রণালী, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনকে যথাস্থানে স্থাপিত রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ধর্ম্মের আবেষ্টনে এই নব সংস্কার জাতীয় ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম হয় তাহার জন্য যে বিধান, তাহা কি বিধাতার করুণা নহে। অবশ্য হিন্দু সমাজও যে আপনার কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে মানবীয় ভ্রম ভ্রান্তি স্বত্বেও একটা সার্থকতা সাধন করিতেছে। বিস্তৃত হিন্দু সমাজকে নব আকার দান করিয়া দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহাতে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজই যদি থাকিয়া যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? নামে কি আসে যায়? অতএব ধর্ম্ম আধুনিক হইলেই যে তাহা প্রাচীন হইতে অশ্রেষ্ঠ তাহা সত্য নহে। প্রাচীনকে ছাড়িয়া নবীনের কখন উদয়ই হইতে পারে না, পূর্ব্বের সহিত পরের সম্পূর্ণ যোগ থাকে। নূতন, পুরাতনেরই ক্রমবিকাশ মাত্র। অথবা আদিকে মেঘমুক্ত করিয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে, আদি হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নবীনের উদয় নয় কি?

বাসনা

তব　　প্রেম মাঝে এ হিয়া হারিয়ে যাক্
আর যেন কভু নাহি উঠে প্রভু,
চিরতরে ডুবে থাক্।
হ'য়ে যাক্ এই নয়ন অন্ধ,
হউক এ মোর শ্রবণ বন্ধ,
যেন　　বাহিরের কিছু দেখিতে না পাই,—
না শুনি কাহারো ডাক্।
ঘুচে যাক্ সব অনুভূতি মোর,
যাক্　　'আমি' ও 'আমার' এই মোহ-ঘোর,
প্রাণ-মাঝে শুধু বাজুক্ গোপনে
তব আরতির শাঁখ্।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

কুশদহ বৃত্তান্ত (১১)

ইতিপূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা দেওয়ানজী বংশাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পৌত্রাদিগণ কলিকাতায় ভবানীপুরে অদ্যাপি বসবাস করিতেছেন। সুতরাং ঐ বংশের অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইল ;—

স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভবানীপুরের বাড়ীতে অবস্থিতি কালীন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করেন। এবং "তত্ত্বানুসন্ধান" নামক বেদান্ত বিষয়ক একখানি ও "শিবোদয়" নামক আর একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে বিতরণ করেন। তাৎকালীন পণ্ডিত সমাজে তাহা প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিনি শেষ জীবনে কাশীবাস করিয়া তথায় দেহত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথও চল্লিশ বৎসর ওকালতি কর্ম্মে সসম্মানে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর কালে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে করিতে কাশীধামেই ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনিও "গায়ত্র্যাপরমোপাসনা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে বিতরণ করেন।

চন্দ্রনাথের ছয় পুত্র :—সারদাপ্রসাদ, বরদাপ্রসাদ, জ্ঞানদাপ্রসাদ, অন্নদা প্রসাদ, কুলদাপ্রসাদ, ও ক্ষীরোদাপ্রসাদ।

জ্যেষ্ঠ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলিপুর জজ আদালতের সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে পেন্‌সান্ লইয়া কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মানুরাগী, সরল, শান্তপ্রকৃতি সম্পন্ন। ইহার দুই পুত্র :— উপেন্দ্র ও মনীন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ কাশীতেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা কার্য্য করেন, কনিষ্ঠ মনীন্দ্রনাথ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে চট্টগ্রাম হাইস্কুলের ২য় শিক্ষকের পদে থাকিয়া বি, এল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উপেন্দ্র, মনীন্দ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মধ্যম বরদাপ্রসাদ পিতৃপদানুসরণ করিয়া আলিপুর জজ আদালতে যশের সহিত ওকালতি কার্য্যান্তে এক্ষণে ইনিও সপরিবারে কাশীবাস করিতেছেন। ইঁহার এক পুত্র প্রমথনাথ স্বাধীনভাবে ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

তৃতীয় জ্ঞানদাপ্রসাদ ভবানীপুরের বাড়ীতে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়াদি দেখেন। ইঁহার তিন পুত্র :—সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। মধ্যম নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কলিকাতা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের Financial (আয় ব্যয়) বিভাগে কর্ম্ম করেন, (ইঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিবরণে কিছু উল্লিখিত হইয়াছে) কনিষ্ঠ দেবেন্দ্র নাথ কলিকাতায় General Post Office (জেনারল্ পোষ্টাফিষে) কর্ম্ম করেন।

চতুর্থ অন্নদাপ্রসাদ আলিপুর জজ আদালতে ওকালতিতে অল্পকাল মধ্যেই যশস্বী হইয়া ডায়মণ্ড হারবারে সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুকাল বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটে এসিষ্ট্যাণ্ট শিগল মেম্বার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং সরলহৃদয়, উদারচেতা ও অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ইনি প্রৌঢ়াবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার তিন পুত্র :—হরিপ্রসন্ন,

কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। জ্যেষ্ঠ হরিপ্রসন্ন কণ্ট্রাক্টরি কর্ম্ম করেন, মধ্যম কালীপ্রসন্ন সরকারী তারবিভাগে কর্ম্ম করেন, কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী পরলোকগত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

পঞ্চম পুত্র কুলদাপ্রসন্ন বাতব্যাধি রোগে কিছুকাল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়া মধ্য বয়সে পরলোক গমন করেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ ক্ষীরোদাপ্রসাদ মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাক্তার রূপে নানাস্থানে কর্ম্ম করেন। তৎকালে বেঙ্গল টেক্সট বুক কমিটির অনুমোদিত ডাঃ প্লেফেয়ার (Dr, Playfair) সাহেবের "মিড্‌ওয়াইফারি" (Midwifery) নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ তাঁহার "ধাত্রীবিদ্যা" পুস্তকখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পান এবং পুস্তকখানি মেডিকেল স্কুল সমূহের পাঠ্য পুস্তক হয়। ডাঃ বর্ণিও (Dr Burneyeo r) সাহেবের "ক্লিনিক্যাল মেডিসিন (Clinical medicine) পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "চিকিৎসা সন্দর্ভ" নামে যে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে চিকিৎসা বিদ্যার্থীগণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইনি কিছুদিন পরে সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অধুনা বর্দ্ধমান রাজবাটীর চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন।

ক্ষীরোদ বাবু অতি নিরীহ, সজ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ঈশ্বরারাধনায় এবং শাস্ত্রানুশীলনে ইঁহার বেশ অনুরাগ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ ইনি "শিবপুরাণ সংহিতা" নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবু "থিওসফিকাল্ সোসাইটি" এবং আরও দুইটী আধ্যাত্মিক সভার সভ্য। ইঁহার তিন পুত্র :—বীরেশ্বর, আশুতোষ ও হরেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ বীরেশ্বর লক্ষ্ণৌতে ও, এণ্ড আর রেলওয়ে ম্যানেজার আপিষে কর্ম্ম করিতেছেন। আশুতোষের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় উপস্থিত পিতৃসন্নিধানেই থাকেন। কনিষ্ঠ হরেন্দ্রের এখনও পাঠাবস্থা।

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।)

পরলোকগত

রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

এই বিশ্বছবিতেই যে ভগবানের প্রকাশ, বা এ সংসার যে তাঁহার লীলাক্ষেত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? তন্মধ্যে মানব জীবনে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহা আরো পরিস্ফুট। প্রত্যেক জীবনেই তাঁহার মহিমা আছে। মানবের পক্ষে মানব জীবন-চরিত বিশেষ শিক্ষনায় বিষয়। যিনি যতটা তাহা দেখেন, বুঝেন, তিনি ততই ধন্য হন।

আজ আমরা যে জীবনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, বিগত আশ্বিনের 'কুশদহতে' তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পত্রস্থ করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছি "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিত্রতাপূর্ণ, অনেক শিক্ষনীয় বিষয় তাহার মধ্যে আছে।" বিশেষতঃ তাহাতে ভগবানের করুণা দর্শন করাই প্রধান স্বার্থকতা; ভগবান ঐ বিষয়ে আমাদিগকে শুভ দৃষ্টি-শক্তি দান করুন।

রাখালচন্দ্রের পিতা, ফটীকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস, বনগ্রামের নিকট চাল্‌কি গ্রামে ছিল। জানি না, কি কারণে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা যখন ৮।৯ বৎসরের, এবং একমাত্র পুত্র রাখালচন্দ্র যখন কয়েক মাসের মাত্র, তখন তিনি বয়সে প্রায় প্রাচীন হইয়াছিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা গ্রামে উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। এ অবস্থায় শিশুর লালন পালনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে কিরূপ নিরুপায় অবস্থায় পড়িলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কন্যার শ্বশ্রূ আলয় বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক তিনি শিশু পুত্রটিকে লইয়া গোবরডাঙ্গায় আসিলেন। গোবরডাঙ্গা গ্রামের তখন জাজ্বল্যমান অবস্থা, কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, এত বড় ব্রাহ্মণ পল্লীর মধ্যে কেহই এই শিশুর প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন না। যখন নিরাশায় কষ্টে স্বষ্টে ফটীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন গুলি কাটিতে লাগিল, তখন সহসা রামতারণ কুণ্ডুর মাতা ঠাকুরাণী স্নেহপরবশা হইয়া শিশুর ভার লইতে

চাহিলেন। ফটীকচন্দ্রও স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাঁহার হাতে শিশু পুত্রটিকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ক্রমে যখন রাখালচন্দ্র একটু বড় হইতে লাগিলেন, কাজেই তখন তাহাকে অন্ন প্রদান করা আবশ্যক হইল। ব্রাহ্মণ তনয়কে কিরূপে শূদ্রের অন্ন দেওয়া হইবে এই চিন্তা বৃদ্ধার মনে হওয়ায় তিনি ফটীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন এই কথা অনেকেই বলিলেন যে "বালককে অন্ন দেওয়ায় দোষ নাই, 'উপনয়ন' হইলে আর অন্ন দেওয়া হইবে না।" যাহা হউক এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, আর এক অবস্থার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ পিতা, এবং রামতারণের শোকে অসহায়ের আশ্রয় দায়িনী বৃদ্ধা জননী, একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জানি না তখন বালক রাখালচন্দ্রের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক তখন রামতারণের স্ত্রী "পূণ্যবৌ" রাখালচন্দ্রের আশ্রয় দায়িনী রহিলেন।

বলা বাহুল্য যে রাখালচন্দ্রের লেখা পড়া যাহা কিছু গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আরম্ভ এবং শেষ হইয়াছিল। কেন না, ইংরাজী স্কুলে পড়া তখন ঐ পল্লীগ্রামে তেমন সাধারণ হয় নাই। বিশেষতঃ রাখাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের শিক্ষার জন্য যে কেহ কিছু ভাবিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন, অল্প বয়সেই লেখা পড়া শেষ করিয়া রাখালচন্দ্রের পক্ষে কিছু অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও যেন তাঁহার পক্ষে কোন ক্লেশ সাধ্য ব্যাপার হয় নাই।

সুবিখ্যাত হারাণচন্দ্র কুণ্ডুর বাটীর পার্শ্বে রামতারণ কুণ্ডুর বাটী, অথবা "পূণ্যবৌ" পরিবারের মধ্যে গণ্য। বলিয়াই হউক হারাণকুণ্ডুর বাটীতে অবাধে রাখালচন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হারাণচন্দ্রের অন্তে যখন একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তখন দপ্তরখানায় শিক্ষানবিশী মুহুরী, হইতে ক্রমে খাজাঞ্চির কাজে স্থায়ী কর্ম্মচারী হইয়া তৎপরে গিরিশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার সহকারী হইতে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা রাখালচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। এমন কি ঐরূপ সম্পর্কে তিনি বাড়ীর সকলের নিকট সম্বোধিত হইতেন।

তৎপরে যখন গিরিশ বাবু বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে কলিকাতায় যাতায়াত এবং সময় সময় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কতকগুলি ভদ্র বেশধারী কপটভাষী অসৎ লোকের সংসর্গে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু অত্যন্ত সরল বিশ্বাসী দয়ালু ছিলেন, যে যাহা বলিত তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তদ্ভিন্ন স্বইচ্ছায় অনেক অনিয়মিত দানাদি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করাতে মূলধন পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতে লাগিল। যে গিরিশ বাবু ইতিপূর্ব্বে সুরাপায়ীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে এবং সংসর্গ দোষে তাঁহাতেও সেই দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিল। রাখালচন্দ্রও সকল বিষয়ে তাঁহার সহকারী, সুতরাং তিনিও ঐ দোষে লিপ্ত হইলেন। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজ মুখে শ্রুত আছি, এবং অন্য কারণেও জানি যে, গিরিশ বাবুর সম্পর্কীয় ভ্রাতা যদুনাথ কুণ্ডু এই দুষ্কার্য্যের পথ প্রদর্শক। যাহা হউক এইরূপে যখন গিরিশ বাবুর শোচনীয় অবস্থা হইতে লাগিল তখন তাহার শেষ অভিনয় দর্শন করিবার পূর্ব্বে রাখালচন্দ্র আশ্রয়, উপজীবিকা এবং আত্মীয়তা প্রভৃতির সকল মায়া কাটাইয়া এই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১২৭৫ সালের শেষ কিম্বা ৭৬ সালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। তখন অনুমান রাখাল বন্দোপাধ্যায়ের বয়স ২২।২৩ বৎসরের বেশী হইবে না। রাখালচন্দ্র তদ্রূপ শিক্ষা সংসর্গের মধ্যে থাকিয়াও স্বভাবত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন।

এই অবস্থার পর তিনি চিনিপটী আসিয়া সুবিখ্যাত, সুদক্ষ ব্যবসায়ী দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের বিস্তৃত চিনির আড়তে মুহুরীআনা কাজে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বিচক্ষণ মুহুরী মধুসূদন ঘোষালের সমকক্ষ হওয়ায় শীঘ্রই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। (আগামী বারে সমাপ্য।)

স্থানীয় সংবাদ

সৎদৃষ্টান্ত—কুশদহবাসী তাম্বুলী সমাজে, সৎদৃষ্টান্ত মূলক একটি বিবাহ সংবাদ আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি। বালকের বয়স ১৯।২০ বৎসর, বালিকার বয়স ১০ বৎসর। ছেলেটি এফে পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেছে। এই বিবাহ সম্বন্ধে পাত্রের পিতা বলেন আমি পণ

কিছুই চাই না কিন্তু বিবাহের পরে মেয়েটিকে কলিকাতা মহিলা-শিল্প স্কুলে লেখা পড়া ও শিল্প শিক্ষার জন্য ৩ বৎসর প্রেরণ করিতে হইবে. এদিকে ছেলেও ৩ বৎসরে ডাক্তারী পাস করিয়া তাহার পরে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিবে। বলা বাহুল্য বিবাহের পর বালিকার পিতা কন্যাকে উক্ত স্কুলে প্রেরণ করিতেছেন। তাম্বুলী সমাজের পক্ষে ইহা যথেষ্ট সৎদৃষ্টান্তের কথা। বালকের পিতা উক্ত সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি সুতরাং অন্যান্য ও তাঁহার সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে সমাজের অনেকটা উন্নতি হইতে পারে।

খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়—সম্প্রতি আমরা খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০টি উপস্থিত দেখিলাম। প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্তই অধিকাংশের পাঠ্য। যাহা হউক এই স্কুলের বয়স এখনো একবৎসর হয় নাই, সুতরাং এখন ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। তবে স্কুলটির পর পর যাহাতে উন্নতি হয়. সকলে তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বালিকার শিক্ষা, শিক্ষয়িত্রী দ্বারা হওয়াই সঙ্গত। অগত্যা এমন শিক্ষক আবশ্যক. যিনি মেয়েদের প্রকৃতি বুঝেন।

বিবাদ নিষ্পত্তি—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এতদিন পর্য্যন্ত বনগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার, গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোবরডাঙ্গার জমীদার রায় বাহাদুর গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের জন্য মোকর্দ্দমা—বহুদিন হইল এক অদ্বিতীয় নিরাকার, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয় বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, মাতুলের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে অনেক অর্থব্যয় করেন। ১৩০০ সালে লক্ষ্মণ বাবু পরলোক গমন কালে ক্ষেত্র বাবুকে তাঁহার জমিদারী প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু কয়েক বৎসর মাত্র কার্য্য চালাইয়া, নানা অসুবিধা বশতঃ একজিকিউটার সিপ্ ছাড়িয়া দেন। ইতি-পূর্ব্বে লক্ষ্মণ বাবু ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে পিতৃস্মৃতি-মন্দির, "মঙ্গলালয়" নামক এক

বাড়ী দেশহিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী "মঙ্গলালয়" এবং ব্রহ্মমন্দিরাদি সমস্তই স্বামীর সম্পত্তি জ্ঞানে তাহা আপন অধিকারে স্থাপন করেন। তাহার পর এ পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলাইতে কোন যত্ন করিলেন না, এবং আপোষে ক্ষেত্রবাবুকে ব্রহ্ম-মন্দির ছাড়িয়া দিবার চেষ্টায় ক্ষেত্রবাবু বিফল প্রযত্ন হইয়া সম্প্রতি তিনি ব্রহ্মমন্দির প্রাপ্তির জন্য আলিপুর কোর্টে লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রী ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু আদালত জানিত করিয়া কিম্বা শালীস নিষ্পত্তি ব্যতিত মন্দির গ্রহণ করিতে সাহস করেন না। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এ ঘটনায় দুঃখিত, তাই এখনো আমরা বলি, মোকর্দ্দমায় অনর্থক অর্থব্যয় না করিয়া আপোষে এই বিষয় নিষ্পত্তি হইলে ভাল হইত।

প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা

মাসিক পত্র।

নব্যভারত—আমরা কুশদহর বিনিময়ে প্রায় প্রথম হইতে "নব্যভারত" প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত নব্যভারতের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন নব্যভারতের অষ্টাবিংশ বর্ষ শেষ হইল। এ সুদীর্ঘ কালে বহু চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা সুলেখকগণের লেখায় সত্যই "নব্যভারত" নামের সফলতা লাভ করিয়াছে। উদার ভাবে বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনার পথ প্রদর্শনে দেবী বাবু অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সত্য প্রকাশের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে তাঁহার সুহৃদবর্গের বা সমাজের নিকটেও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবে তাঁহার সমালোচনার মাত্রা কখনো কখনো অধিক হইয়া পড়ে। বিগত পৌষ ও মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অসাধারণত্ব" প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। যাহা হউক নব্যভারতের প্রবন্ধ গৌরব আজোও আধুনিক প্রকাশিত অনেক উচ্চ অঙ্গের মাসিকের তুলনায় অক্ষুণ্ণই আছে। নব্যভারত ২১০।৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

তৃতীয় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৴১০ পয়সা।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ | ২য় সংখ্যা

গান

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি বলে'।
সারা দিনটা করে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী যে যার মত, গিয়েছে চলে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।

৺রজনীকান্ত সেন।

বিবিধ মন্তব্য

জন সংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য—বিগত ১০ বৎসরে পূর্ব্ব বাংলার জন সংখ্যা শতকরা ১১·৪, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩·৮ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, "পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের সামাজিক নিয়মে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারও অধিক।" এ কথা সত্য হইলেও আমাদের মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ কার্য্য-

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ | ২য় সংখ্যা

গান

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি বলে'।
সারা দিনটা করে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী যে যার মত, গিয়েছে চলে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।

৺রজনীকান্ত সেন।

বিবিধ মন্তব্য

জন সংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য—বিগত ১০ বৎসরে পূর্ব্ব বাংলার জন সংখ্যা শতকরা ১১·৪, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩·৮ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, "পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের সামাজিক নিয়মে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারও অধিক।" এ কথা সত্য হইলেও আমাদের মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ কার্য্য-

কারিতায় অত্যন্ত উদ্যমশীল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে যেমন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, তেমনি উদ্যমবিহীন, অলস ও বিলাসীর সংখ্যাই অধিক। কত ধনশালী প্রাচীন বংশ এখন অবসন্ন-হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্যমশীলতা জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধক, আর উদ্যমবিহীন জীবন মৃতকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলত মানবের জীবনী-শক্তি যে কেবল বাহিরের অন্ন-জলেই বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, মানসিক শক্তিও জীবনী শক্তির সহায়।

বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। যে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। একত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা কেবল মাত্র ৬ জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও কত কম। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে এই প্রতি-যোগিতার দিনে অশিক্ষিত লোকের দ্বারা সকল কার্য্য সুচারুরূপে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে,—কুসংস্কার দুর করিতে হইলে, শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কুসংস্কার বশত কুচিকিৎসায় শত শত লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয় তাহার প্রতিবিধানার্থেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। সমস্ত সভ্যদেশেই অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা ব্যতীত কখনই সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। তাই দেখা যাইতেছে এ দেশেও এই বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

মিঃ গোখলে ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিল—বিগত ১৬ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল মিঃ গোখলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক বিল উপস্থিত করেন। এই বিলের মর্ম্ম এই যে, মিউনিসিপালিটি কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া স্থান বিশেষে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রচলিত করিতে পারিবেন। ৬ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণের স্কুলে যাইতে হইবে। বালিকাগণের প্রতিও পরে এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। স্থল বিশেষে কমিটী এই আবশ্যকতা হইতেও কাহাকেও নিস্কৃতি দিতে পারিবেন। যে ছাত্রের অভিভাবকের মাসিক আয় ১০৲ টাকার কম তাহাকে বেতন দিতে হইবে না। অন্যের বেতন সম্বন্ধেও কমিটী বিবেচনা

করিতে পারিবেন ইত্যাদি। —তিনি এই বিল পেশ করিয়া বক্তৃতার মধ্যে বলেন,—"আমার রচিত এই বিলের উদ্দেশ্য এই যে, ক্রমে এই দেশে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। সমস্ত সভ্য দেশেই গভর্ণমেণ্ট জন সাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা প্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন। লোকের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করা এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে; মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করা,— তাহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" এই বিল সম্বন্ধে আমাদিগের একান্ত সহানুভূতি আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা।—বর্ত্তমান সময়ে কোনো কোনো কাগজ পত্রের লেখায় এবং গ্রন্থের ভাষায় দেখা যায় আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন যেন ঠিক হইতেছে না। আমাদের মতি গতি কেমন এক বিকৃত-ভাবে গড়িয়া যাইতেছে, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। কোনো দোষের উল্লেখ করিতে গেলেই যেন আগে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষই তার মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। আচ্ছা আমরা জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আপনারা (যাঁহারা কথায় কথায় শিক্ষিত শ্রেণীকে "বাবু" বলিয়া উপহাস করেন) বলিতে চান যে, ইংরাজী শিক্ষায় এদেশের অপকারই হইয়াছে? আমাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না? আমাদের যাহা ছিল তাহাই ভাল ছিল? অতএব "হে পাশ্চাত্য শিক্ষা! তুমি আর আমাদের মধ্যে আসিয়ো না, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।" আমরা বলি এখনো আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই আমাদের এই অবস্থা, পূর্ণতা লাভ করিলে আবার আমরা ঠিক আমরাই হইব।—তবে তাহার আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন নাই।—স্ত্রী শিক্ষা বলিলে এখানে বালিকা হইতে মহিলার বিদ্যাশিক্ষাই বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত, বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষার উপায় নাই। যেহেতু বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষায় সম্প্রদায় গত মতভেদ আছে। সরকারি স্কুল কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষা হইতেই পারে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রের জন্য বে-সরকারি স্কুল কলেজেও বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আসল কথা, বালক বালিকার ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান নিজ গৃহে; যদি পরিবারটি ধর্ম্ম পরিবার হয়, পিতা মাতার ধর্ম্মভাব থাকে, তবে তাহাদের পুত্র কন্যাতেও ধর্ম্মভাব সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি

পরিবার ধর্ম্মভাব শূন্য, কেবল সাংসারিকতায় পূর্ণ হয়, তবে 'বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-শূন্য শিক্ষাই যত অনিষ্টের মূল' কেবল একথা বলিলে চলিবে কেন? ফলত স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা এবং সাধারণ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এখন কি স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বালকের পক্ষে যেমন তাহা সম্ভব নহে, বালিকার পক্ষেও ঠিক তাহাই। কিন্তু সহযোগী "বঙ্গবাসী" বলেন, (২রা বৈশাখের "বজেট বিদ্যা" প্রবন্ধে) "গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন কি সে বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে? কলিকাতায় বেথুন স্কুলে কি সে বিদ্যার ব্যবস্থা দেখিতে পাই? পড়া বিদ্যা না থাকিলেও আমাদের রমণীরা আদর্শে ও উপদেশে ধর্ম্ম শিক্ষার আদর্শ ছিলেন। * * * ভূপেন্দ্রনাথ সহরে বেথুন বিদ্যালয়ের মতন আরও কয়েকটি বিদ্যালয় বসাইতে চাহেন। এই সংকল্পে তিনি সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় একথা তুলিয়াছিলেন। "এক পাগলে রক্ষা নাই তিন পাগলের মেলা"। ভূপেন্দ্রনাথ ইহাকে সমাজ মঙ্গল-প্রদ বলিয়া মনে করিতে পারেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার আনন্দ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের ইহাতেই তো ভয় ও বিস্ময়। অধুনা স্কুল কলেজে পুরুষের কি উচ্চ, কি নিম্ন, কোন শিক্ষায়ই তো ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, রমণীরই বা কোন্ শিক্ষায় সে ব্যবস্থা আছে? এরূপ অবস্থায় বেথুন বিদ্যালয় বৃদ্ধির প্রস্তাবে যদি আমাদের আশঙ্কা হয় তাহা হইলে কি অস্বাভাবিক হইবে?" আমরা বলি না—না অস্বাভাবিক হইবে কেন? স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে যে ভয়ানক অস্বাভাবিক হইবে?

সহযোগী ও টীকাকারের কুরুচি।—মাতৃজাতি, স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান সূচক ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করা, আমরা অত্যন্ত অপরাধের বিষয় মনে করি। কোনো ভদ্রলোকের এরূপ করা উচিত নহে। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, কোনো কোনো সম্পাদক বা লেখক এরূপ কুরুচির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। সহজে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, তবে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে অপরাধ নীরবে সহ্য করাও উচিত নহে। সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রকাশিত "ত্রিশূল" পত্রের ৯ই চৈত্রের "বিরাট মহিলা সভা" প্রবন্ধে ও ২৩শে চৈত্রের ঐরূপ আর এক প্রবন্ধে এবং ৩০শে চৈত্রের সংকলিত সংবাদে

টীকাকারের মন্তব্যের প্রথমেই মহিলাগণের প্রতি যেরূপ বিদ্রূপপূর্ণ ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত টীকাকার যে নিতান্ত তরলমতি ও অসারচিত্ত তাহা বেশ বুঝা যায়। বস্তুত এরূপ লেখা দ্বারা "ত্রিশূল" যে জন সমাজের অনিষ্টই করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা সহযোগীকে সাবধান ও সংযত হইতে অনুরোধ করি, তিনি তাহা শুনিবেন কি? 'ত্রিশূল' পত্র হিন্দু সমাজের নামে পরিচিত, হিন্দু সমাজ কি এতই অপদার্থ হইয়াছেন যে অক্লেশে স্ত্রীজাতির অবমাননা সহ্য করিতেছেন? হা ধিক্!

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ

এ বিশ্ব সংসার প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন-সম্ভূত বস্তু মাত্র। মানবগণ ইহার একতরের আরাধনায় নিমগ্ন। কেহ বা চিৎস্বরূপ পুরুষের আরাধনায় অন্তর্জাগতিক বৃত্তি গুলির প্রকৃষ্টতা সাধন করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শোভাময়ী প্রকৃতির আরাধনায় অন্তর্জগতে উপস্থিত হইতে যত্নবান হন। এবম্বিধ উপাসনায় অন্তর্জাগতিক উপাসকদিগের বহির্বৃত্তি সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। তাহাতে তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত হয়। কারণ প্রকৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞানোন্মেষ অসম্ভব। বাহ্য প্রকৃতির প্রকৃত উপাসনা মানব মণ্ডলীকে অন্তর্জগতে লইয়া গিয়া তাহাদিগের আত্মকলুষ নষ্ট না করিলে অন্তর্জাগতিক চিৎপদার্থের সত্বা অনুভব করিতে পারা যায় না। কারণ আবিলতাময় হৃদয়ে ভগবানের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। নিরাকারের আকৃতি সাকারেই প্রতিবিম্বিত হয়—নিরাকারের পূর্ণ জ্ঞান সাকারোপাসনা হইতেই উদ্ভূত হয়—সেইজন্যই মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী দেবীর আবাহন, সেই জন্যই কর্ম্মের দ্বারা মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্ব বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের আসনোপযোগী করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ হৃদয়কেও বহির্জাগতিক উপাসনা বা প্রকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া আবিলতাহীন করিতে হয়, তাহা হইলেই অন্তর্জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে বাহ্যাড়ম্বর নিষ্ফল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বহির্জগতের উপাসনা প্রবঞ্চনা মিশ্রিত হইয়াছে। অনেকে অপরিপক্ক হৃদয়কে পরিপক্ক রূপে প্রমাণিত করিতে যাইয়া বহুবিধ স্বভাব-তত্ত্বাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মন তৎসম্বন্ধে যতই অজ্ঞান থাকুক না কেন, তবুও তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। "নীহারমালা বিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি-সংবেষ্টিত-উপত্যকাভূমি-মধ্যস্থ-মৃদু-বীচি বিকম্পিত-সরোবরাদি পরিশোভিনী-কমলিনী বসন্তানীল-সন্তাড়িত হইয়া হেলিতেছে—দুলিতেছে। তুষারমণ্ডিত মহিধর-শীর্ষে নবোদিত-ভাস্করের ভাস্বর কিরণ নিপতিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" এইরূপ শ্রুতিসুখকর অভ্যস্ত ছন্দোবন্ধে অনেকেই পাঠকের মনপ্রাণ হরণ করিয়া নিজকে বহির্জাগতিক উপাসক রূপে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিতে চান। কিন্তু কয়জনের হৃদয় সেই মধু-মাসের মৃদু সমীরণ তুল্য ভাবানিলাঘাতে প্রকম্পিত হয়? কয়জনের হৃদয় পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি ভাস্কর-করতুল্য দীপ্তিশালী মহৎ গুণ সমূহে আলোকিত হয়? সুতরাং উক্তরূপ ভাষা-বিন্যাস তাহাদের বহির্জাগতিক উপাসনার প্রতারণা মাত্র। ফলত বহির্জগতের উপাসনার সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সংযোজিত হইয়া বহিঃপ্রেমেই মত্ত থাকে। ভাব বা ভাষার প্রতি তখন উপাসকের লক্ষ্য থাকে না। তখন তাহার ভাষা ও ভাব নীরবতা মাখান হয়। মন নীরব-প্রেমে মত্ত হইতে থাকে—তাহার কবিত্ব তখন অপরিস্ফুট এবং নীরব হইয়া যায়, অর্থাৎ সুচারু শব্দ বিন্যাসের সময় তখন আর থাকে না। বস্তুত যাহারা আজকাল বহির্জগতের উপাসনার ভান করিয়া থাকেন তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হয় না। তাহারা আত্মকলুষতা এবং বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন মাত্র এবং আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাহাদিগের অন্তরে এক প্রকার অসম্ভব কল্পনা বদ্ধমূল হয়। বহির্জগতের উপাসনায় ভাবের উৎপত্তি স্বাভাবিক, কাহারও বা সেই ভাব স্বার্থের তরঙ্গে ভাসমান হইয়া স্বকীয় জীবন-পথে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আত্মকলুষতার সৃজন করে; আর কাহারো বা সেই ভাব মহাভাবে লীন হইয়া অন্তর্জগতে বা চিন্ময় পুরুষোদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। বহির্জাগতিক উপাসনায় এত আত্মকলুষতা, এত প্রবঞ্চনা আছে বলিয়াই উহা আমাদিগকে এতদূর অবনতি-মার্গে স্থাপিত করিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে আধুনিক শিক্ষার সহিত পূর্ব্বতন কালের সেই তন্ময়তা, সেই নিস্বার্থপরতা, সেই বিশ্বপ্রেমের জ্বলন্ত আদর্শের প্রয়োজন। বহির্জগতের উপাসনা ব্যতীত ঐ সমস্ত লাভ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শারদীয় সুনির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া যখন কৌমুদী রাশি

বর্ষণ করিতে থাকে, তখন দর্শকের মন ও বাহ্য প্রকৃতির যে কার্য্যারম্ভ হয় তাহাই তন্ময়তা। জড়জগতের সেই শোভা অন্তরেন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। এইরূপে যখন অন্তরেন্দ্রিয় সমূহ পরিমার্জ্জিত হয় তখন তাহা সেই মনোরম শোভাতে চিন্ময়ীশক্তির ও অপূর্ব্ব শিক্ষার মাহাত্ম্য, প্রীতি, ভক্তি ও প্রেম প্রণালীর দ্বারা বহির্গত করিয়া দেয়। তবে উপাসনার তারতম্য হেতু সকলে সেই শোভা, সেই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। একজন হয়ত সেই শারদীয় চাঁদিনার ঢল-ঢল ভাব দেখিয়া এক প্রকার অমানুষিক শিক্ষা এবং স্বর্গীয় প্রীতি ও ঈশ্বরের সেই উজ্জ্বল বিশ্ব-বিকশিত মোহন মূর্ত্তির আস্বাদ গ্রহণ করিল; —আর একজন হয়ত তাহাতে শিক্ষার বা আস্বাদের কোনো উপাদানই খুঁজিয়া পাইল না। কেহবা বিরহাতুর প্রাণে শারদীয় শোভাকে দুঃখময়ী বলিয়া কল্পনা করে; অপর কেহ বা সেই শোভা দেখিয়া স্বকীয় অভিষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হইল ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে,—উপাসনায় তন্ময়তা জন্মিলে শরৎকালীন শশধরের উদয়াস্ত দেখিয়া সুদর্শন নীতিচক্র চালিত অনন্ত বিশ্বের আদি অন্ত উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বস্তুত বহির্জগৎ অন্তর্জগতের পথ প্রদর্শক—বহির্জাগতিক উপাসনায় পূর্ণ জ্ঞান না জন্মিলে অন্তর্জাগতিক চিন্মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।

পক্ষান্তরে অন্তর্জাগতিক উপাসকগণের অনেকেই এমন কি বহির্জগতের সত্ত্বা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন। যদিও বা স্বীকার করেন তবুও বলেন আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিকে, মানসিক ও বাহ্য ভাবে, সূক্ষ্মে ও স্থূলে যত প্রভেদ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে তত প্রভেদ। তাঁহারা আধ্যাত্মিকের উপাসক, মানসিক বৃত্তির উন্নতি সাধন করাই তাঁহাদিগের লক্ষ্য, সূক্ষ্ম বিষয়েই তাঁহাদিগের আলোচ্য। তাঁহারা আধিভূত চাহেন না, বাহ্যভাব চাহেন না, তাঁহারা স্থূল চাহেন না। কিন্তু স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না অর্থাৎ বহির্জগৎ না পাইলে অন্তর্জগৎ পাওয়া যায় না।

বস্তুত বহির্জগৎ আমাদের গুরু, অন্তর্জগৎ আমাদের লক্ষ্য, অন্তর্জগৎ শান্তির শীতল ছায়া, বহির্জগৎ তাহার পথ-প্রদর্শক। অন্তর্জগতে মুক্ত প্রেম, বহির্জগতে প্রেমোন্মেষ। বহির্জগৎ আমাদিগকে অহরহ বুঝাইতেছে প্রকৃত শিক্ষাই আনন্দলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্তর্জগৎ কেবল আনন্দময়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দান

(১)

যখন কনভেন্টে পড়িতে যাইতাম. সেখানকার সুসংযত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থিত শিক্ষাদান আমার বালিকা-হৃদয়কেও বিস্মিত করিয়াছিল। সেখানকার সেই উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনি-মধ্যে যেন আর একখানি জগৎ, আমাদের বাহিরের ধূলি-রৌদ্র-মলিন ঝঞ্ঝাবাত্যা-পীড়িত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রশান্ত শান্তি ও অচ্ছেদ্য প্রেমের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী যাঁহারা তাঁহারা যেন সে শান্তিরাজ্যের দেবতা। এমন নিঃস্বার্থ, পবিত্র, উৎসর্গিত-জীবন জগতে অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের ঘরেও এসব পুণ্য প্রতিমার আবির্ভাব আছে, কিন্তু তাঁহাদের উদারতা ও উৎসর্গ এমন বিশ্বব্যাপী হইতে সুযোগ ও সাহায্য পায়না তাই তাহা সীমাবদ্ধ।

আমি সেই মোটা 'ভেল্' পরা জপের মালা ও ক্রশ চিহ্ন ধারিণী গম্ভীর-বদনা 'নান'দের পানে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহাদের সর্ব্বত্যাগী অথচ সার্ব্বজনীন্ প্রেম আমার কাছে অনন্ত আকাশের মত রহস্যপূর্ণ ঠেকিত। তাহা আপনার গৌরবে আপনিই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আপনাকে লুকাইবার শত চেষ্টা তাহাকে শতরূপে শতদিক হইতে ব্যক্ত করিয়া তুলে, নিষ্কাম ধর্ম্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বণিক্ জাতির মধ্যে পাওয়া যেন স্বপ্নের মতন অসম্ভব বোধ হইত। ইঁহাদের মতন জগতের কাজে, আর্ত্তের সেবায়, অনাথের পালনে, শিশুর লালনে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতে আমার সমস্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে জোয়ারের জলের মতন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকিত। প্রতিদিন বাড়ি ফিরিবার সময় প্রতি-দিনের চেয়ে বেশি করিয়া শ্রদ্ধানুভব করিতাম।

আমার পিয়ানো শিক্ষয়িত্রী সিস্টার 'গ্রেস' আমার নিকটে একটি জটিল রহস্যের মতন অবোধ্য ছিলেন। আমাদের তপস্বিনী উমার ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর তরুণ মুখখানি, ও যৌবনের পূর্ণ বিকশিত ঢল-ঢল লাবণ্য যদিও কঠোর তপস্যার উপবাস-ক্লেশে এবং বিশ্রী পরিচ্ছদ ও মাথার পুরু কাপড়ের চৌকা 'ভেলে'র দ্বারা যথেষ্ঠ পরিমাণে শ্রীহীন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল তবুও ভস্মে যেমন আগুনের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না তেমনি সেই পাদচুম্বিত

প্রকাণ্ড মোটা কাপড়ে ও দীর্ঘ 'ভেলে' তাঁহার সাধারণ দুর্লভ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যকে কোনমতেই লুকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইত না, তিনি নিজেও বোধ হয় সে কথা ভালরকমই জানিতেন সেই জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম গোলাপী ওষ্ঠ-প্রান্ত মধুর হাস্যচ্ছটায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই গভীর গাম্ভীর্য্য-দ্বারা তিনি তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে চাপিয়া ফেলিতেন; স্বল্পভাষায় যদি কোনদিন একটুখানি অসংযত হইবার উপক্রম করিত অমনি চকিত হইয়া উঠিয়া আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইতেন। এমনকি আমি যখন আমার প্রাত্যাহিক অভিনন্দন তোড়াটি তাঁহার হাতে দিয়া মাথা নীচু করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতাম 'সুপ্রভাত' জানাইবার সময় তাঁহার কণ্ঠে এমনি একটি মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিত,—তাঁহার কোমল হাতখানির স্পর্শ এমনি একটি অপ্রকাশ্য স্নেহে আমার অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত যে, আমি তাঁহার পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি না তুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি সেই সময় তাঁহার নীলকান্ত মণির মতন দুটি চোখ আমার চোখের প্রতিচ্ছায়ায় ঈষৎ কৃষ্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিত তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির গাম্ভীর্য্যালম্বন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত সস্নেহে বলিতেন "আজ তুমি খুব সকাল সকাল এসেছ" আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম হৃদয়ের কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা কাহারো সম্মুখে প্রকাশ না করিয়া ফেলা তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা, যেন এখান হইতে তিনি নিজে এতটুকু কিছু লইতে চাহেন না অথচ নিজের সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা—সর্ব্বদাই যেন ব্যর্থ হইত। কোমলতা ও করুণা তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্যের ছায়াযুক্ত প্রশান্ত মুখে, কোমল কণ্ঠস্বরে ও ধীরশান্ত পদবিক্ষেপে ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার সঙ্গীতময় কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিও যেমন লাগিত তাঁহার স্নেহপূর্ণ "মাই চাইল্ড" "মাই গুড ডটার"ও তেমনি মিষ্ট লাগিত। একদিন আর থাকিতে পারিলামনা। অনিবার্য্য কৌতূহলে হঠাৎ আমার সঙ্গীত শিক্ষার অবকাশে বলিয়া ফেলিলাম "আপনার মত হইতে আমার বড় সাধ হয়" —সে ঘরে তখন কেহ উপস্থিত ছিল না, বোর্ডিংএর মেয়েরা ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল, আমি আর একটা নূতন গৎ শিখিবার জন্য তখনো ছুটি পাই নাই। তিনি যখন পিয়ানোর উপর আবার তাঁহার শুভ্র অঙ্গুলিগুলি স্পর্শ করিয়াছেন এমন সময় হঠাৎ আমি এই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু বলিয়াই বোধ হইল কথাটা বলা হয়তো উচিত হয় নাই

কেননা দেখিলাম এই কথা শুনিয়াই তিনি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। এত খানি চমকাইলেন যে, তাহা স্পষ্টই আমার সুগোচর হইল। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বাধা-প্রাপ্তের ন্যায় থমকিয়া থামিয়া গেলাম, লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম "আমায় ক্ষমা করুন এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা বোধ হয় আমার অন্যায় হইয়াছে।"

সিস্‌টার গ্রেস্ মুখ তুলিয়া সস্নেহে কহিলেন "উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চ হওয়াই উচিত মাই গার্ল্, সে জন্য তুমি লজ্জিত হইয়ো না।" আমি দেখিলাম তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও তাঁহার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ও স্বর কম্পিত হইতেছে, ভারি কষ্ট বোধ হইল, কিসে আমি তাঁহাকে আঘাত করিয়াছি বুঝিতে না পারিয়া আরো ব্যথিত হইলাম। আত্মসম্বরণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমাদের মধ্যকার ব্যবধান-সম্বন্ধ সব ভুলিয়া গিয়া সুগভীর বেদনার একমাত্র সহানুভূতিতে বিগলিতচিত্তা সখীর ন্যায় সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম "আমি কি আপনাকে না জানিয়া আজ বেদনা দিলাম?"

তিনি এবার আমার পানে তাঁহার সেই নীলপদ্মের মতন চোখদুটি ফিরাইলেন, ঈষৎ ক্ষীণহাসি মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে কহিলেন, "না তুমি আমায় আঘাত দাও নাই তোমার কথায় আমার একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়াছিল মাত্র, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার উপলক্ষ হওয়াতে তুমি নিজেকে অপরাধিনী মনে করিয়াছ, আমি এ জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার বালিকা-হৃদয় আজ যে সংসার-বহির্ভূত ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট বোধ করিতেছে, তোমার মতন বয়সে একদিন আমিও সেই প্রকার আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তারপর সে আকর্ষণ কাটাইয়া সংসার যখন শত প্রলোভনের জাল পাতিয়া আমায় তাহার লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় আমার শুভ অবসরের বরেণ্য দেবতা আমায় সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শান্তিময় অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া আমি আমার প্রতি তাঁহার অসীম দয়ানুভব করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর এত দয়া কোনো ব্যক্তিকে এত সহজে করেন না। সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইলেও এখানে তাঁহার করুণা যেন পক্ষপাতপূর্ণ মনে হইতেছে।"

আমি এক সঙ্গে এতগুলা কথা তাঁহার মুখ হইতে আর কখনো শুনিনাই;

বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তাহা দেখিলেন, তাঁহার সেই স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গাম্ভীর্য্যের হাসি একটু হাসিয়া আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে কহিলেন "আমি স্বতন্ত্র করিয়া আর কাহাকেও কখনো ভালোবাসিবনা বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দাও নাই. তোমার আগ্রহ আমার দৃঢ় চেষ্টাকে আজকাল সর্ব্বদাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, আজ আমি তোমায় আমার গল্প শুনাইব ভাবিতেছি; শুনিয়া তুমিই বুঝিয়া দেখো আমার এই কঠোর নিয়মপূর্ণ জীবনের মাঝখানে তুমি বিদেশী বালিকা—তোমার অধিকার বিস্তৃত করা আমার পক্ষে কতখানি হানিকর। আমরা রোম্যান ক্যাথলিক, নিয়মভঙ্গের দণ্ড আমাদের অত্যন্ত কঠিনরূপে গ্রহণ করিতে হয়; আমি মনে মনেও যদি নিজের কাছে অবিশ্বাসী হই আর কেহ না জানিলেও সে পাপ, সর্ব্বান্তর্য্যামীর দিব্যদৃষ্টিতে লুকানো থাকিবে না আমার নিজের কাছেও তো তাহা অবিদিত থাকিবে না। আজ আমি তোমায় আমার প্রথম জীবনের সঙ্গিনীর মতই অকপটে সকল কথা বলিতেছি শুন, কিন্তু তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, "কাল হইতে তুমি আর আমার কাছে আসিয়ো না আমি; যাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছি তাঁহার নিকটে অপরাধিনী হইব।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া শুদ্ধ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বীকার করিতে সাহস হইল না। কুমারী গ্রেস্ তখন আমার খুব কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। (ক্রমশ)।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কুশদহ বৃত্তান্ত (১২)

গোবরডাঙ্গা গ্রামের চাটুজ্যপাড়ার উত্তরাংশে আজো একটি বাড়ি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কোনো বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবার এই বাড়ির অধিবাসী ছিলেন এবং এই বাড়িতে বিস্তর ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। ফলত এই বাড়ি "ভরত চাটুজ্যের বাড়ি" বলিয়া খ্যাত। দুঃখের বিষয় এখন এই বাড়ি প্রায় জনশূন্য। দেওয়ানজী মহাশয়দিগের জ্ঞাতি স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার সারদাপ্রসন্ন বাবুর চিরুলিয়া, মধুদিয়ায় বহুদিবস আমিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ মহাত্মা রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের

মৃত্যু-দিনে তাঁহার পত্নী গৌরমণি দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু-কালে তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে অলঙ্কারাদি যাহা ছিল বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি পান্তাভাত ও ভাজা মাছ খাইয়া, চেলির কাপড় পরিয়া যখন তাঁহার স্বামীর অনুগমন করেন, তখন নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু নর নারী যমুনার ঘাটে আসিয়া তাঁহাদের দাহন দেখিয়াছিলেন।

ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি সহোদর ছিলেন। প্রথম ৺রাম প্রাণ, দ্বিতীয় ৺রামকানাই, তৃতীয় ৺ভরতচন্দ্র ও চতুর্থ ৺ঈশ্বরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠের একমাত্র বিধবা কন্যা ছিলেন, মধ্যমের একপুত্র ও এক কন্যা ছিলেন, তৃতীয়ের একপুত্র ও দুই কন্যা, এবং কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র—উমেশচন্দ্র ও পরিরাম, তাঁহারাও গত হইয়াছেন। এখন একমাত্র বিধবা কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর প্রথমা কন্যা যখন তিনবৎসরে তখন ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রানুসারে মহাসমারোহে তিন মাস পাঠ ও কথকতা দিয়াছিলেন।

পরলোকগত

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সম্ভবত এই সময়ে রাখালচন্দ্রের আত্মীয়গণের এবং প্রধানত পুণ্যবৌয়ের যত্নে পুঁড়া গ্রামে স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এক সুন্দরী কন্যার সহিত রাখালচন্দ্রের বিবাহ হয়।

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন চিনির আড়তে চাকুরী করিয়া ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ একদিন তিনি শঙ্কট পীড়াক্রান্ত হইলেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, অজ্ঞান অবস্থায় মধ্যে মধ্যে রক্তবমণ হইতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া পুণ্যবৌ পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন, এদিকে মুক্তহস্ত কর্ম্মবীর দুর্গাচরণ, বড় ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার কিছুমাত্র ত্রুটী করিলেন না। ঈশ্বর-কৃপায় রাখালচন্দ্র সে যাত্রা মুক্তিলাভ করিলেন। পরে জানা গেল এই সঙ্কট পীড়া "কার্ত্তিক পূজা" কিম্বা "সরস্বতী পূজার" রাত্রির পরেই হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব কুঅভ্যাস তখনো তাঁহাকে পরিত্যাগ না করাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক এই হইতে যে তিনি বিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

তৎপরে রাখালচন্দ্র, দত্ত ফারমের চাকুরী ছাড়িয়া দীননাথ রক্ষিত ও গোপালচন্দ্র পালের দোকানে চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে যখন উভয় অংশীদার পৃথক্ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন, তখন তিনি গোপালচন্দ্র পালের দোকানে অংশীদার হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর কার্য্য করিয়া পরস্পরের স্বার্থে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রয় কুণ্ডু পরিবারের গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে চিনির দোকান করিতে সচেষ্ট দেখিয়া, খাঁটুরা নিবাসী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় একযোগে দোকান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে রাখালচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বসূত্রে যোগীন্দ্রনাথের বিশেষ সদ্ভাব থাকায় উভয়ের বৈষয়িক জীবনের পরামর্শ হইত। ক্রমে ঘটনা এমন অনুকূল হইয়া আসিল যে, যোগীন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও তাঁহার এক সঙ্গী মহেন্দ্রনাথ দেকে লইয়া রামকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে একযোগে অংশীদারী ফারম খুলিবার কথাবার্ত্তা ২।৩ দিনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল। ১২৮৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে "রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোং" নামে ঘৃত, চিনির দোকান খোলা হইল। ক্রমে এই ফারমের অতি আশ্চর্য্য জনক উন্নতি হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসর এইভাবে কার্য্য করিয়া যোগীন্দ্রনাথ মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হওয়ায় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঐ ফারমের একমাত্র অংশীদার হইয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সেই হইতে তাঁহার ধন সম্পত্তি হইতে লাগিল তাহাতে গোবরডাঙ্গায় বাড়ি নির্ম্মাণ ও কলিকাতায় একখানি বাড়ি খরিদ করিলেন। তিনি যে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে অনেকটা মান সম্ভ্রম লাভেও সক্ষম হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন সংসার-ধর্ম্মে প্রবেশ করেন, তখন কোন কোন কারণে পুণ্যবৌএর প্রভাব তাঁহার স্ত্রীর নিকট তেমন কার্য্যকরী হয় নাই। পুণ্যবৌ কিছু ধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন। "হরিবোলা" "কর্ত্তাভজা" দলের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কোন কোন পরিবারের স্ত্রী-সমাজে "গুরুগিরি" করিয়া বেড়াইতেন। যাহা হউক রাখালচন্দ্র পুণ্যবৌএর জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসহারা দিতে ক্রটী করেন নাই।

রাখালচন্দ্রের সেই কঠিন পীড়ার পর হইতে এক প্রকার দুরারোগ্য শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল। এজন্য তিনি সময় সময় অতিশয় কাতর হইয়া

পড়িতেন। রামকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পরেও তিনি ফার্মের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন অন্যান্য রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন তখন পুরী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতেও শরীর তেমন ভাল হইল না। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলচন্দ্র অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। সম্ভবত এই শোকে তাঁহার যেটুকু শক্তি সামর্থ্য ছিল, তাহাও চলিয়া গেল। তাই "ধনে সুখ নাই, জনে সুখ নাই মান সম্ভ্রমেও হৃদয় বেদনা দূর হয় না" এই সকল মহাবাক্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।"

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ ছিলেন। প্রধানত তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বেশ প্রখর ছিল। বোধ হয় তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে একজন উচ্চ শ্রেণীর যশস্বী ব্যক্তি হইতে পারিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবও ছিল, সময় সময় তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু বিষয়াবর্ত্তে পড়িয়া তদ্বিষয়ে উন্নতিরপথ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি কি রূপ সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিধাতার কৃপায় ইহজীবনে এতটা উন্নত হইয়াছিলেন, তাহাই ভাবিবার, বুঝিবার বিষয়। অনুমান ত্রিষষ্টি বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি যে ধন সম্পত্তি এবং সন্তানবর্গ রাখিয়া গেলেন তাঁহারা তাহা রক্ষা করিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করুন ইহাই আমাদের কামনা।

স্থানীয় সংবাদ

শোক সংবাদ—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার ক্ষিরোদা বাবুর সহিত পূর্ব্ব হইতে আমাদের পরিচয় ছিল না। ঐ বংশাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার সদ্‌গুণে অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সহসা বিগত ৬ই বৈশাখ তারিখে আশুবাবুর এক পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আহা! ক্ষিরোদা বাবুর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র আশু বাবুর স্বাস্থ্য ভাল না, ছোটটির এখনো পাঠ্যাবস্থা। আশু বাবু লিখিয়াছেন "দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় ডয়েবিটীশ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ২৮শে পৌষ তারিখে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। * * * আমরা আগামী পরশু বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া যাইব।" অনাথনাথের বিধানের উপর আমাদের বলিবার কি আছে?

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রচার কার্য্য--খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির সংক্রান্ত যে মোকর্দ্দমা হইতেছে তাহা আমরা গতবারে বলিয়াছি। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন দত্তের অধিকার হইতে মন্দির লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রীর হাতে আসা পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য চালাইবার কোনো চেষ্টা আমরা দেখি নাই। কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া মন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহাদের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা কি জানেন না যে, এ পর্য্যন্ত এ মন্দিরে কাহার দ্বারা কার্য্য চলিয়াছে? এবং উপস্থিত মোকর্দ্দমাই বা কেন হইতেছে? বোধ হয় এ সকল কথার আদৌ বিচার না করিয়া একপক্ষের কথায় তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপে কার্য্য করা তাঁহাদের উচিত হয় নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

সুপ্রভাত (চৈত্র ১৩১৭) শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, বি. এ. সরস্বতী সম্পাদিত, ৬নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২।৵০ মাত্র।

প্রবন্ধ-গৌরবে বাংলা মাসিক পত্রের মধ্যে "সুপ্রভাত" শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যার প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাজের নূতন আদর্শ" একটি সময়োপযোগী সুচিন্তিত প্রবন্ধ; বর্ত্তমান সময়ে সমাজের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, লেখক তাহা বেশ মুন্সিয়ানার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের "খাদ্য বিচার ও খাদ্য পাক" সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকারের "গৌড় ভ্রমণ" বহু তথ্য-পূর্ণ। "কো—কো—কি" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিত 'ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে'র অনুবাদ ক্রমশ প্রকাশ্য, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কর্ত্তব্য ও প্রেম" শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিত একটি চমৎকার উপভোগ্য গল্প। 'বঙ্গ সমাজে মহিলার কাজ" শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র লিখিত একটি অতি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ, লেখিকা এই প্রবন্ধদ্বারা এদেশের মহিলাগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, প্রত্যেক মহিলারই ইহা পাঠ করা উচিত। "শঙ্খ" শ্রীযুক্ত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখিত চমৎকার হৃদয়গ্রাহী কবিতা। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত

"ইউলালিয়া" নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, এমন সুন্দর সুলিখিত প্রবন্ধ সচরাচর বাংলা মাসিকে দেখা যায় না। একটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ লেখক অতিশয় দক্ষতার সহিত সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ভ্রমণে' কাণপুর সম্বন্ধে বহুবিধ ঐতিহাসিক তথ্য বেশ নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অনেক গুলি চিত্র এই প্রবন্ধটির মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এক সংখ্যায় তিনটি ভ্রমণ কাহিনীর সমাবেশ কি কাগজের গৌরব বর্দ্ধক? —না দৈন্য প্রকাশক? "মহারাষ্ট্র গৌরবের একটি চিত্র" উল্লেখযোগ্য রচনা।

দেবালয়—(বৈশাখ, ১৩১৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, ও বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখিত একটি চমৎকার প্রসাদগুণ বিশিষ্ট কবিতা "চারিকন্যা" কবি তাঁহার এক কবি-বন্ধুর চারিটি কন্যা দেখিয়া এই মনোহর কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক ছত্রেই ভক্ত কবির প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয়। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কর্ম্মযোগ এই সংখ্যায় শেষ হইল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "বিশ্বজনীন প্রেম" একটি সুন্দর গবেষণাত্মক প্রবন্ধ, ইহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। 'চক্রধরপুর' শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইহার শেষাংশ পড়িবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর "হিন্দু ও গ্রীক" একটী ব্যর্থ রচনা, এরূপ অসার আবর্জ্জনা দ্বারা দেবালয়ের সাতটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার কারণ কি, বুঝিলাম না। সম্পাদক যুগল কি চোক বুজিয়াই ইহা ছাপিয়াছেন? শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "বিশ্বদেবালয়" সূচক মত "কবিতা", কিন্তু কেবল কথা গাঁথিলেই যে কবিতা হয় না, সেই বুদ্ধিটুকু এই সকল স্বয়ং সিদ্ধ কবিযশপ্রার্থীর ঘটে কে দিবে? কবিতা লেখা ছেলে খেলা নহে!—এরূপ লেখা ছাপিয়া বাংলা সাহিত্যে আবর্জ্জনা বাড়ানো কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আশা করি সম্পাদকদ্বয় এখন হইতে সতর্ক হইবেন।

তৃতীয় বর্ষ।]   আষাঢ়, ১৩১৮।   [তৃতীয় সংখ্যা।

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৴১০ পয়সা।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩১৮ | ৩য় সংখ্যা

গান

—•—

বাগেশ্রী—তেওরা

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী।
প্রথম প্রভাতে নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামী।
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
মনে ভেবে রাখি সদা,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যা বেলায় বসিব তোমারি সনে;—
দিন অবসানে ব'সে ভাবি ঘরে
তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি।

—•—

আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর চক্ষু আছে, কিন্তু তাহা তখনো প্রস্ফুটিত হয় নাই, দৃষ্টি-শক্তি লাভ হয় নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, ক্রমে দৃষ্টি-শক্তি উজ্জ্বল হয়, শিশু ক্রমে বস্তু-জ্ঞান লাভ করে, বাহ্য-জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইতে থাকে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদন, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-যোগে মানুষের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। মানুষের আত্মারও চক্ষু আছে, দৃষ্টি-শক্তি আছে। যে পর্য্যন্ত সে দৃষ্টি না প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ আধ্যাত্মিক জগৎ অন্ধকারাবৃত থাকে। যাহার দৈহিক চক্ষু ফোটে নাই, বাহিরের জগৎ তাহার নিকট তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার নিকট এই শোভন সুন্দর বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কথা বর্ণন কর, সে তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারে না। অগণ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশের কথা তাহার নিকট বর্ণন কর, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের বিচিত্র দৃশ্যের কথা বর্ণন কর, জল স্থলের কত অসংখ্য সুদৃশ্য বস্তুর বিষয় বল, সে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম কি বুঝিবে? আধ্যাত্মিক চক্ষু না ফুটিলে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যও দেখিতে পাওয়া যায় না।

চর্ম্ম-চক্ষুর স্রষ্টা মানুষ নহে, কিন্তু যিনি দেহ রচনা করিয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই রচনা করিয়াছেন। আত্মার চক্ষুও মানুষ রচনা করে না, কিন্তু পরম স্রষ্টা পরমেশ্বরই আত্মার দিব্যচক্ষু রচনা করিয়াছেন। চর্ম্ম-চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার না করিলে—দিবানিশি অন্ধকারে বাস করিলে অথবা অত্যুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আত্মার চক্ষুরও উপযুক্ত ব্যবহার আছে। অবিশ্বাসের অন্ধকারে সে চক্ষুকে ক্রমাগত ঢাকিয়া রাখিলে উহা দৃষ্টিহীন হইয়া যায়। আর বিশ্বাসের আলোকে তাকাইলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরের উপর যত বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিবে, তত তাঁহার পরিচয় পাইতে থাকিবে। যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই, অধ্যাত্মরাজ্য তাহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই লোকের দিব্যচক্ষু ফুটিলে ক্রমে অধ্যাত্মলোকের শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আধার পরম দেবতা সে লোকের প্রাণ, সে লোকের ভূমি, আকাশ, জীবন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যখন আমার দিব্যচক্ষু লাভ হয়, তিনি আমার জ্ঞান-গোচর হন; সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষের

পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাঁহার স্পর্শে মৃতপ্রাণে নবজীবন লাভ করি। তিনি জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কত শাসিত হই, কত আশ্বাস লাভ করি। তাঁর অনন্ত স্বরূপের পরিচয় পাইয়া আমিত্বের বিকারশূন্য হই, অনন্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকি। আর অল্পে তুষ্ট, ক্ষুদ্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না। প্রেমময়ের পরিচয় পাইয়া তাঁর প্রেমে না মজিয়া কে থাকিতে পারে? সে প্রেম তো সামান্য নয়, অনন্ত অগাধ প্রেম, সে প্রেম মানুষকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বহির্বিষয়ের জ্ঞানলাভে চক্ষু একটি পরম সহায়, চক্ষু-যোগে যাহা দর্শন করিয়া থাকি, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খুলিয়া গেলে আবার এই দৃশ্য জগতের কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। যে আকাশ সাধারণ দৃষ্টিতে শূন্য দেখায়, বিজ্ঞান-চক্ষু সেই আকাশ বায়ুপূর্ণ দর্শন করে। সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ যে সূর্য্যকে থালার ন্যায় দর্শন করে, বিজ্ঞান-চক্ষু সেই সূর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ-লক্ষগুণ বৃহত্তর দেখিতে পায়। সাধারণ দৃষ্টি পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যাদির কোনো ঘনিষ্ট সম্বন্ধ লক্ষ্য করে না, বিজ্ঞান-দৃষ্টি দেখে এই পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রাদি এক অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ রহিয়াছে। মানুষের আত্মারও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি আছে, দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে যখন ভক্তির চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন তাঁহার সেই বিচিত্ররূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি সত্যরূপে সমুদয় বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র কুশল—কল্যাণ বিধান করিতেছেন। আমার দেহের মালিক আমি নই, কিন্তু সেই লীলাময় পরমেশ্বর দেহ-গৃহে লীলা করিতেছেন। আমার যে ঘর শূন্য ভাবিতেছিলাম, সেই ঘরে জগতের জননী মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। যে সংসারের ভার আমি মাথায় বহন করিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি, সেই সংসারের ভার পরম মাতা স্বয়ং বহন করিতেছেন। যে মানুষকে পর ও শত্রু ভাবিয়াছি, সে মানুষ আমারই পিতার সন্তান। যে মনুষ্য জাতিকে বিভক্ত, পরস্পর সম্বন্ধ—বিবর্জ্জিত মনে করিয়াছি, তাহারা সকলেই সেই এক পিতার স্নেহের সন্তান, এক মাতার কোলে প্রতি-পালিত, সকলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যে পরলোককে শূন্য মনে করিতাম, এখন দেখি সেই পরলোক আমার গম্য স্থান, অনন্তকালের বাসস্থান। পরম মাতার স্নেহ-ক্রোড়েই সে লোক স্থাপিত। আত্মার দিব্যচক্ষু—ভক্তির চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ভক্তবৎসলের পরিচয় পাইয়া পরম কৃতার্থতা লাভ হয়। (ধঃ তঃ)

দান

—ঃ—

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট বেলায় যে কনভেন্ট স্কুলে পড়িতাম সেখানকার স্বল্পভাষিণী নিয়মচারিণী স্নেহশীলা সন্ন্যাসিনীদের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহাদের উপবাস-কৃশ অঙ্গের পবিত্র জ্যোতি ও একটি সাধারণ-দুর্ল্লভ মহিমাময় ভাব আমার বালিকা-হৃদয়কে বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলিত। মনে হইত ইঁহারা যেন পৃথিবীর নয়, অন্য কোনো জগতের বার্ত্তা প্রচার করিতে কোন্ সেই অজানা দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন! যখন খুব ছোট ছিলাম অনেকবার আমাদের শিক্ষয়িত্রীর জানু ধরিয়া তাঁহার ক্রুশ ও মালা ধরিয়া টানাটানি করিয়াছি; আমার 'সিল্ক-ফ্রক' দূরে নিক্ষেপ করিয়া বায়না ধরিতাম "তোমাদের মতন পোষাক আমায় করে' দাও"। 'মাদার অগষ্টাইন' কেবল স্নেহের হাসি হাসিতেন ও সস্নেহে বলিতেন "এই বালিকা একটি এঞ্জেল;" তারপর যত বড় হইতে লাগিলাম ক্রমেই আমার এ পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, একদিন ছুটির সময় বাড়ি আসিয়া মাসী-মাকে বলিলাম "আমি 'নানে'দের কাছে দীক্ষিত হবো"; মাসীমা শিহরিয়া জিহ্বা দংশন করিলেন, ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—"খবরদার অমন কথা মনেও করিয়োনা", আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' তখন মাসীমা অনেক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জিনিষটাকে এমন জটিল করিয়া তুলিলেন যে, আমি সবটা না বুঝিলেও মনে হইল যেন সমস্তই বুঝিয়াছি। আমার যেন কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব এবং উহা করিতে গেলে কি যেন একটা ভয়ানক অধর্ম্ম এবং অত্যাচার করা হইবে!—আমার কল্পনা ফুরাইল।

আর একটু বড় হইলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল। আমি মাসীমার সুবিশাল সম্পত্তির 'এয়ারেস' তজ্জন্যই বড় লোকের মেয়ে না হইলেও আমি অপর্য্যাপ্ত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে শৈশব হইতেই লালিতা কিন্তু মাসীমার 'এয়ারেস' হইলেই তো যথেষ্ট হইল না; মেসো মহাশয়েরও একজন 'এয়ার' ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার মাসীমা যখন আমাকে তাঁহার অর্দ্ধ-দরিদ্র ভগ্নী-গৃহ হইতে নিজের ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাসাদ-গৃহে আনাইলেন তখন নাকি মেসো মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু মতান্তর হইয়া পরে তাহা গভীর মনান্তরে

দাঁড়াইয়াছিল, বৃদ্ধ মেসো মহাশয় তাঁহার পত্নীর ক্ষুদ্র আত্মীয়াটিকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণীরূপে গ্রহণ করিতে একান্তই অসম্মত হইলেন। তাঁহার ভাইপো 'গেব্রিয়েল'কে তিনি নাকি বরাবরই একটু বেশি করিয়া স্নেহ করিতেন তাহাতেই সকলকার—এমনকি তাঁহার নিজেরও বরাবর বিশ্বাস ছিল সে-ই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে।

এমন সময়ে আমি একটি সুকুমারকান্তি বালিকার মূর্ত্তিতে সেই সার্ব্বজনীন্ ভরসাকে হঠাৎ সন্ত্রাস্ত করিয়া তুলিয়া সেই শিশু-পদ-চিহ্নহীন 'গ্রেভেল' পথে অকুণ্ঠিত-সাহসে দ্বিধাশূন্য হইয়া চিন্তামগ্ন নতদৃষ্টি বৃদ্ধের নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিলাম "মেসো মশাই!" মেসো মহাশয় চকিত ভাবে উঠিয়া সোৎসুক-দৃষ্টে আমার মুখের পানে চাহিলেন, আমার বেশ মনে পড়ে, তাঁহার বিরক্তি-কুঞ্চিত ললাট মুহূর্ত্তে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি নত হইয়া আমার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সস্নেহ-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া নিজের শীর্ণ-হাতে আমার হাত লইয়া মাসীমার কাছে গেলেন। তারপর কি হইয়াছিল তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম—সেই দিনই নাকি তাঁহার দৃঢ়-আপত্তি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। মাসীমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমার সপক্ষে এমন একটি উইল করিয়াছিলেন, যাহার ফল সকল সময় শুভ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। বরং আমাদের সমাজে একটু অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আরো শুনিয়াছিলাম মাসীমা প্রথমে ইহাতে অনেক আপত্তি করিয়া শেষে দ্বিতীয় উপায় না দেখায় অগত্যা এই নিয়মেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সে নিয়মটি কি, তাহা জানিতে তোমার হয় তো কৌতূহল জন্মিতেছে। সে সর্ত্ত হইতেছে এই যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে দুইজন উত্তরাধিকারী মনোনীত হইল, কিন্তু ইহারা যদি পরস্পরকে বিবাহ করিয়া সম্মিলিত হয় তবেই তাঁহার ষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে নতুবা যাহার দ্বারা এই নিয়ম ভঙ্গ হইবে সে ইহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, এবং অপর ব্যক্তি একাকী এই বিপুল সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার পাইবে। যাঁহারা তাঁহার 'ট্রষ্টী' হইলেন তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস এতটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। সেদিন মাসীমা আমাকে সেই কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম অতকথা বুঝিলাম না, বুঝিলাম না যে, যে সংসার ত্যাগ করিতেই চাহে, সে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবে? তাহার

একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্তওতো থাকার প্রয়োজন নাই। তখন শুধু বুঝিলাম আমি এক জনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়া আছি, আমার সেই দূরস্থ চন্দ্রমাকে সুধা-পিপাসু চকোর পাখীর মতন উর্দ্ধে চাহিয়া প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আমার আর অন্য পথ নাই। সেদিন প্রথম মনে হইল তিনি কে?

পূর্ব্বেও এ উইলের খবর আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, একথা লইয়া আমার দাসীরা আমাকে অনেক উপদেশ দিত, এমন কি মাসীমাও অনেকবার আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন আমি কোনো সময় এ প্রধান কথাটা ভুলিয়া না যাই। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্বেও এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি আমার জীবনের প্রধান ভাবনা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। আজ হঠাৎ তাহা স্মরণ হইল। আমাদের বসিবার ঘরে ছোট টিপয়ের উপর মেসো মহাশয়ের যে মরক্কো-মণ্ডিত 'অ্যালবাম' খানা পড়িয়া থাকিত, বহুবার দৃষ্ট হইলেও সেদিন চুপিচুপি এক সময় সে খানা খুলিয়া ফেলিলাম এবং মোটা মোটা পাতাগুলা উল্টাইতে উল্টাইতে যেখানে মিঃ ব্রাউনের ছবি ছিল সেইখানটা বাহির করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু যেন কেমন সঙ্কোচ ও লজ্জা-নুভব করিলাম। ছবিখানা যে জড় পদার্থ মাত্র এক মুহূর্ত্ত তাহা মনে পড়িল না এবং চঞ্চল ও শিশুকে বলিয়া যে নাম অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহা সেই চিত্রিত কিশোরের প্রতিভা-ব্যঞ্জক মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তেই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সে কী নূতন ভাব! আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না, সেই বহুবার-দৃষ্ট ফটোগ্রাফ সেদিন আমার নববিকশিত-হৃদয়ে কী আশা কী আনন্দ, কী যৌবন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। মুগ্ধা আমি, পুলক-কম্পিত-বক্ষে সেই আমারই—একান্ত আমারই জন্য যিনি কোনো অচেনা দেশের অজানা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতিকৃতি খানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম। সে চুম্বন জড়ে চেতনে—সে গভীরতা-ভরা প্রথম চুম্বন অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই! তাহা কোন পবিত্র পুষ্পাঘ্রাণের মত আমার কৌমার-অধরকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল!—অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি হর্ষ, একটি বিস্ময়, একটু খানি লজ্জা, আমার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইত! আমি মুগ্ধ-চিত্তে ভাবিতাম ইহা হয় তো প্রেম, হয় তো 'আভানুহো'র প্রতি 'রোয়েনা'র এবং 'রোমিও'র প্রতি 'জুলিয়েটে'র যে রকম একটা সুমধুর গভীর উচ্ছ্বাস ছিল, এ সেই।

তারপর অল্পে অল্পে উচ্ছ্বাস চলিয়া গেল, স্বপ্ন ফুরাইলে স্মৃতি যেমন জাগিয়া থাকে তেমনি একটি আভাষ রহিল মাত্র! পরীক্ষা আসিয়া পড়ায় মন তাহার কাল্পনিক স্বপ্ন ভুলিয়া গিয়া বাস্তবের পানে ছুটিয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কে আমার

মানুষ এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক জনকে আপনার করিতে চায়। শিশু মাকে সম্পূর্ণরূপে চায়, তার মা কেবল তাহারই হয়। কিন্তু তাহা হয় না; কিছুদিন পরে তাহার আর এক ভাই কিম্বা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সে আকাঙ্খায় বাধা প্রদান করিল। শিশু দেখিল তাহার মা সম্পূর্ণ তাহার হইল না। পিতা চান, আমার পুত্র সম্পূর্ণরূপে আমারই হইবে। বিদ্যা-সম্পদে পুত্র যদি সম্পন্ন হন, "আমার পুত্র" বলিয়া পিতা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু পুত্রও পিতার সম্পূর্ণরূপে হয় না। স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধু কেহই সম্পূর্ণরূপে আপনার হয় না,—কেবল কি সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যেই এইরূপ হয়? যীশু চাহিলেন তাঁহার দেশ জেরুজেলামকে আপনার করিতে,—জেরুযেলামকে বুকের ভিতর লইতে; জেরুযেলাম! জেরুযেলাম! বলিয়া কত কাঁদিলেন, কিন্তু জেরুযেলাম তাঁহাকে আঘাত করিল. ক্রুশের উপর তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিল,—শুধুকি তাই?—তাঁহার পিটার প্রভৃতি প্রিয় শিষ্যগণ কি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইল? সেই গেথ্সি-নামের উদ্যানে শেষ রজনী, তাহারা দুই ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। এমন স্নেহময়ী মা, যিনি নিমাইকে আপনার করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা পারিলেন না। পতিপ্রাণা গুণময়ী ভার্য্যা, তিনিও তাহা পারিলেন না। এই যে আপনার দেহ তাহাও আপনার হয় না, এমন কি পৃথিবীর একটি ধূলি-কণাকেও আপনার করা যায় না।

এই দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন;—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়তঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিহং ভ্রাতঃ।"

অর্থাৎ "কেই বা তোমার স্ত্রী, কেই বা তোমার পুত্র, এ সংসার অতি বিচিত্র স্থান; তুমিই বা কার এবং তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? অতএব হে ভ্রাতঃ! আত্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা কর।"

এ পথে কেহ আপনার হয় না, তখন পথ ফিরিয়া গেল। বহির্জগৎ ছাড়িয়া আগে আপনার ভিতরে আসিতে হইল। সেখানে আসিয়া দেখিলাম আমার এই জীবন কাহার দান? কে ভালবাসিয়া আমার এই জীবনকে সৃজন করিয়া পাঠাইয়াছেন। কে আমাকে এই প্রকৃতি, আকাশ, আলোক, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি পরিশোভিত সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য বিনামূল্যে দান করিয়াছেন? আমি কার? সম্পূর্ণরূপে কে আমার? আমাকে সম্পূর্ণ নিজের করিবার জন্য নিয়ত কার চেষ্টা চলিয়াছে? তিনিই এই জীবন-দাতা, এবং সমস্ত জগতের সৃজনকর্ত্তা ও প্রতিপালক। যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন সমস্ত জগৎ আমার হইল; আমিও সকলের হইলাম। আমি সম্পূর্ণ যাঁহার, সমস্ত জগৎও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার। আমি যদি তাঁহার হইলাম, কেহই আমার পর থাকিতে পারে না।

এ সংসারে কত তাপ কত দুঃখ, তাহাতো আর কিছুতেই যায় না! যখন দেখি আমাকে যিনি সৃজন করিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইবার জন্য এবং সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র তাঁহাকেই আপনার করিবার জন্য তাঁহার আদিষ্ট কাজ করিতে আসিয়াছি; আমি গরীব, তিনি আমাকে যে কাজ দিয়াছেন এ আমারই কাজ, আমি আমার কাজ সমস্ত মন প্রাণ দেহ দিয়া যদি তন্ময় হইয়া করিতে পারি তাহা হইলে আমার কত সুখ কত আনন্দ! গরীব কৃষক ভাই, তোমার যে কাজ, সে তোমারই কাজ, সে কাজ বিদ্বান কিম্বা ধনীর দ্বারায় হইতে পারে না।

দুঃখ দূর করিবার এই উপায়;—যিনি আমাকে ভালবেসে এতটুকু কর্ম্ম করিতে দিয়াছেন, আমি তাঁহার ভালবাসা দিয়া, তাঁহার কর্ম্ম করিয়া সংসারে দুই জনকেও যদি ভালবাসিতে পারি, সেবা করিতে পারি, তাহাতেই আমার কত সুখ, পাঁচজনকে পারি আরো সুখ, দশজনকে পারি আরো ভাল!

সংসারে এক প্রকার ভাসা ভাসা জীবন আছে। তাহা, জল-স্রোতে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে তদ্রূপ সে সকল জীবনের কোন গভীরতা দেখা যায় না, কিন্তু এই সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহারা কত কাজ

করিল; জনসমাজের সঙ্গে মিলিত হইল, কাজেও তেমন আনন্দ লাভ করিতে পারিল না, জন-মণ্ডলীতেই বা কি দেখিল? কেবল নর-শিরঃ শ্রেণী মাত্র। যে ভাষা জানে না সে পুস্তকে কি দেখে? কেবল কি সাদার উপর কালদাগ গুলি মাত্র নহে? কিন্তু ভাষাজ্ঞ তাহাতে কত জ্ঞান, কত ভাব, কত আনন্দ লাভ করিতে পারেন। ভগবানের আলোকে মানবের মুখ-শ্রীতে কি দেখা যায়? কত পরিচিত মুখ দেখিয়া কত জ্ঞান, কত ভাব কত ধর্ম্মোৎসাহের কথা মনে আসে, তাহাতে কতই আনন্দ পাই। ভগবানের আলোকে দেখিলে সকলেই সুন্দর দেখায় কোনো বস্তু অর্থশূন্য মনে হয় না।

বাসনার অধীন হইয়া মোহের দিক দিয়া কাহাকেও আপনার করা যায় না, কিন্তু ভগবানের ভালবাসার ভিতর দিয়া গেলে সমস্ত হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। মৃত্যুতেও এ যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। (মন্দিরে উপদেশের ভাবে লিখিত)

উদ্ধার

আমার ভরসা আশা সব জলাঞ্জলি
দিয়েছিনু একেবারে। কভু ভাবি নাই
এই দগ্ধ-অবশেষ, এই ভস্মছাই,
নির্ব্বাপিত এ জীবন, পুনরায় জ্বলি'
উঠিবে কণক-দ্যুতি দীপ্ত-শিখা-মুখে
লভিয়া ইন্ধন নব, প্রাণ বায়ু ভরা
ফুৎকার-মারুত তব! কি অপূর্ব্ব সুখে
দুখ নিশি হ'ল ভোর, আলোক-অম্বরা
তুমি দেখা দিলে যবে! চলেছিল ভেসে
জীবন-তরণী মোর বহিত্র-বিহীন
অকূলের মৃত্যুমুখে। কোথা হ'তে এসে
দাঁড়ালে সে তরী মাঝে, করিলে উড্ডীন
সোনার অঞ্চল খানি, সেই ভরাপালে
বাহি' মোর তরীখানি' কূলেতে ভিড়ালে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৩)

স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অক্ষয় চন্দ্র, সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; কিন্তু সুপথে সংসাধনার অভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অকালে জীবন হারাইলেন।

অক্ষয় দৈহিক আকারে অনেকটা শ্রীমানই ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কলিকাতার-ভবানীপুরে কুসঙ্গে মিশিয়া অক্ষয় অসৎচরিত্র হইয়া পড়েন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ অক্ষয়ের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সমস্ত কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে বাহ্য সদাচার পালনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় গোবরডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবরডাঙ্গা ও খাঁটুরা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী (বর্ত্তমান রেলওয়ে-ষ্টেশন সন্নিহিত) কতকগুলি আম কাঁটালের পুরাতন বাগান আছে। তন্মধ্যে "ভরত চাটুর্য্যের বাগান" প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ বাগানের একাংশে সন্ন্যাসী অক্ষয়, এক আশ্রম কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধনের ঠিক পথ ধরিতে না পারিয়া অক্ষয় যে বিশেষ কিছু আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার লক্ষণ কিছু দেখা যায় নাই। অধিকন্তু তখনো একটি অতি-কুভ্যাস (গঞ্জিকা সেবন) সাধনার অঙ্গরূপেই (যাহা অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীর দেখা যায়) তাঁহাতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাতে অক্ষয় কিছু কোপন-স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক আহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যশীল হওয়াতে তাঁহার স্বভাব-সুলভ শ্রী আরো উজ্জ্বল হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী অক্ষয়, গ্রীষ্মকালে "জলসত্র" ছোলা ভিজানো, গুড় বাতাসা ও সন্দেশ রসগোল্লা দিয়া সাধারণের সেবা করিতেন। কিছুদিন তাঁহাতে সেবার ভাব বিকাশ পাইয়াছিল। অক্ষয়ের কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল, তাহা লইয়া কিছু দিন আবদ্ধ থাকার পর, একটি ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ঐ অর্থগুলি যখন ব্যয়িত হইয়া গেল, তখন অক্ষয় দেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে বোধ হয় কাশীতে আসিয়া স্বর্গীয় ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া "হিংলাজ" প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ সকল এবং নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাংলা

১৩০৫ সালে যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন আমরা তাঁহার ভয়ানক অবস্থা দেখিলাম। শোনাগেল "গুরু আজ্ঞায়" এখন তিনি যথেচ্ছাচারী,—মদ্য, মাংস যাহা পান তাহাই অবাধে পান ভোজন করেন, এমন কি প্রতিদিন সুরাপান তাঁহার সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। মাংসাদি যাহা ভোজন করিতেন তাহা পরক্ষণেই বমন করিয়া ফেলিতেন। এই অবস্থায় কালীঘাটের শ্মশানে তাঁহার 'আসন' ছিল। এই সময় হঠাৎ একদিন শোনা গেল, অক্ষয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু বিবরণ বিচিত্র ভাবে প্রথমে প্রচারিত হয়। শেষ জানা গেল ভয়ানক জ্বর-বিকারে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে! যাহা হউক, অক্ষয়ের ধর্ম্ম সাধন-প্রণালী আমরা অনুমোদন না করিয়াও ধর্ম্মানুরাগ, ত্যাগ এবং কঠোর সাধনানুরাগের জন্য অক্ষয়ের নাম 'কুশদহ' বৃত্তান্তে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করি।

তৎপরে স্বর্গীয় রামকানাই চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা আহ্লাদের সহিত কুশদহ-বৃত্তান্তে সন্নিবেশিত করিতেছি। মহেন্দ্র বাবু যৌবনের প্রারম্ভ কালে বিবাহিত হইয়া অবস্থার গতিকে গোবরডাঙ্গারবাস ছাড়িয়া ভবানীপুর বকুলবাগান লেনে বসবাস আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় অদ্যাপি তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি যখনই দেশের ভূতপূর্ব্ব সদ্ভাবের কথা সকল বলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আবার দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথায় তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসে! মহেন্দ্র বাবু চিত্র-অঙ্কনে নিপুণ এবং স্বভাব কবি—প্রেমিক ভক্ত ও ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ। তাঁহার চরিত্র যেমন নির্ম্মল, অন্তঃকরণও তেমন কোমল। যিনি একবার তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

মহেন্দ্র বাবু বিনা আয়াসে সময়ে সময়ে কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন; তৎপরে ১৩১০ সালে "চরিত্রবান কুলীন" নামক, নাটকের ন্যায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, ঐ গানগুলি তাহাতে সন্নিবিষ্ট করাতে পুস্তকের স্থানবিশেষে সঙ্গীতের ভাবের সার্থক হয় নাই। একখানি স্বতন্ত্র সঙ্গীত পুস্তক হইলেই ভাল হইত। তদ্ভিন্ন "চরিত্রবান" কুলীনের ভাষা ও রচনা প্রণালী মনোজ্ঞ নহে। তিনি যে প্রাচীন বহু বিবাহ পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়া গ্রন্থের মৌলিকতা স্থাপন

করিয়াছেন তাহা সমাজ-হিতকর নহে। ঐ প্রথা বর্ত্তমান সভ্য সমাজের অযোগ্য। তথাপি তিনি যে চরিত্রবান-কুলীনের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে। আন্তরিক অনুরাগের তুলিকায় তাহা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এখানে মহেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার চরিত্রগত সদ্ভাবের প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলা হইল মাত্র।

তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীতের ভাব চমৎকার! স্থানাভাবে তাহার দুইটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

রাগিণী ভীমপলশ্রী—যৎ।

"দান করিলে দৈন্য হয় না শাস্ত্রের লিখন।
যাহার যেমন সম্বল, পথের-সম্বল করে লও কিছু এখন।
যে জানে অর্থের অর্থ, তার অর্থ যায় না ব্যর্থ,
মেলে অর্থ হ'তে ধর্ম্ম, অর্থ, পরমার্থ পরম ধন।
এ দিনে যা দীনকে দিবে, সে দিনে তা সঙ্গে যাবে;
শেষে তিলটি তোমার তালটি হবে লোকে বলবে সুকৃপণ।"

২য় গান—

রাগিণী পরজ কালাঙ্গরা—কাওয়ালী।

"বিশ্বাসীর নিকটে কেহ অবিশ্বাসী নয়!
(মনরে) সে জনের এই মনের ভাব সব ব্রহ্মময়।
মিলায়ে দুগ্ধ জলে, মরালের মুখে দিলে,
জল ফেলে সে অনায়াসে দুগ্ধ পিয়ে লয়,
বিশ্বাসীর কাছে তেম্‌নি গুণের পরিচয়।
সে জন কা'র দোষ ধরে না,
সামান্যতে রোষ করে না,
ও তার বিবাদ কালেও বাক্ সরে না,
অবাক-হয়ে চেয়ে রয়।"

সাময়িক ও বিবিধ মন্তব্য

বিগত ৬ই মে অপরাহ্নে এলবার্ট হলে মিঃ গোখ্‌লের বাধ্যতা‌মূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল সমর্থন জন্য বাবু সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল। সভায় সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্যের বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন "আমরা কি ইচ্ছা করি যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চিরদিন দাসের ন্যায় নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকে ? এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টেরও টাকা দেওয়া উচিত এবং দেশের লোকের ও কষ্ট করিয়া ট্যাকস্ দেওয়া আবশ্যক।"

এই বিল সমর্থনের জন্য বিশেষ আন্দোলন হওয়া আবশ্যক তবে গবর্ণমেণ্ট বিল পাশের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন।

স্কুল কলেজের শিক্ষায় সাধারণ ভাবে কি নীতি শিক্ষা হয় না? তথাপি বিশেষ ভাবে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধে, কলিকাতায় দুইটি এবং মফস্বলেও কোথাও কোথাও নীতি-বিদ্যালয় বা 'সাণ্ডে-স্কুল' আছে। প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার কার্য্য হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রদিগের, নীতি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য "হায়ার ট্রেণিং ক্লাশ" হইয়াছিল। এক্ষণেও নীতি, ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় তবে তাহা উদার ভাবেই করিতে হইবে। বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষারস্থান গৃহ, স্কুল কলেজে সাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এখনো যাঁহারা উচ্চরব করিতেছেন, তাঁহাদের কল্পনা কার্য্যকরী হইবে তাহা বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িক শিক্ষায় কি দেশের ইষ্ট হইবে ?

বর্দ্ধমান মহারাজার ঠাকুর বাড়ীতে দোল ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে যে সকল অপবিত্র নৃত্য-গীতের বন্দোবস্ত ছিল, মহারাজা তাহার পরিবর্ত্তে শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বহুস্থলে এইরূপ সৎসাহস এবং সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্যামবাজারে কোনো ভদ্রগৃহে এক বিবাহ-সভায় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সভায় "বাই নাচ" হইয়াছিল। যাঁহারা চিরদিন বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের পক্ষ সমর্থন করেন, এমন এক সাপ্তাহিক পত্রে (ঐ কাগজের নাম প্রচার করিতে আমরা ইচ্ছা করি না) সংবাদটি প্রকাশ করিয়া এই সভায় কোনো নীতিবান্ আপত্তি কারীর প্রতি ও 'সঞ্জীবনী'র নামোল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা বলি কোনো ভদ্র-গৃহে যেকোনো অনুষ্ঠানেই হউক না কেন বারাঙ্গনার নৃত্যগীত করানো উচিত নহে। তৎপরে ঐরূপ রুচির সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে আর কি বলিব? যাহার অস্তিত্ব যে রুচির তাহা ত্যাগ করিলে তাহার অস্তিত্ব থাকে কি?

বিধবা বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে বাদানুবাদ নিয়ত চলিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়োপযোগী ইহার সামঞ্জস্যের কোনো কথা প্রায় শোনা যায় না। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বাল-বিধবার অবস্থাগত বিবেচনায় বিধবা বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট সহানুভূতি করিতেন। যেখানে স্বভাবত ধর্ম্ম বা বৈরাগ্য ভাবের অভাব দেখিতেন সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুর 'এক-পতিজ্ঞান' এবং ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের গৌরব যাহাতে নষ্ট না হয় তেমন সংস্কারকে রক্ষা করিতে যত্নশীল ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস বাল্য-বিবাহ সংখ্যা যত কমিয়া আসিবে তৎসঙ্গে যদি সুশিক্ষা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বিস্তার পায় তবে ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। যদি কেহ বলেন, সুশিক্ষিত ইউরোপে তো বাল্য-বিবাহ নাই, তথাপি বিধবা বিবাহ প্রবল হইল কেন! তাহার কারণ ইউরোপের শিক্ষা অত্যন্ত স্বাধীনতা মূলক এবং বহির্জাগতিক বিজ্ঞানপ্রধান; কিন্তু ভারতবর্ষ, বাধ্যতামূলক এবং অন্তর্জাগতিক শিক্ষা-সংস্কারে গঠিত।

এক সময় উপবীত ত্যাগের জন্য হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন সমুপস্থিত হইয়াছিল; এখন আবার উপবীত গ্রহণ জন্য আর এক আন্দোলন চলিয়াছে। সকল শ্রেণীই যদি উপবীতধারী হয় তবে কি সকল উপবীতধারীর সমান আদর বা উন্নতি হইবে? তবে এমন উপবীত গ্রহণের ফল কি? উপবীতে কি এমন কোন বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ শক্তি আছে যে, তাহা গ্রহণ করিলে নীতি চরিত্র, আচার অনুষ্ঠান উন্নত হইবে? নচেৎ হইতেই পারে না?

স্থানীয় সংবাদ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল—বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় গোবরডাঙ্গা নিবাসী ৺উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ তুষিতকুমার মুখোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল কঃ স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে, ডাক্তার কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুর জেলাস্কুল হইতে প্রথমবিভাগে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ স্কটিস্‌চার্চ্চ কঃ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে, ৺গঙ্গাধর সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবলচন্দ্র বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে তৃতীয় বিভাগে, এবং 'কুশদহ' সম্পাদক—দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সরলকুমার কুণ্ডু সিটী কঃ স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এবং স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র আশের দৌহিত্রী (স্নেহলতা দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা) কুমারী শান্তিলতা লোরেটো হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এবার গোবরডাঙ্গা স্কুলের দুইটি ছাত্রই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

ডাক্তারী পরীক্ষা—বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সহায়রাম রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ হরিসাধন রক্ষিত মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক (প্রথম এম, বি,) পরীক্ষায় এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত প্রথম বার্ষিক (প্রিলিমিনারী এম, বি,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কর্ণবেধ—সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা জমিদার বাটীতে বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার কর্ণবেধ উপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণ ভোজনাদি এবং বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজনও নাকি যথেষ্ট হইয়াছিল।

এ সংবাদ কি সত্য?—বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠের "সঞ্জীবনী"তে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায় এইরূপ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে,—"গত ৩০শে বৈশাখ বিষ্ণুপুর চকবাজারে কলিকাতা হইতে তাম্বুলী সমাজের ৪ জন সভ্যের আগমনে বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীধর চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাজের এক অধিবেশন হইয়াছিল। গান এবং বক্তৃতাদি সভার কার্য্য দুইদিন হয়। শেষ দিনের কার্য্যান্তে ঐ সভায় "বাই নাচ" হয়। সমাজের উন্নতি-কল্পে সভা আহ্বান করিয়া তৎসঙ্গে বাইনাচ বেশ রুচির

পরিচয়! তাম্বুলী সমাজে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, অনেকেই সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন না?"

যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে বড়ই লজ্জার কথা; অতঃপর এই "তাম্বুলী সমাজ" যে স্বর্গীয় ভুতনাথ পাল—প্রবর্ত্তিত সমাজ, সে পরিচয় দিবার উপযুক্ততা আর থাকিবে না। "কলিকাতার ৪ জন সভ্য" এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন. তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

বহু-বিবাহ—বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রণালী সকল মানব-সমাজেরই উন্নতির অনুকূল। শিক্ষা, সংস্কারে সমাজ উন্নত না হইলে তাহার কুপ্রথাগুলি সংশোধন আশা করা যায় না; তাই এক স্ত্রী সত্বে পুনর্ব্বার বিবাহ অশিক্ষিতের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা লেখা পড়া শিখিতেছে, শিক্ষিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কাহার কি এরূপ কুকার্য্য করা উচিত? সম্প্রতি কুশদহ তাম্বুলী সমাজে ঐরূপ একটি ঘটনা সম্ভাবনার কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। পারিবারিক কোনো কারণে ঐ আন্দোলন হইলেও এ কার্য্যের বিরুদ্ধে যুবকের একান্ত দৃঢ় হওয়া কর্ত্তব্য। এক স্ত্রী সত্বে আর এক বিবাহ করা কখনই উচিত নহে। তাহার কি দায়ীত্ব জ্ঞান নাই? তবে শিক্ষার ফল কি হইল?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

বাণী (চৈত্র, ১৩১৭)—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। কলিকাতা, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্‌, হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২।৵৹

প্রথমেই ভক্ত কবি দেবেন্দ্র নাথ সেনের কবিতা "ব্রজেন্দ্র ডাকাত" অপূর্ব্ব জিনিষ, ইহা পড়িলে নিতান্ত ভক্তিহীনের প্রাণেও ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে। শুধু এই কবিতাটির জন্য এবারকার "বাণী" সার্থক বলা যায়। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর "মহাভারতের গঠন" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পাগলিনী" কবিতা বড়ই সুন্দর-বড়ই মধুর! 'বৌদিদি' শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, লেখকের মতে বোধ হয় এটি গল্প; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বার বার পড়িয়াও আমরা ইহার গল্পত্ব বুঝিতে পারিলাম না। যেমন 'প্লট' তেমনি ভাষা। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের "মালদহের সাঙ্গাপূজা ও গ্রাম্য দেবতা" বহুতথ্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'ঋণ-পরিশোধ' মন্দ হইতেছে না।

তৃতীয় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৮। [৪র্থ সংখ্যা।



(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। এই সংখ্যা ৵০ পয়সা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩১৮ | ৪র্থ সংখ্যা

গান

(কাফি—একতালা)

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু! এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু'হাত ভরে ওঠে ধনে;—
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে
আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগবানের স্বরূপে নিষ্ঠা

সাধকগণ জানেন, সাধন পথে প্রথম কথা নিষ্ঠা। কিন্তু নিষ্ঠা জন্মায় কিসে? বস্তুর মর্ম্ম যতদিন না বোঝা যায় ততদিন তাহাতে নিষ্ঠা, অনুরাগ বা আসক্তি হয় না। বালিকা কি পতি মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হয়? বালক কি কেবল উপদেশ শুনিয়া পিতৃ-ভক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারে? স্বাভাবিক অনুরাগ সত্ত্বেও জ্ঞানানুরাগ নিতান্তই জ্ঞান-সাপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুর গুণ বা স্বরূপ অবগত না হইলে বস্তুতে প্রকৃত অনুরাগ হইতেই পারে না। তাই দেখা যায় পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান পরিষ্কার রূপে না জন্মিলে সাধন-পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন বর্ণমালা না জানিয়া ভাষা-জ্ঞান হইতেই পারে না, তদ্রূপ উপাস্যের স্বরূপে স্পষ্ট ধারণা না হইলে উপাসনায় নিষ্ঠা ও গাঢ়তা জন্মায় না। "ধর্ম্ম ভাল, ঈশ্বরের নাম করা কর্ত্তব্য" এইরূপ কোনো বাহ্যিক ভাব হইতেও কখনো কখনো সাধনানুরাগ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ততদিন নিরাপদ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যত দিন না উপাস্যের স্বরূপের জ্ঞান পরিষ্কার হয়।

মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া কোনো না কোনো ভাবে তাঁহার স্বরূপের ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু সকলের ধারণা যে পরিষ্কার প্রকৃতিস্থ তাহা তো দেখা যায় না। যদি একই বস্তুর ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হইল, তবে ধর্ম্ম-ভাবও যে বিভিন্ন প্রকারের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুত এ দেশে বিশেষভাবে তাহাই হইয়াছে। একই হিন্দুর একই উপাস্যের এত বিচিত্র স্বরূপ আর কোনো দেশে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলিবেন "ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁহার গুণ অসংখ্য, সুতরাং যিনি যে ভাবে তাঁহার যে স্বরূপের ভজনা করুন না কেন, তাহাতে সেই একেরই ভজনা করা হয়।"

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও এক দিকে ভয়ানক ভ্রম রহিয়াছে;— তিনি অনন্ত গুণময় হইয়াও এক অদ্বিতীয়। সুতরাং তাঁহার অদ্বিতীয় স্বরূপের মৌলিক আদর্শ ছাড়িয়া যে কোনো ভাবে তাঁহার উপাসনাদি করিলেই যে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করা যাইবে, ইহা কখনো সম্ভবপর নহে। মানবত্বে সকল মনুষ্য সমান হইলেও ভোলানাথ কর্ম্মকারকে ডাকিয়া কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখা পাওয়া যায়? অথবা পাঁচু মণ্ডলকে ডাকিয়া কি রামকৃষ্ণ

পরমহংসের দর্শন হয়? তাহা যদি না হয়, তবে মানবীয় ভাব মিশ্রিত পৃথক পৃথক দেব-দেবী ভাবে ভাবিয়া কি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরব্রহ্ম সনাতন নিত্য নিরঞ্জন মুক্তিদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের ভাব লাভ করা যায়? পরমাত্মার মৌলিক স্বরূপের কি কোনো আদি নিদর্শন কিম্বা আদি শাস্ত্র নাই? ইহা কি কেবল কল্পনার কথা? এ দেশের প্রথম অবস্থায় ধর্ম্ম-সাধন-কালে যখন মানব-মন স্বাভাবিক ছিল—সরল ছিল, তখন স্বতই মানব-হৃদয়ে কোন্ স্বরূপের উদয় হইয়াছিল? যে আদি কালকে বৈদিক কাল বলা হইয়াছে, যে বেদ'আপ্তবাক্য' অর্থাৎ ঈশ্বর-বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ,—বাস্তবিক ঈশ্বর দেহধারী হইয়া একখানি বেদগ্রন্থ কাহারো হাতে দিয়া গিয়াছিলেন কিম্বা স্বয়ং বেদ-মন্ত্র কাহাকেও বলিয়া ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক সরল চিত্তে ঈশ্বরতত্ত্ব-পিপাসু ব্যাকুল মানবগণ যে জ্ঞান-তত্ত্ব এক সময় লাভ করিয়াছিলেন, যাহা আজো পর্য্যন্ত বিশুদ্ধচিত্ত মানব-মণ্ডলী অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছে সেই বেদান্ত বা উপনিষদ্ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন?—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,
আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি;
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

"সত্যং" অর্থাৎ সত্য-স্বরূপ,—সত্য কি? সৎ—যিনি আছেন—যিনি মূল সত্ত্বা, যিনি কারণ, সত্যই সকলের মূল কারণ। সেই মূল কারণ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি আছেন।

তৎপরে—"জ্ঞানমনন্তং" সেই সৎস্বরূপ, জ্ঞানময়। তিনি সকল জানেন, সকল জানিয়া সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের মহিমায় এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান অনন্ত-অসীম, তাঁহার কোনো সীমা নাই, আরম্ভ নাই, শেষও নাই, মৃত্যুও নাই। তিনি শক্তিতে অনন্ত, জ্ঞানে অনন্ত, তাই সত্যং জ্ঞানমনন্তং।

"আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—অর্থাৎ তিনি এই জগতে আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি স্বয়ং পূর্ণানন্দময়, তাই ভক্ত কবি গাইলেন "তোমারই আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে।" জীব সকল তাঁহারই আনন্দ-রসে অমৃত-স্বরূপে জীবন ধারণ করিতেছে, তিনি পূর্ণানন্দময়।

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"—অর্থাৎ তিনি একমাত্র স্থির, শান্ত, নিস্তরঙ্গ,

নির্ব্বিকার, অদ্বিতীয় মঙ্গলময়। সাধারণ জীব সকল মৃত্যু দেখিয়া ভয় পায়, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁহার মঙ্গলময়-স্বরূপে বিশ্বাসী হইয়া জন্মে যেমন মরণেও তেমন মঙ্গল-বিধান দর্শন করেন; তাই তাঁহারা স্থির শান্ত, শোক-মোহে অধীর হইবার কোনো কারণ দেখেন না। অতএব সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ এবং শান্ত নির্ব্বিকার পবিত্র-স্বরূপ, অথচ সকল স্বরূপে যিনি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহাই ঋষিদিগের সাধন পথ। তবে পরবর্ত্তী সময়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহারো একটা প্রয়োজন ছিল। উপনিষদ্-যুগের জ্ঞান ক্রমে অদ্বৈতমার্গে "মায়াবাদের" মধ্যে পড়িয়া যখন কঠোর সাধনার পথে গিয়া দাঁড়াইল, তখন মানব-হৃদয় আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। ব্যাকুল প্রার্থনার ফলে পৌরাণিক যুগের অবতরণ হইল। ঈশ্বরে মানব লীলার ভাব আসিল। দূরস্থ জ্ঞানের ঈশ্বরকে "লীলা-রসময় হরি" রূপে দর্শন করিতে মানবাত্মা ধাবিত হইল। ভক্তি-প্রেমের ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কিন্তু সাধন-পথ সহজ করিবার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইতে লাগিল। উচ্চ জ্ঞান-পথ খর্ব্ব হইল। ভাবুকতার প্রাবল্যে জ্ঞানের আদর্শ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। লীলা-বর্ণনাচ্ছলে মানবীয় ভাবের বিবিধ আখ্যায়িকা শাস্ত্র-মধ্যে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। পৌরাণিক আদর্শ, বেদ-বেদান্তের পরিণতি বলিতে চাও বল, কিন্তু আদর্শ যে নামিয়া গেল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা হউক যুগ যুগান্তরের সাধন-ফলে এখন ধর্ম্ম-জগতে এক সুসময় আসিয়াছে। জ্ঞান,ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধর্ম্মই এখন সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন অধিকাংশের গতি সামঞ্জস্যের দিকে। এখন সেই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত-মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, অদ্বিতীয় নিরাকার ভগবানকে পরম পিতা, পরম মাতা, বিধাতা, প্রভু, রাজা, সখা, স্বামী রূপে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিযোগে, প্রেম-যোগে তাঁহার সাধন ভজন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। ভারতবাসী আবার সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকেই লীলা রসময় বিধাতা রূপে পূজা করিয়া ধন্য হইবে। প্রথমে এক একটি ভাবকে যুগের পর যুগ পৃথক ভাবে লাভ করিয়া সাধন করিয়াছে, এখন সকল ভাবের সামঞ্জস্যে এক মহাভাব সাধিত হইবে তাহারই আয়োজন চারিদিকে দেখা যাইতেছে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তাঁহার মহিমা জয়যুক্ত হউক।

দান

(৩)

ইহার পর আরো দুই বৎসর গত হইল। আমার সপ্তদশ বৎসর উনবিংশে পর্য্যবসিত হইল। সে বৎসরের জন্ম-দিন উপলক্ষে বাড়ি আসিয়াছি। তখনো দুই দিন ছুটি আছে, কাল রাত্রের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আজ হইতেই নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলাম। গানগুলা একবার মাসীমার কাছে গাহিয়া বাজাইয়া 'রিহার্সেল' দেওয়া হইল। আমার জন্ম-দিনের উপহার দিবার জন্য মাসীমা যে সুশুভ্র অম্লানোজ্জ্বল মুক্তার কণ্ঠি ও চুণির দুইটি 'ব্রেসলেট' তৈরি করাইয়াছিলেন, সেগুলি পরাইয়া শুভ্র স্থূল 'ফ্রেঞ্চ' সাটিনের উপর রৌপ্য-সূত্রের 'এমব্রয়ডরি' করা সুন্দর পোষাকটি ও সাদা সাটিনের জুতা পরাইয়া আমায় সম্মুখে দাঁড় করাইয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার মুখ খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল! সে প্রফুল্লতার মধ্যে অনেক খানি যে বিজয়ের আনন্দ-গৌরব ছিল, তাহা আমি তাঁহার চোখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম! যেন খুব বড় সেনাপতি একটা মস্ত বড় দুর্গ জয় করিবার জন্য খুব ভাল একদল সৈন্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে! আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"আমায় বুঝি কাল কোনো একটা নতুন 'এ্যাক্ট'করতে হবে?" মাসীমা আমার মুখ খানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে ললাটে চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মা, একেবারে নতুন।"

সেদিন ও তার পর দিন উপহারের জিনিষপত্র ও নিজের সাজ পোষাক লইয়া আমি নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলাম! যথেষ্ট বেলা থাকিতে আমাদের পাশের নদীর তীরটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নূতন গানটা আপনার মনে গাহিয়া গাহিয়া অভ্যাস করিতে লাগিলাম। তখন দ্বিপ্রহরে শীত বা কোয়াসা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া পাখীরাও আমার সঙ্গে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে ছিল। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর মতন উল্লাসে আত্মহারা হইয়া গেলাম! এমন সময় পশ্চাতে শুষ্ক পত্র মর্ম্মর করিয়া উঠিল, আমাদের সঙ্গীত অতিক্রম করিয়া এক গুরু পদশব্দ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল! পিছন ফিরিয়া দেখিলাম,—একজন অপরিচিত পর্য্যটক আমার অদূরে ব্যাগ্রমুখে দাঁড়াইয়া আছেন! ঈষৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলাম। সে ব্যক্তি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া

খুব সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদূরস্থ বাড়িটাই "রেড্ হাউস" কিনা? আমি ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিতেই তিনি পুনশ্চ আমায় অভিবাদন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অপরিচিত পর্য্যটককে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। ইঁহাকে যেন আমি কখনো দেখিয়াছি—যেন ইনি আমার খুব বেশি পরিচিত! অথচ মোটেই তাহা নয়। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া শেষে মীমাংসা করিয়া লইলাম—'হয়তো ইঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।'

একটু পরে নূতন পোষাকে, অলঙ্কারে পুষ্পে ও 'সেণ্টে' সাজিয়া সুবাসিত কুসুমের ন্যায় আমার দর্পণস্থ পরিচিত প্রতিবিম্বকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া মাসীমার উদ্দেশে গেলাম। বড় 'হল' সেদিন তখনো সাজানো চলিতেছিল;—নাচের জন্য নৃত্যাগারটাকে একেবারে আগাগোড়া নূতন করিয়া তোলা হইয়াছিল। সেদিনকার 'বলে' মাসীমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সমারোহে একমাত্র নায়িকা-বোধে আমার মনে সেদিন যে একটু আনন্দ মিশ্রিত গর্ব্বের উদয় হয় নাই তাহা বলিতে গেলে মিথ্যাকথা বলা হয়! মাসীমার 'প্রাইভেট্' ঘরে অবশেষে তাঁহার সাড়া পাইলাম। প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াও তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম! শুনিলাম তিনি বলিতেছেন,—"আশ্চর্য্য হয়েছি! ক্রমাগত লিখে লিখে অবশেষে তুমি আফ্রিকা চোলে যাচ্চো, জানতে পেরে টেলিগ্রাম করে তোমায় আনাতে হয়েচে, আর তুমি বল্‌চো কিনা সাতটার ট্রেণ "মিস্" করলে তোমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি! এ কী রকম লোকের হাতে আমি মেয়ে দোব? যদি তুমি তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক থাকো সে কথা স্পষ্টই কেন বলো না?"

এ কাহার সহিত কথা হইতেছে? আমার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা এমন জোরে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত উত্তেজনার আনন্দে আটকাইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় শুনিলাম তিরস্কৃত লোকটি বলিতেছেন, "আপনি আমার মা, সন্তান দোষী হ'লেও মা তাকে শতবার ক্ষমা ক'রতে পারেন, এত দিন যদি ক্ষমা করেছেন, আরো কিছুদিন করুন, এখন আমি একেবারেই সুস্থ নই।"

তাঁহার কণ্ঠে বেদনা ও কাতরতা যেন ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছিল! আমার

বড় দুঃখ হইল. 'আহা মাসীমা কেন তাঁহাকে আমার জন্ত ভৎর্সনা করিতেছেন? নাইবা তিনি আজ থাকিতে পারিলেন!'

মাসীমা উত্তেজিত স্বরেই বলিলেন, "ক্ষমা আমি শতবার কেন সহস্রবারও করতে পারি; কিন্তু কথা এই যে, এখন 'ভায়ালো' বড় হচ্চে,—তোমার সঙ্গে তার সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হওয়া তো উচিত! নইলে তার স্বাধীন ইচ্ছায় আমিতো চিরকাল চৌকি দিয়ে বেড়াতে পারবো না! কোন্ দিন কাকে হয়তো সে পছন্দ করে বস্‌বে তার ঠিক কি? পড়া-শুনায় বন্ধ আছে তাই রক্ষে নইলে এতদিন কত স্তাবকের গান শুন্‌তে পে'ত তার সংখ্যা আছে? এখুনি তো আর আমি বিয়ে দিচ্চি নে, কিন্তু তার আগে তোমার তো আসা যাওয়া চাই।"

গোপনে কাহারো কথা শুনা উচিত নয় জানিতাম, চলিয়া যাইব স্থিরও করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি একটা অনিবার্য্য কৌতূহল রোধ করিতে না পারিয়া এ অন্যায়টুকু করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি কি উত্তর দেন শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উত্তর শুনিয়া খুবই চমৎকার লাগিল না, বরং মাসীমার এত কষ্ট করিয়া বিশ্লেষণের পরে সেই কুণ্ঠিত-বিষাদপূর্ণ স্বরে সেই সংক্ষিপ্ত 'চেষ্টা করবো' কথাটা আমার সেদিনকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও অভিমানকে এক মুহূর্ত্তে আহত করিয়া ফেলিল! "চেষ্টা করবো" তিনি কি তবে আমার উপর আমারি মতন আগ্রহ রাখেন না? আমিই ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি? তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিয়া তবে কিছু পাইব? কেন আমার দরকার কি? কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই শ্রান্ত পর্য্যটকের অসামান্য সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িল! আমার সেই ছবিখানা মনে পড়িল!—প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া প্রেমের জয় ঘোষিত হইল! তিনি এখনো আমায় দেখেন নাই, দেখিলেও চেনেন না। মাসীমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এতক্ষণে আমার মুখ লজ্জায় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল! তাঁহার জয়ের হাসি মনে পড়িয়া আমারো এখন হাসি আসিল!—বুঝিলাম সেনাপতি অনর্থক সেনা প্রস্তুত করেন নাই!

নিজের ঘরে গিয়া তৃষ্ণা-শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া যে টুকু প্রসাধন স্থানচ্যুত হইয়াছিল ও যে টুকু হয় নাই.সে সমস্ত সযত্নে যথা স্থানে স্থাপন করিলাম। বাম হাতের মধ্যমা অঙ্গুলিতে একটি মুক্তা ও চুণি বসানো আংটি পরিলাম! তার পর বড় 'পারলারে' নিমন্ত্রিতগণের অপেক্ষায় প্রবেশ করিলাম। মনটা

এখন খুব বেশি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; বিলম্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরো অধিকতর অসহ্য হইয়াছিল, কেবলি চোখের পাতা নত হইয়া পড়িতেছিল এবং বুকের মধ্যে অসম্ভব দ্রুত-তালে হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিতেছিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য—অন্যমনা হইবার জন্য একটা পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীতের একটি চরণ মৃদু মৃদু আপনার মনে গাহিতে গাহিতে এক খানা আসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার সেই সঙ্গীতের ক্ষুদ্র চরণ টুকু ফিরিয়া ফিরিয়া আমারি কণ্ঠে অন্যের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! গলা এত কাঁপিতেছিল যে, আমার ভয় হইল, কি করিয়া আজ আমি অভ্যাগতগণের নিকট মর্য্যাদা রক্ষা করিব? একি—আনন্দে আমাকে এমন শক্তি-হীন করিল কেন? কি আশ্চর্য্য! ঘরে যে অন্য এক ব্যক্তি জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাও এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই? আমি অন্ধ হইয়াছিলাম নাকি? ইনিই তো সেই নূতন অতিথি! - নবীন পর্য্যটক—এবং আর—কে? তিনি গভীর বিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া আমি ঘোর লজ্জায় আরক্ত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছি—ছি, তিনি যদি মনে করেন সত্য সত্যই আমি নির্লজ্জের মতন তাঁহাকে দেখা দিতে আসিয়াছি!—কিন্তু বেশি ক্ষণ এ সঙ্কটে থাকিতে হইল না। তিনি বিস্ময় দমন করিয়া কোঁচখানা ঘুরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাত বাড়াইয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন "গুড্ আফ্‌টারনুন"—একটু ম্লান হাসির-সহিত কহিলেন,—"আমি আপনাকে বোধ হয় এখন 'মিস ম্যানিং' বলে সম্বোধন করতে পারি। পূর্ব্বে চিনতুম না, সেজন্য যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা কোরবেন।"

আমি আনন্দে লজ্জায় বিস্ময়ে জড়ীভূত ভাবে ঘাড় নাড়িলাম, এমনি করিয়া আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম পরিচয় সাধিত হইয়া গেল। যে অলক্ষ্য হস্ত আমাদের সকল কার্য্যকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই মঙ্গল হস্ত ভিন্ন সেখানে আর কাহারো সাহায্য আবশ্যক ছিল না। আমরা দু'জনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বিভিন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া অন্তরের মধ্যে একটা পুলক-কম্পন অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি কি ভাবিতেছিলেন জানি না। দু'একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি নতমুখে থাকিয়াও

বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার সৌন্দর্য্য, আমার জীবন, আমার সযত্ন-রচিত সজ্জা সমস্ত আজ সার্থক মনে হইল।

তারপর মাসীমা আসিয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখিয়া প্রথমে যেন খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন, তারপর আমাদের ভাব দেখিয়া হাসিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "গেব্রিয়েল, এই আমার বোনঝি মিস্ ম্যানিং; ভায়োলা, ইনিই মিঃ ব্রাউন।"

তিনি মৃদু-গম্ভীর স্বরে অথচ ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর দিলেন—"আমি ঘরের ছবি থেকে এঁকে চিনতে পেরেচি তা ছাড়া আসবার সময় নদী-তীরে মিস্ ম্যানিং এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ওঁকেই তো আমি 'রেড্ হাউসে'র কথা জিজ্ঞাসা করি।' মাসীমা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন,—"ও-তবে তো তোমাদের মধ্যে বেশ রোম্যান্টিক হ'য়ে গ্যাছে তা গেব্রিয়েল, তুমি বাড়ি পর্য্যন্ত ভুলে গেছ?" তিনি অপরাধীর মতন মাথা নীচু করিলেন—বিজড়িত ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ। আমি এক রকম ভুলেই গেছি বই কি খুব ছোটো বেলা ভিন্ন আর আসা হ'য়ে ওঠেনিতো"। মাসীমা বলিলেন—"আচ্ছা যা হয়েছে তা যাক, এখন থেকে যেন সর্ব্বদা আসা হ'য়ে ওঠে, কি বলো ভ্যালী, আমরা এখন থেকে গেব্রিয়েলের প্রতীক্ষা করবো—কেমন না?"

আমি আরো লাল হইয়া উঠিয়া চক্ষু নত করিলাম,—শুনিতে পাইলাম তিনি গভীর বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তেমনি নিরুদ্যম মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—'আমি চেষ্টা কোরবো।'

মুহূর্ত্তে আমার কল্পনা-কানন তীব্র তাপে শুকাইয়া উঠিল, নিদারুণ আঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু আমাকে আর যাইতে হইল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মাসীমার পানে চাহিয়া বিনয়ের সঙ্গে কহিলেন, 'আজ তবে চল্লুম, বিদায়।"

আলোকময়ী পৃথিবী! তুমি এই মুহূর্ত্তে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাও! সূর্য্য, তুমি আমার অপমান দাঁড়াইয়া দেখিয়ো না! মাসীমার উপর অত্যন্ত ক্রোধ হইল,— ইচ্ছা হইল সমস্ত মুক্তা ও সাটিন কঠোর হস্তে ছিন্ন করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়ি! আমি কি সৌন্দর্য্যের জাল পাতিয়া হরিণ ধরিতে আসিয়াছিলাম? সে দিনকার সমস্ত সঙ্গীত, সমুদয় আলোক ও সমস্ত আনন্দালাপ তিক্তস্বাদ হইয়া গিয়াছিল! (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বুন্দেলখণ্ড-কেশরী

মহারাজ ছত্রসাল

ভারতে আর্য্যসভ্যতা যখন উন্নতির প্রায় চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন বৈদিক ঋষি দীর্ঘ কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বলে যে মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা এই,—

কলিঃশয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।)

অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজ যখন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বা অলস-ভাবে শয়ান থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থা কলিযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ ও জ্ঞানের উন্মেষ হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহা দ্বাপর নামে পরিচিত হয়। যে অবস্থায় মানব-সমাজ আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইবার বা অভ্যুদয় লাভের চেষ্টা করে, সে অবস্থাকে ত্রেতা যুগ বলে। তাহার পর যখন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থা কৃতযুগপদবাচ্য।

প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্য-ঋষি কল্যাদি যুগের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিলে বলিতে হয়, প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে ভারতীয় আর্য্য-সমাজে ত্রেতা যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে যে দিন ভারতীর বরপুত্র কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য-মালা রচনা করিয়া, বৌদ্ধমত-প্লাবিত ভারতের যথেচ্ছাচার কলুষিত সমাজে বেদমূলক আর্য্য ধর্ম্মের সুপবিত্র প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন, সেইদিন হইতে আমাদিগের দেশে ত্রেতা যুগের আরম্ভ হয়। সেইদিন হইতে অবসন্ন হিন্দু-সমাজ নূতন পুলক-সঞ্চারে চঞ্চল হইয়া, বৌদ্ধ প্রভাবের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য উদ্যম প্রকাশপূর্ব্বক "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নশীল হয়। বৌদ্ধ প্রভাব-কালে রচিত মৃচ্ছকটিকের সামাজিক আদর্শের সহিত রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের সামাজিক আদর্শের তুলনা করিলেই আমাদিগের উক্তির যথার্থ্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম

হইবে। কালিদাস যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় করিবার তেমন কোনও প্রবল কারণ দৃষ্ট হয় না। এই কারণে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনারম্ভ ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভকাল বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। ঐ সময় হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যানুসারে, ভারতীয় সমাজে ত্রেতা যুগের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কালিদাসের সময় হইতে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রেরও অভিনব কাব্য অলঙ্কার সাহিত্য ও জ্যোতিষ বেদান্ত প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা এদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ণ সহস্র বর্ষকাল এই উন্নতির স্রোত এদেশে অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া হিন্দু জাতি এক দিকে যেমন সুদূর প্রাচ্য রাজ্য জাপান হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত প্রদেশে বিশাল বাণিজ্য ও উপনিবেশ-মালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ অর্দ্ধ পৃথিবীর ধন-সম্পদভোগের অধিকারী হওয়ায় হিন্দু নরপতিদিগের মধ্যে স্বভাবতই বিলাসিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হর সেন নামক একজন গান্ধার-বাসী হিন্দু আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-রাজধানী পিকিনে ফিরিয়া আসিয়া চীন-সম্রাটের নিকট স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সহ আমেরিকার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হয়। হিন্দুদিগের এই উন্নতি-কালেই মেক্সিকো ও পেরু প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অত্যুন্নতির ফলে হিন্দু নরপতিগণের মধ্যে বিলাসিতা ও মাৎসর্য্যের প্রভাব এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, রণকর্কশ মুসলমান-দিগের হস্তে তাঁহাদিগের পদে পদে পরাজয় ঘটিতে থাকে।

ভারতবর্ষের মুসলমান শাসন কালের ইতিহাসও "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য ঘোষণা করিতেছে। মুসলমানেরা দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুদিগের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ও পুনঃ পুনঃ উত্থান-চেষ্টার জন্য তাঁহারা কখনও অধিকদিন নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। প্রথমত ভারতবর্ষ জয় করিতে মুসলমানকে যেরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল, অন্য কোনও

দেশ জয় করিতে সেরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে মুসলমানেরা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটিপ্রদেশ—(১) পঞ্জাব. (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য. (৫) বাঙ্গালা।" বঙ্কিম বাবু আর একটি প্রদেশের নাম করিতে পারিতেন,—তাহা বুন্দেলখণ্ড। পূর্ব্বোক্ত জনপদ সমূহের অপেক্ষা বুন্দেলখণ্ড জয় করিতে মুসলমানকে অধিক ভিন্ন অল্প ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে দীর্ঘকালের চেষ্টায় ঐ প্রদেশ আংশিক জয় করিয়াও তাঁহারা অধিক দিন তাহা আপনাদের শাসনাধীন রাখিতে পারেন নাই। ভারতের দুই একটি প্রদেশ ভিন্ন অপর সকল প্রদেশেরই হিন্দুগণ প্রথমে মুসলমান শক্তিকে বাধা দিয়া ও তাহার পর ঐ শক্তির উপর জয় লাভ করিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিককে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

"So far as now can be estimated the advance of the English power in the beginning of the present (19th) century alone saved the Moghal Empire from passing to the Hindus. The British won in India not from the Moghals but from the Hindus,—W. W, Hunter's History of the Indian people,

এই কারণে ভারতের মুসলমান শাসন-কালীন পঞ্চ শত বৎসরের ইতিহাসকে পরাধীনতার ইতিহাস না বলিয়া "হিন্দু সমাজের সকল জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস" নামে আখ্যাত করাই বিধেয়। এই সকল জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসে হিন্দুদিগের পুনঃ পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই বৈদিক বাণীর স্মরণ করিয়া ঐ কালকে হিন্দুসমাজের ত্রেতা যুগ বা ত্রেতাবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়; তাই বলিতেছিলাম, প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে ভারতে ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈদিক ঋষির মতানুসারে ত্রেতা যুগের প্রধান লক্ষণ পুনঃ পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা। দক্ষিণাপথে, রাজপুতনায় ও পঞ্জাবে এই চেষ্টা যেরূপে হইয়াছিল, তাহার অল্লাধিক বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট বিদিত আছে। বুন্দেলখণ্ডবাসীর উত্থান চেষ্টার পরিচয় এদেশের অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত

এই কারণে এই প্রস্তাবে আমরা সেই পরিচয় দান করিবার সংকল্প করিয়াছি। দাক্ষিণাপথের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শিবাজীর নাম যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, রাজ-স্থানের ইতিহাসে প্রতাপ যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে মহারাজ ছত্রসালের নাম সেই গৌরবকর স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যচেষ্টার ফলেই সম্রাট্ আওরঙ্গ জেবের শাসনকালে বুন্দেলখণ্ডবাসী "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই বৈদিক-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

বুন্দেলখণ্ড ভারতবর্ষের কেন্দ্র-ভাগে—এই রত্ন-গর্ভা ভারত-ভূমির মধ্যবিন্দু-রূপে অবস্থিত। এই প্রদেশের উত্তর প্রান্ত খর-স্রোতা কালিন্দীর নীল জল-রাশি দ্বারা সর্ব্বদা ধৌত হইতেছে; ইহার পশ্চিম দিক্ দিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধ; স্বচ্ছতোয়া চর্ম্মন্বতী (চাম্বেল) নদী ধীর-মন্থর গমনে, তট-ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে, যমুনার শ্যাম সলিলের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ-স্থিত সাগর, জব্বলপুর প্রভৃতি সুরম্য প্রদেশ সমূহ বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্ব দিকে বাঘেল খণ্ডের অন্তর্গত, রত্ন-খনি-নিকরে পরিপূর্ণ রেওয়া প্রদেশ ও বিন্ধ্যাদ্রির চিত্রকূট-প্রমুখ শিখর-মালা। হীরক-খনির জন্য প্রসিদ্ধ পান্না চরখারী রাজ্য, ১৮৫৭।৫৮ সালের সিপাহী-বিপ্লবে লব্ধগৌরব ঝাঁসী ও কাল্পীপ্রদেশ এবং বর্ত্তমান কালের অর্দ্ধ স্বাধীন ওরছা (তেহেরী), দতিয়া; সমথর, ছত্রপুর, বিজাবর ও অজয়গড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় করদ রাজ্যগুলি বুন্দেলখণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বেত্রবতী নদী ও ধসান, পহুজ, কেন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী এবং মদন-সাগর, কিরাত-সাগর, কাচনেরা, বরওয়া-সাগর, ও পাচওয়ারা-প্রমুখ যোজন-ব্যাপী প্রকাণ্ড সরোবর সমূহ এই প্রদেশের রমণীয়তা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

মালব-প্রদেশের ন্যায় বুন্দেলখণ্ডও রাজপুত-প্রধান দেশ। বুন্দেলারা শৌর্য্য ও সাহসে ভারতবর্ষের কোনও বীর জাতীর অপেক্ষাই হীন নহেন। ইঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী। এই কারণে পাঠানদিগের সবিশেষ চেষ্টা-সত্ত্বেও এই প্রদেশের অতি অল্পাংশ-মাত্র মুসলমানের করতল-গত হইয়াছিল, কিন্তু সে আংশিক অধিকারও তাঁহারা চিরকাল সমান রাখিতে পারেন নাই। বুন্দেলা নরপতিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করিয়াছেন। মোগলদিগের আমলেও সম্রাট্ শাহজাহানের সিংহাসনারোহণ-কাল পর্য্যন্ত বুন্দেলারা শৌর্য্য-সহকারে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য প্রায় অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিলেন। শাহ জাহানের রাজত্ব কালে তাঁহারা দুইবার মোগল-সর্দ্দার বাকী খাঁন ও শাহবাজ খাঁনকে এবং একবার স্বয়ং সম্রাট্কে সম্মুখ সমরে পরাভূত করিয়া বুন্দেলখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অন্যতম দলপতি মাহোবার রাজা চম্পৎ রায়ের শৌর্য্য-বলে মোগলদিগকে বুন্দেলখণ্ডে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইতে হয়। এই কারণে সম্রাট্ শাহ জাহান চম্পৎ রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। চম্পৎ রায়ও মোগল-শক্তির প্রাবল্য অনুভব করিয়া কিঞ্চিৎ মস্তক অবনত করেন। তাহার পর রাজকুমার আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অভিযান-কালে চম্পৎ রায়ের নিকট সৈন্য-সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন! সিংহাসন-লাভ করিবার পর আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের মনসব্দার-পদে নিয়োজিত করিয়া ওরছা হইতে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ জাইগির-স্বরূপ প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন দিল্লীর দরবারের প্রথম শ্রেণীর উমরাহগণের মধ্যেও তাঁহাকে প্রথম স্থান দান করা হয়। কিন্তু তেজস্বী চম্পৎ রায় এই অবস্থায় দীর্ঘকাল যাপন করিতে না পারিয়া মোগলদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সংঘর্ষে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রত্যাবর্ত্তন *

৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার অমৃতসর হইতে লাহোর যাত্রা কালীন একটী বিশেষ কথা মনে পড়িয়া গেল। যশোহরের পাঞ্জাবী বন্ধুরা যাঁহার নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, একবার তাঁহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম পশমীনা কাটরা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবে, কিন্তু এখন জানি-

* দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ" পত্রে আমার 'হিমালয়-ভ্রমণ' প্রবন্ধ শেষ হইয়া গেলে মনে করিয়াছিলাম, ঐ খানেই বৃত্তান্ত শেষ করিব। কেননা, আমার 'প্রধান বক্তব্য "ঋষিকেশ" এবং "অমৃতসর" তাহা শেষ হইয়াছে। কিন্তু

লাম, আমার অবস্থিত ছত্রের নিকটে বড় রাস্তাটিই পশমীনা কাটরা। তখন মনে মনে একটু হাসিলাম! যাহা হউক আমি বংশীধর বাবুর সন্ধানে বাহির হইয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাঁহার দোকানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পত্র খানি দিলাম। তিনি আমাকে দোকানের উপর বসাইয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র মুরলীধরও উপস্থিত ছিলেন। পিতা-পুত্রে পত্র পড়িয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অনুযোগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন প্রথমেই এখানে আসেন নাই?" আমি বলিলাম, যদিও এ সহরে আমার কেহই পরিচিত ছিলেন না তথাপি ভগবানের কৃপায় আমার কোনো অভাব বা কষ্ট হয় নাই; এক্ষণে আপনারা আমার ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। তারপর বংশীধর, মুরলীধর আমাকে কয়েক দিন তাঁহাদের গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি কাতরভাবে বলিলাম, আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না, আজই রাত্রে লাহোর যাত্রা করিব। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু সৎ প্রসঙ্গ হইল। মুরলীধর, সুন্দরমূর্ত্তি, কোমল-হৃদয়, সাধু-ভক্তানুরাগী যুবক। স্বভাবটি বেশ শিষ্য-প্রকৃতির; তাঁহাকে আমার খুব ভাল লাগিল। অবশেষে আমি আজই চলিয়া যাইতেছি বুঝিয়া অন্তত রাত্রির জন্য আমাকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে "এখানে এক মহাত্মা আছেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "এখন আমি সহরের বাহিরে ক্যানেল-ধারে বেড়াইতে যাইব মনে করিয়াছি।" "তাঁহারা বলিলেন, বেশতো মহাত্মার আশ্রমও সেই খানে"

এখনো পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "প্রত্যাবর্ত্তন কালীন আরো বক্তব্য আছে কি না?" তদ্দারা এই বুঝা গেল যে, তাঁহারা আরো শুনিতে চাহেন! আমিও বাস্তবিক দেখিতেছি প্রস্তাব শেষ হয় নাই। দেশে ফিরিবার কালীন নানা স্থান হইয়া আসিতে আসিতে ভগবানের যে সকল করুণার পরিচয় পাইয়াছি,—যাহা বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে একান্ত সুখ-পাঠ্য যদি পাঁচটি আত্মাও তাহা শুনিতে চাহেন, আমার অপ্রকাশ রাখা উচিত নহে। এই জন্যই আমি আমার "প্রত্যাবর্ত্তন" কাহিনী বলিতে বাধ্য হইলাম। দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

এই বলিয়া "তরণ তারণ বাগ" তাঁহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন। বেলা তখন প্রায় ৪টা। আমি বোধ হয় ক্রমাগত সহরের দক্ষিণ দিকেই গেলাম, কেন না, রাত্রে টে্রণে চলিয়া প্রাতে কোনো সহরে নামিলে প্রায়ই দিক-ভ্রম হইয়া থাকে। আমি কোনো কোনো স্থানে সূর্য্য দেখিয়া দিক ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম। দুই মাইল গিয়া অনুসন্ধানের পর "তরণ তারণ বাগ" উদ্যান-বাটীকা পাইলাম। সেটা নানাবিধ ভিখারী-সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটা আড্ডা বিশেষ। মহাত্মা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কেহ কেহ একটু ভিতরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমি যখন মহাত্মার কুটীরের (পাকা ঘর) দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি হাত মুখ ধৌত করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। আমি একটু অপেক্ষা করিলে তিনি আসিয়া আমাকে বসিতে আসন দেখাইয়া দিলেন। তিনি প্রশান্ত-মূর্ত্তি, প্রৌঢ়বয়স্ক সুশ্রী পুরুষ। ব্যাঘ্র-চর্ম্মের এক পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মাথার টুপিটি পর্য্যন্ত ঐ এক প্রকার চর্ম্মের। শয্যাদিও ব্যাঘ্র-চর্ম্মের। আমার দুই চারিটি কথায় বোধ হয় তিনি আমার উদ্দেশ্য ও ভাব বুঝিয়া লইলেন। তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহারও আভাষ পাইলাম। কিন্তু কেন জানি না, তিনি এ মূর্খের প্রতি অল্পক্ষণেই অত্যন্ত স্নেহ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে কয়েক দিন সেই খানে থাকিতে বলিলেন। আমি কুণ্ঠিত-ভাবে জানাইলাম যে, আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। অদ্যই লাহোর যাত্রা করিব।

আমি বাস্তবিক সাধু কিম্বা ভক্ত নহি; কেবল ভগবানের কৃপায় কিছু কাল তাঁহার পথে পড়িয়া থাকিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সংসারে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহই হউক বা প্রীতি-প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যেই হউক, যে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনো কোনো সাধু ভক্তের মধ্যে একাধারে প্রকাশ পায়। বোধ হয় তাহার কারণ, ভগবানে সকল ভাব গুলি একাধারেই কেবল বর্ত্তমান, ভক্ত, ভগবানেরই ক্ষুদ্র-আদর্শ, সুতরাং ভক্তের সেই প্রকার ভাব হওয়া স্বাভাবিক। আজ এই সাধুর মধ্যে যেন সহসা সেইরূপ এক আশ্চর্য্য ভাবের বিকাশ দেখিলাম। সাধুজী আমার কথায় যেন একটু দুঃখিত হইয়া; আমার মুখের দিকে "ফ্যাল ফ্যাল" করিয়া চাহিতে লাগিলেন। সেই চাহনির মধ্যে যেন কি এক স্নেহভাব প্রকাশ পাইতেছিল। তাহা মাতৃ-স্নেহ কিম্বা পিতৃ-স্নেহ-ভাব বলিব তখন ঠিক যেন বুঝিতে পারি নাই! তারপর তিনি মৃদুস্বরে

বলিলেন,—"কুছ চাইয়ে ?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, আপলোককেঁা কৃপাসে সব কুছ পুরা হয়।" তথাপি বলিলেন "তব্ বি কুছ কুছ ?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমার গাত্রে পাত্‌লা কাপড়ের 'যাদশাপসন্দ' পিরাণটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা একটো কুরতা চাইয়ে, আচ্ছা, বৈঠ।" তারপর একটি টাকা আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন,—"বংশীধরকো বোল্‌না কুরতা বানায় দেগা।" অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনাটি হইল বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য ইহার একটি অব্যক্ত স্মৃতি মনে রহিয়া গিয়াছে।

বেলা শেষ হইয়া আসিল, ক্যানেলের দিক দিয়া সহরে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ছত্র হইতে আসন লইয়া দ্বারবানের নিকট বিদায় হইলাম। বংশীধরের দোকানে আসিতে একটু রাত্রি হইল। তথায় কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া সেই রাত্রেই (সময় ডায়রীতে লেখা নাই) লাহোর যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব দিন অমৃতসরের একটি বাঙালী ভদ্রলোক আপনা হইতে একখানা ইনটার ক্লাস টিকেটের দাম দিয়াছিলেন। (ক্রমশ)

দৃষ্টি

আমি আপনারে নাহি জানি যত খানি
তার চেয়ে বেশী মোরে জেনেছ কি তুমি ?
কোথা স্বর্ণ-খনি মোর কোথা রত্ন-ভূমি
তুমি রাখ সে সংবাদ ! আমি যা' না জানি
আছে কি না আছে মোর ত্রি-সীমার মাঝে
তুমি অনায়াসে আসি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
দেখাইয়ে দিলে কোথা গোপনে বিরাজে
অজ্ঞাত সম্পদ মোর ! তবু ভালবেসে
হয়েছ কি সর্ব্বদর্শী, নশ্বর-দর্পণে
হেরিছ কি যুগপৎ ভূত ভবিষ্যৎ—
সম্পূর্ণ করিয়া মোর সমগ্র জীবনে ?
চির দারিদ্র্যের তরে ঐশর্য্যের পথ
এখনো রয়েছে খোলা, হে রমা আমার
মোর বক্ষে থাকে যদি তোমার ভাণ্ডার।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

দক্ষিণ রায়

যাঁহার ভুজবলে ব্রাহ্মণ বঙ্গাধিপ মুকুট রায় বহুদিন পর্য্যন্ত নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহার নিকট বার বার পরাজিত হইয়া পাঠানেরা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাঁহার প্রতাপে ব্যাঘ্র, কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রাণি-হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। যিনি ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়া সুন্দরবনাঞ্চলে এখনও পূজিত হইয়া থাকেন। যাঁহার উদ্দেশে 'রায় মঙ্গল' পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। যে বীর-পুরুষের নামে বাঙালী নাম ধন্য হইয়াছিল, তাঁহার বিশেষ পরিচয় যে কেহই অবগত নহেন,—ইহা কি নিরতিশয় দুঃখের বিষয় নহে ?

গৌড়ের পাঠান বাদশাহদিগের রাজত্বকালে ইছামতী হইতে ভৈরব-তীর পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গুড় উপাধিধারী পরে 'রায়' ও "রায় চৌধুরী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অধুনা—যশোহর নামে পরিচিত ভূভাগ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার ছিল। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও যশোহর জেলার অনেক স্থানে বাস করিতেছেন। অনেকের ভূসম্পত্তিও আছে।

গুড় বংশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, যৎকালে পাঠানেরা গৌড় অধিকার করে তখন আধুনিক যশোহর জেলার অন্তর্গত ভূভাগ অনেক নদ নদী খালে বিলে পূর্ণ ছিল। নদীতীরস্থ ভূভাগে কৈবর্ত্ত জাতির বসতি ছিল। তাহাদের বংশধরগণ এখন রাজবংশী নামে খ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রদত্ত জল ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল জেলে-রাজার আশ্রয়ে আসিয়া গুড় ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারাই রাজবংশীদিগকে জলাচরণীয় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া তাহারা অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল অথবা কার্য্যতঃ করিয়াও থাকিবে। সেই জন্য গুড় ঠাকুরেরা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া আপনারা রাজা হইয়াছিলেন এবং পাঠান আমলে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। যখন মুসলমানেরা ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিল তখন অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গুড় মহাশয়েরাই প্রথম নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে

চেঙ্গটিয়ার ভূস্বামী কামদেব ও জয়দেব, সর্ব্বপ্রথম স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়েই 'পিরালী' থাকের সৃষ্টি হয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে যে সকল ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ নগর (বা লাউজানি) প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মুকুট রায় এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। উত্তরে ঝিনাইদহ হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। নবাব খাঁ জাহান আলীর সময় হইতে তাঁহারা মুসলমানের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, বটে কিন্তু সে অধীনতা নাম মাত্র। রাজা মুকুট রায়ের নিজের সৈন্যদল, সেনাপতি নৌসেনা প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জার অভাব ছিল না। রাজা মুকুট রায় অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি মুসলমানের অধীন হইলেও কখন মুসলমানের মুখ দেখিতেন না। মুসলমানের সহিত আলাপ করিতেন না। মুসলমান পথিক, ফকির বা ব্যবসায়ীকে রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। কিন্তু এই গোঁড়ামী পরিণামে তাঁহার ধ্বংশের কারণ হইয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি বিলক্ষণ মুসলমান-দ্বেষী হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ রায় মুকুট রায়ের আত্মীয় ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি যেমন রূপবান তেমনই দৈহিক-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অসীম শক্তির অনেক প্রবাদ আছে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য তিনি সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা মুকুট রায়ের নগরে "মুকুটেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দক্ষিণ রায় তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিলেন। শিব পূজা না করিয়া তিনি কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার শারীরিক বল ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণানুবাদ তাঁহার পরম শত্রু মুসলমানগণের মুখে আজও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ আছে যে, কোন সময় দক্ষিণ রায় নদীতে নামিয়া স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় এক বৃহদাকার কুমীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি পদাঘাতে কুমীরের দাঁতের পাটি উড়াইয়া দেন এবং কুমীরের মৃত-দেহ জলে ভাসিতে থাকে। যে সকল মুসলমান বীর ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু যে সকল বাঙালী বীর ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র লাউসেন ভিন্ন আর কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই! দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের দেবতা

বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন কিন্তু কিরূপে তিনি এই পূজা পাইয়া আসিতেন তাহা সকলে অবগত নহেন। আমাদের দেশে যখন নীলকর সাহেবেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন তখন সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত যে, নীলকর ওয়াট সাহেবের নামে কুমীর বা বাঘ হিংসা করিত না। তাঁহার নামে দোহাই চলিত দক্ষিণ রায় সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তবে বেশীর ভাগ, তিনি অস্ত্র সাহায্য না লইয়া অনেক বাঘ কুমীর বধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার শত্রুগণের রচিত পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমান সেনাপতি গোরাগাজি বা পীর গোরাচাঁদ যখন ব্যাঘ্র সৈন্য লইয়া মুকুট রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন দক্ষিণ রায় বাহুবলে তাঁহাকে বার বার পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মুসলমানেরা কিরূপে ব্রাহ্মণ-রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইল তাহা বারান্তরে বলিব।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহাপুরুষ মোহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার

আবুবেকরের প্রতি অত্যাচার। *

যে দিবস (হজরতের পিতৃব্য) হমজা এস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই দিবস আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা এই ;—যাঁহারা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান নামে অভিহিত হন। এপর্য্যন্ত উনচত্বারিংশৎ লোকমাত্র মোসলমান হইয়াছিলেন। উনচল্লিশ জন বিশ্বাসী দলভুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আবুবেকর হজরতকে বলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আর কেন এসলামধর্ম্ম গুপ্ত রাখিব, দলবদ্ধ হইয়া সকলে কেন প্রচার করিব না ?" মহাপুরুষ মোহম্মদ কহিলেন, এখনও "এবিষয়ে সম্পূর্ণ বল লাভ হয় নাই।" আবুবেকর তদ্রূপ প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে হজরতকে দৃঢ় অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সদলে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং কাবার প্রাঙ্গণে যাইয়া বসিলেন। আবুবেকর দাণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। উপদেশে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করা হয়। পৌত্তলিক কোরেশদিগের নিকটে তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়া উঠে।

* স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশচন্দ্র সেন কৃত "মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত" হইতে উদ্ধৃত।

তাহারা মোসলমানদিগকে গুরুতররূপে আক্রমণ করে। প্রথমতঃ আবুবেকরকে আক্রমণ করে। রবয়ের পুত্র আতবা আবুবেকরের মুখে এরূপ পাদুকা প্রহার করে যে, দৃঢ় আঘাতে তাঁহার নাসিকা চূর্ণ হইয়া মুখ মণ্ডলের সঙ্গে সমতল হইয়া যায়। তমিম পরিবারের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া আবুবেকরকে সেই নির্দ্দয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন ও তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহে লইয়া যান। সেই দিন তাঁহার ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছিল, দিবারাত্রি চৈতন্য ছিল না। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথমতঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, "হজরত মোহম্মদের অবস্থা কিরূপ ?" আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ভৎসনা করিয়া বলিল, "চুপ কর, মোহম্মদের নিমিত্ত তোমাকে এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইল তুমি এক্ষণও সেই প্রকার তাহার জন্য উন্মত্ত!" মাতা ওম্ম খয়র অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, যে পর্য্যন্ত হজরত কিরূপ আছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত না হইব তাবৎ অন্ন গ্রহণ করিব না।" জননী বহু কাকুতি মিনতি করিলেন, কোন ফল দর্শিল না। অনন্তর আবুবেকর স্বীয় মাতাকে হজরতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য খেতাবের কন্যা ওম্মজমিলের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ওম্মজমিল স্বয়ং আবুবেকরের নিকটে আসিয়া বলেন, "চিন্তা নাই হজরত কুশলে আছেন।" আবুবেকর বলিলেন "আমি সংকল্প করিয়াছি যে, প্রেরিত পুরুষকে দর্শন না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না।" এই বলিয়া তিনি নিশার আগমন পর্য্যন্ত কিছুই ভোজন করিলেন না। রাত্রিকালে রাজপথ জনশূন্য হইলে উক্ত দুই মহিলা আবুবেকরকে উঠাইয়া হজরতের নিকটে লইয়া যান, হজরত তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন দান করেন। অন্য মোসলমান সকল প্রেমালিঙ্গন দেন। সকলে তাঁহার ক্লেশ যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবুবেকর বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, দুরাত্মা আত্‌বা আমার মুখে যে আঘাত করিয়াছে, এই ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা ব্যতীত আমার অন্য কোন ক্লেশ নাই, এক্ষণে আমার জননী আপনার নিকট উপস্থিত, আপনি প্রার্থনা করুণ যেন ঈশ্বর তাঁহাকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন।" তখন হজরত মোহম্মদ আবুবেকরের জননী ওম্মখয়রের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, তদনুসারে ওম্মখয়র দীক্ষিতা হন। হজরত বন্ধুবর্গ সহ সেই গৃহে কয়েকদিন স্থিতি করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সংবাদ

পাসের কথা—গোবরডাঙ্গা জমিদার পরিবারের পরলোকগত ছোট বাবু প্রমদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় হেয়ারস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সংবাদ যথা সময়ে জানিতে না পারায় গতবারের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইণ্টার মিডিএট্ পাস —কুশদহ-বাসী কত ছাত্র নানা স্থান হইতে ইণ্টার-মিডিএট্ পাস করিয়াছে, তাহার সমস্ত সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে; যে কয়েকটির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান মুরারীধর কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আই এ, প্রথম বিভাগে; বেড়গুম নিবাসী শ্রীযুক্ত-ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্কটীস চার্চ্চ হইতে আই এ, প্রথম বিভাগে; ও পরলোকগত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হাজারীবাগ সেণ্ট কলম্বস কলেজ হইতে আই-এ, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বালিকা পাস —আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গোবর-ডাঙ্গার অন্তর্গত সুলতানপুর নিবাসী ডাক্তার কাজি আবদল গফ্‌ফরের কন্যা কুমারী সোফিয়া বেথুন কলেজ হইতে আই-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এখানে ডাক্তার কাজি সাহেবের একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাজি আবদল গফ্‌ফর সাহেব ৩৫ বৎসরাধিক কাল হইতে ধর্ম্ম সাধন, ও পারিবারিক শিক্ষা বিধান এবং সমাজ-সংস্কার ব্রতে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী, নিষ্ঠাবান, নিরামিষ-ভোজী সাধক। এ বিষয়ে তাঁহাকে তৎপ্রদেশস্থ মোসলমান সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলা যায়।

বনগ্রাম হাই স্কুল —বর্ত্তমান ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় মহকুমা বনগ্রাম হাই স্কুল, প্রথম হইয়াছে। প্রেরিত ৪টি ছাত্রই প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া, একটি প্রথম ২০৲ টাকা, দুইটি ১০৲ টাকার স্কলারসিপ্ প্রাপ্ত হইয়াছে। কুশদহবাসীর পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই আহ্লাদের সংবাদ যে, গোবরডাঙ্গা-গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, বনগ্রাম স্কুলের হেড্ মাষ্টার।

বান্ধব-পুস্তকালয় —জ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আলোচনার্থে সাধারণ পুস্তকালয় (লাইব্রেরী) যে বিশেষ অনুকূল তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে এইরূপ একটি শুভ চেষ্টা হইয়াছিল; তখন সময় তেমন অনুকূল হয় নাই, এক্ষণে সময়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ভগবানের কৃপায় গোবরডাঙ্গার কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। আমরা আশা করি এই পুস্তকালয় যেন কেবল নাটক নভেল পড়িবার স্থান মাত্র না হইয়া, যাহাতে জ্ঞান এবং নীতি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন জন্য সদালোচনার স্থান হয়, উদ্‌যোগীগণ তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। দ্বিতীয় কথা দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রকৃত প্রণালীতে ইহার নিয়মাবলী গঠন করা আবশ্যক। লাইব্রেরীর নাম "কুশদহ বান্ধব পুস্তকালয়" রাখা যদি সকলের মত হয় তবে তাহাই রাখিলে ভালো হয়।

আবার শোক-সংবাদ —কুশদহ তাম্বুলী সমাজে ভালো ছেলের সংখ্যা অতি কম। তাহার মধ্যে যদি কেহ অকালে পরলোকে চলিয়া যায়, তবে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। এই অল্পদিন হইল আমরা গৌরহরিকে ইহলোকে হারাইলাম! আবার বিগত ১৫ই আষাঢ় শুক্রবার খাঁটুরা এবং কলিকাতার কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখমগোপালের পরলোক গমন বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মাখমগোপাল বাস্তবিক একটি ভালো ছেলে ছিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে এণ্টান্স পাস করিয়া ফাষ্ট-আর্ট পড়িবার জন্য সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইবার পরই ব্যারামের সূচনা হয়, এবং দেড় বৎসরাধিক কাল কত চিকিৎসা ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও শেষে কিছুই হইল না। ভগবান, তোমার কি খেলা? তুমি ইহাদিগকে লইয়া গিয়া ভবিষ্যতের জন্য কোন্ রাজ্য গঠন করিতেছ, তাহা তুমিই জান, আমরা আর কি বলিব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মাখমগোপালের জননী তো আগেই সে লোকে গেলেন; এখন ভব-পান্থের শ্রান্ত-পথিক, শোকার্ত্ত পিতার প্রাণে তুমি ভিন্ন আর কে সান্ত্বনা দান করিবে।

সচ্চেষ্টা।—অধিকাংশ পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে সুতরাং তাহার লোক যাত্রা নির্ব্বাহকর পাঠশালা, স্কুল, পথ ঘাট, পোষ্টাপিস প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য-প্রণালীগুলির অবস্থাও ভালো রাখা কঠিন হইয়া পড়ি-

তেছে। আমাদের একটা কথা ভাবা নিতান্ত আবশ্যক এই যে, আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ভবিষ্যৎ বংশ, আমরা কি তাহাদের জন্য কার্য্য করিতে দায়ী নহি? দেশের স্কুল পাঠশালা গুলি যদি উঠিয়া যায় তবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে?—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গোবরডাঙ্গা—ইছাপুর নিবাসী বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের স্কুল এবং পোষ্টাপিস প্রভৃতির অবস্থা ভালো করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শ্রাবণ সংখ্যা "কুশদহ" আকারে এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু বার্ষিক চাঁদা পূর্ব্ববৎ ১৲ টাকাই রহিল। আমরা নূতন গ্রাহক চাই; এবং পুরাতন গ্রাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র চাঁদা প্রেরণ করুন।

গ্রন্থ-পরিচয়

শেফালিগুচ্ছ—শ্রীমতী সুকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত; এবং তথা হইতে শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য বারো আনা মাত্র।

এখানি কবিতা পুস্তক, লেখিকার এই প্রথম উদ্যমে কোনোরূপ অস্বাভাবিকতা বা অস্পষ্টতা নাই দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। কবিতাগুলি বেশ প্রাঞ্জল, মধুর ও সদ্ভাবপূর্ণ। বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার এই সব অমৃতময় ফল, স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদিগকে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ করিবে। এই কবি অবরোধ-বাসিনী মহিলা, বর্ত্তমান সময়োপযোগী উচ্চশিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ ইঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু ইনি কবি—তাই হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগগুলি, অন্তরের একান্ত নিজস্ব ভাবগুলি স্বতইবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনোরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধার অপেক্ষা করে নাই। কবিতাগুলিতে আবেগ আছে,—স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে,—অশ্রুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান আছে,—বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা আছে। সাধনা করিলে এই কবি কালে কাব্য-সাহিত্যে আপনার পথ করিয়া যশোলাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ সুন্দর দিব্য নয়ন-রঞ্জন হইয়াছে।

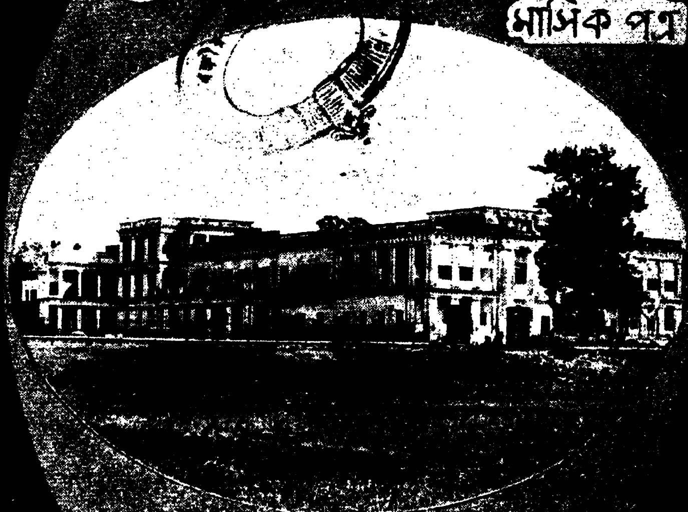
সমালোচক।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Massine Press 35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from 28/1 Sukea Street, Calcutta

তৃতীয় বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৮। [৫ম সংখ্যা।

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাসযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। ভাদ্র, ১৩১৮ ৫ম সংখ্যা।

নূতন-গান

(মিশ্র জয়জয়ন্তি—দাদ্‌রা)

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অদ্বৈত-জ্ঞান

বা

জ্ঞানীর লক্ষণ

তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধন-পথে চলিতে চলিতে সাধকের পক্ষে প্রায় এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন তিনি মনে করেন, "আমি 'আত্ম-তত্ত্ব-বিদ্যা' লাভ করিয়াছি।" ইহা মনে করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন,—আনন্দিত হন। কিন্তু উন্নতিশীল সাধকের পক্ষে এ আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

অজ্ঞানতার মূল কারণ "দেহাত্মিকা বুদ্ধি" অর্থাৎ এই দেহই 'আমি', এই বুদ্ধির নাম দেহাত্মিকা বুদ্ধি। জ্ঞানের মূল কারণ "নিত্যানিত্য-বিবেক" অর্থাৎ নিত্য বস্তু কি? অনিত্য বস্তুই বা কি, এই প্রকার বিচার-বুদ্ধির নাম নিত্যা-নিত্য-বিবেক। দেহ 'আমি' এই ভ্রান্তি হইতে 'আমার' সংসার এই ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে বলে 'মায়া-মোহ'। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিত্ত, এই প্রকার ধারণা মায়া-মোহের মূল। মোহ অবসানে বা জ্ঞানোদয়ে আমি দেহ নহি,—আমি আত্মা, আমি স্থূল বস্তু নহি, কিন্তু পরমাত্মা—পূর্ণ-জ্ঞান চৈতন্যের অংশ মাত্র. সুতরাং আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার নহে, ভগবানের স্বরূপাংশ মাত্র. এ জগৎ সংসার সকলই ভগবানের। আমি আত্মা, আমার প্রকৃত স্বরূপ যাহা, তাহা জ্ঞানের স্বরূপ, চৈতন্যেরই স্বরূপ; আমি আত্ম-স্বরূপে জরা-মরণাতীত অবিনাশী পদার্থ; আমি সংসারের মোহ-বদ্ধ জীব নহি। এই তত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলে আত্ম-জ্ঞানের একটি প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায়। এই জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রথম সোপানে আরোহণকারী নব-জীবন প্রাপ্ত সাধকের পক্ষে আনন্দের দ্বিতীয় কারণ এই যে, তখন তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত মানুষ অনুভব করেন। তাঁহার ভাব, ভাষা, রুচি এবং কামনা সমস্তই জীবনের মূল উদ্দেশ্যাভিমুখীন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নূতন মানুষ করিয়া তোলে। ভগবানের ইচ্ছা পালন ভিন্ন তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য থাকে না। আপনাকে অকিঞ্চন—দাসানুদাস রূপে পরিণত করিতে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া, নর-সেবায় আপনাকে অর্পণ করিতেই তাঁহার বাসনা

প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু সেবার কার্য্য করিতে করিতে সাধক পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হন। কেন যে এমন হয় প্রথমে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি যাহা করিতে চান, যেন তাহা গড়িয়া উঠে না। বার বার চেষ্টা ভাঙিয়া পড়ে; কখনো কখনো অবিশ্বাস আসিয়া মনে হয়, তবে কি আমি যাহা করিতেছি তাহা ভুল করিতেছি; বিশ্বাস তখনো ভিতর হইতে বলে, না, ভুল কোথায়? অগ্রসর হও, সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে!

মানুষ যে আপনাকে "আমি" বোধ করে, তাহা মৌলিক। এই আমি বোধ না হইলে মানব, চেতনা-রাজ্যে, জীব-চৈতন্য বা জীবাত্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইত না। জড় আপনাকে "আমি" বোধ করে না, বৃক্ষ লতারাও করে না; ইতর প্রাণিগণ করে মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞান,—সেই বোধ-শক্তি অমুক্ত; মানব-জ্ঞান মুক্ত, স্বাধীন, অনন্তমুখীন।

এই "আমি" জ্ঞান প্রথমে স্থূল প্রকৃতি জড়িত হইয়া দেহ "আমি" জ্ঞান হয়। তারপর ক্রমে উন্নত হয়; শেষ পুনরায় সেই 'আমি' জ্ঞানই উন্নত জ্ঞান-পথের বিঘ্ন জনক হয়। "দেহাত্মবুদ্ধি" চলিয়া গেলে, 'আমি' আত্মা এই জ্ঞান লাভের পরেও মনে হয়, আমি এই অনন্ত-বিশ্বের মধ্যে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি; জগৎ, ব্রহ্ম এবং আমি এক একটি ভিন্ন অস্তিত্বের, এই ধারণা অজ্ঞানতা মূলক, সুতরাং পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী। ইতিপূর্ব্বে না হয় স্থূল ভাবে দেহ "আমি" বোধে আপন স্বতন্ত্রতা অনুভব করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবে আত্মা "আমি" জ্ঞান করিতেছি। জগৎ ও ব্রহ্মের সহিত আমার অস্তিত্ব যে এক, আমি যে জগৎ এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহি, একথা হয়তো বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, বারম্বার বলিতেছি, তথাপি বাস্তবিক স্বরূপ-তত্ত্বে আমার সে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দ্বৈত-জ্ঞান পরিচালিত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র 'আমি" বোধ করিতেছি।

দেহ "আমি" জ্ঞানের অবসানে আত্মা "আমি" জ্ঞানে অজর, অক্ষয়, অশোক হইয়া অনেক আনন্দ পাইলাম—সেবার কার্য্যেও অনেক আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম, কিন্তু আমি যাহা চাই তাহা এখনো পাইলাম না, কি যেন এক বাধা আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। আমি এখনো কেন অনাবিল আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারিতেছি না?

এইরূপে চলিতে চলিতে সাধক, ভগবৎ প্রসাদে যখন প্রকৃত 'অদ্বৈত-জ্ঞান-তত্ত্ব' শ্রবণ করেন, তখন বলেন "হায়! আমি এত দিন কি

করিতেছি কি ভাবিতেছি আজিও যে আমার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই।”

আত্ম-জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায়, ‘অদ্বৈত-জ্ঞান’ লাভ হয়; তখন বুঝিতে পারি “আমি” স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি কিছুই নহি। আমি এই বিশ্বের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। আমার যে স্বতন্ত্র জ্ঞান, সে কেবল সংজ্ঞা মাত্র. প্রকৃত পক্ষে আমি স্বতন্ত্র কিছুই নহি। এই জ্ঞান অতীব দুর্লভ;—এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সমপ্রাণতা উপস্থিত হয়, প্রাণী মাত্রের বেদনা এবং আনন্দ অনুভূত হয়, কোনো প্রাণী হইতে বাধা পাই না, আমার হইতেও কেহ বাধা প্রাপ্ত হয় না। নর-সেবার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-ভাব-শূন্য হইয়া কিছুতেই আনন্দের অভাব হয় না; কোনো দিন জ্ঞানে অবসাদ—প্রেমেও শুষ্কতা আসে না; সে অকথিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা কে করিতে পারে?

ঘোর অজ্ঞান কে? যে বিশ্বপ্রাণ হইতে আপনাকে পৃথক মনে করে। জ্ঞানী বিশ্বপ্রাণেই প্রাণীরূপে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন দর্শন করেন। কবে সে দৃষ্টি লাভ হইবে?

বুন্দেলখণ্ড-কেশরী

মহারাজ ছত্রসাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চম্পৎ রায় যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার পুত্র ছত্রসালের বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর ছিল। ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া সোমবারে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোনও বন প্রদেশে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম কালে মোগলদিগের সহিত তাঁহার পিতা চম্পৎ রায়ের ঘোর বিগ্রহ চলিতেছিল। কথিত আছে যে, সপ্তম মাস বয়ক্রম কালে একদা তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইতে হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া ছিলেন। তাঁহার বাল্য জীবনের প্রথম চারি বৎসর মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। সপ্তম বর্ষ বয়ক্রম কালে ছত্রসাল বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য সে কালের রীতিক্রমে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই দেশীয় কাব্য, সাহিত্য, গণিত ও নীতি-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভের সহিত যুদ্ধ-বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া

উঠেন। ছত্রসালের জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-বিদ্যায় অতিবাহিত হইলেও তিনি বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে 'কবি-বৎসল' অর্থাৎ পণ্ডিত ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বলিয়াছি;—ছত্রসাল ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা চম্পৎ রায়ের মৃত্যু হয়। সেই সুযোগে কতিপয় দেশদ্রোহী বুন্দেলা-সর্দ্দার মোগলদিগের সাহায্যে চম্পৎ রায়ের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সম্রাটের প্রীতি-ভাজন হইলেন। কিন্তু যুবক ছত্রসাল ইহাতে হতাশ না হইয়া তাঁহার জননীর অলঙ্কারাদি বিক্রয়-পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ ও সেই অর্থের বলে একটি ক্ষুদ্র সেনা-দল সংগঠন করিলেন। সেই সেনা-দলের সাহায্যে দিল্লীশ্বরের প্রতিকূলতা করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া, তিনি প্রথমে শক্তি-সঞ্চয়ের আশায় দিল্লীশ্বরের রাজপুত সেনাপতি মহারাজ জয়সিংহের অনুরোধে, বাহাদুর খান নামক জনৈক মোগল সেনাপতির অধীনতায় স্বীয় সৈন্যদল লইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। কিন্তু প্রথম অভিযানের পরেই তিনি সম্রাটের ব্যবহারে অতীব বিরক্তি অনুভব করায়, জীবনে আর কখনও কোনও প্রকারে মুসলমানের অধীনতা-স্বীকার করিবেন না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সময়ে মহাত্মা শিবাজী দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোগলদিগের সহিত সংগ্রামে যশস্বী হইতেছিলেন। তরুণ ছত্রসাল তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। মহারাজ শিবাজীর অধীনতায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ-পূর্ব্বক তিনি চিরপ্রদীপ্ত শত্রুতানল শান্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভীমা নদীর তীরে নবীন মহারাষ্ট্র-পতির সহিত সেই তরুণ ক্ষত্রিয়-কুমারের সাক্ষাৎকার ঘটে। মহারাজ শিবাজী তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে বিমুখ হন নাই। শিবাজীর সেনানীদিগের সাহচর্য্যে অব্যবস্থিত যুদ্ধ-কৌশলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ও রণক্ষেত্রে কয়েক বার স্বীয় স্বাভাবিক শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া ছত্রসাল অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখন মহাত্মা শিবাজী, তাঁহাকে আর দক্ষিণাপথে শক্তিক্ষয় না করিয়া স্বদেশে গমন পূর্ব্বক মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদ-সহকারে বুন্দেলখণ্ডে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে উপদেশ দান করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় ইষ্ট দেবতা ভবানীর প্রসাদ-চিহ্ন-স্বরূপ একটি তরবারি

দান করিয়া ও প্রয়োজনমত তাঁহাকে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় করেন। এই সময়ে মহাত্মা শিবাজী ছত্রসালকে যে বীরত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,মৎ প্রণীত "ঝাঁসীর রাজকুমার"-নামক পুস্তকে তাহা বিস্তারিত-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর উপদেশামৃত পানে ও প্রয়োজনমত তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় উৎসাহিত হইয়া ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময়ে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ডের দেবমন্দির সমূহ ভগ্ন করিয়া তত্তৎস্থানে মস্জিদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুবেদার ফিদাই খানের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাপি বুন্দেলা সর্দ্দারগণ ও তাঁহাদের অধিপতি ওরছার রাজা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চ-বাচ্য করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, মোগলদিগের সাম্রাজ্য-বৈভব-দর্শনে তাঁহাদিগের চিত্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। দেশের পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কোনও প্রকার সহায়তা-প্রাপ্তির সবিশেষ আশা নাই দেখিয়া, ছত্রসাল সাধারণ বুন্দেলা প্রজার হৃদয়ে স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রাণনাথ প্রভু নামক জনৈক সন্ন্যাসী দেশবাসীগণকে স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে 'সমর্থ' রামদাস স্বামী ও শিবাজীর সম্মিলনে যেরূপ শুভ ফলের উদ্ভব হইয়াছিল, বুন্দেলখণ্ডে প্রাণনাথ প্রভুর সহিত ছত্রসালের সম্মিলন বহু পরিমাণে সেইরূপ শুভকর হইয়াছিল। ইঁহাদিগের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই তেজস্বী বুন্দেলা জাতি স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া ছত্রসালের নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মভাব-প্রমত্ত জনসাধারণকে মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘোরতর উত্তেজিত দেখিয়া ওরছার রাজা সম্রাটের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জনসাধারণের সহিত মিলিত হইবামাত্র হিন্দু মুসলমানে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল।

ছত্রসালের সৌভাগ্যক্রমে প্রথম যুদ্ধেই জাতীয় দলের বিজয়-লাভ ঘটিল। সুবেদার ফিদাই খান সসৈন্যে পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বহুসংখ্যক বুন্দেলা সর্দ্দার ঔদাসীন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ছত্রসালের দলে আসিয়া মিলিত হইলেন। যে সকল সর্দ্দার মোগল সম্রাটের

মঙ্গলকামী হইয়া চম্পৎ রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও জাতীয় দলের প্রাবল্য অনুভব করিয়া ছত্রসালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন ছত্রপতি শিবাজীর অনুকরণে ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডের গিরিদুর্গগুলি ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন-প্রধান অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতি-ক্রমে মুসলমান রাজশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোগল শাসন বিলুপ্ত হইল। বহু মোগল সর্দ্দার ছত্রসালের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বুন্দেলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহার দমনের জন্য ত্রিংশৎ সহস্র অশ্ব-সাদী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ কয়েক জন বড় বড় সেনাপতিকে বুন্দেলখণ্ডে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ছত্রসালের নেতৃত্বে পরিচালিত বুন্দেলাগণের বিক্রমে সম্মুখ সমরে সেই বিশাল মোগল বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। ইহার পরেও আওরঙ্গজেব বহুবার বুন্দেলখণ্ডে মোগলসৈন্য প্রেরণ করিয়া ছত্রসালের দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ছত্রসাল রাজা উপাধি ধারণ-পূর্ব্বক বুন্দেলা বীরগণের সাহায্যে ক্রমশঃ মোগল-শাসিত দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ আক্রমণ করিয়া বাহু-বলে "চৌথ" আদায় করিতে লাগিলেন। বুন্দেলা জাতির এই স্বাধীনতা-লাভার্থ সমর-কালে প্রাণনাথ প্রভু বহুবার তাঁহাদিগকে আশ্বাস ও উপদেশ দান করিয়া কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু-কালে রাজা ছত্রসালের রাজ্যের আয় কিঞ্চিদধিক এক কোটি টাকা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সম্রাট্ বাহাদুর সাহ বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন রাজ্য ও রাজা ছত্রসালকে বুন্দেলাদিগের প্রকৃত নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তরে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে চাম্বেল নদী হইতে পূর্ব্বদিকে রেওয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

মহাত্মা শিবাজীর উপদেশ-ক্রমে পরিচালিত হইয়া রাজা ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানগণ সহজে বুন্দেলখণ্ডের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। অবসর পাইলেই তাঁহারা ঐ প্রদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭২৮।২৯ খ্রীঃ মহম্মদ খান বঙ্গষ-নামক জনৈক রোহিলা সর্দ্দার দিল্লী দরবারের আদেশে এই হিন্দু-রাজ্য নষ্ট করিবার জন্য যত্নশীল হন। ফরুখসায়রের রাজত্ব কালে তিনি সৈয়দ

ভ্রাতৃ-যুগলের প্রিয় ভাজন হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে নবাব উপাধি সহ চারি সহস্র তুরঙ্গ সৈন্যের মনসবদার-পদে নিয়োজিত করিয়া বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কুঞ্চ, কাল্পী, জালবন সিপ্রি প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। ঐ পরগণাগুলি রাজা ছত্রসালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে মহম্মদ খানের পক্ষ হইতে যখন উক্ত প্রদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করা হয় তখন রাজা ছত্রসাল তাহাতে বাধা প্রদান করেন। ১৭১৯।২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উক্ত পরগণাগুলির জন্য রাজা ছত্রসালের সহিত মহম্মদ খানের প্রতিনিধিগণের বিগ্রহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সংঘর্ষে বুন্দেলাগণ জয়লাভ করিয়া মুসলমানদিগের অনেকের প্রাণ-নাশ ও তাহাদের মসজিদ ও গৃহাদি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। এই ঘটনায় দিল্লীর দরবার অতিমাত্র বিচলিত হইয়া ছত্রসালের দমন করিবার জন্য যত্ন প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু নানা কারণে সে কার্য্যে সে সময়ে বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

ইহার পর ১৭২৮ সালে দিল্লীর দরবার হইতে বুন্দেলখণ্ডে অভিযান দেলেল খান নামক সর্দ্দারের প্রতি অর্পিত হয়। বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসাদী সহ দেলেল খাঁনের আক্রমণে বাধা দান করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দুইজন দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আসন্ন-যুদ্ধ-কালে পিতার সহায়তায় বিমুখ হইলেন। তথাপি রাজা ছত্রসাল সমর-ক্ষেত্রে দেলেল খানের বধ-সাধন করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হন। এই পরাভব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বরের আদেশে মহম্মদ খান বিশাল বাদসাহী সৈন্য লইয়া বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। মোগল সেনা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বুন্দেখণ্ডে আপতিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই উহার বহুলাংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল নানা স্থানে মুসলমান সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, কখনও তাহাদিগকে পরাস্ত, কখনও বা স্বয়ং পরাভূত হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে তাঁহার অপর পুত্রগণ এক দল বুন্দেলা সেনা-সহ এলাহাবাদ প্রদেশে গমন করিয়া উক্ত প্রদেশ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক ছারখার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মালব ও গোণ্ডবন প্রদেশের অনেক জমিদার, রাজা ছত্রসালকে সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গষও দিল্লীর সামন্তগণের নিকট হইতে নূতন সেনা-সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল এইরূপ সমরের পর একটি যুদ্ধে বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল মহম্মদ খানের বল্লমের আঘাতে গুরুতররূপে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ক্রম-কালে যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণরূপে আহত হইয়াও রাজা ছত্রসাল জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি রাজ্য-রক্ষার জন্য আবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনায় মোগল সেনার দ্বারা তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ রাজধানী জেতপুরের নিকটে অবরুদ্ধ হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী হিন্দু রাজন্যবর্গ এ সময়ে বঙ্গষেরই সহায়তা করিতেছিলেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন নিরুপায় ছত্রসাল মহারাষ্ট্র-চূড়ামণি পেশওয়ে বাজীরাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া, তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনাপূর্ব্বক এক পত্র লিখেন। উক্ত পত্রের শেষে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বকালে নক্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে, হে বাজীরাও, তুমি তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ কর।" এই কাতরোক্তি-পূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় মুসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজ শাহুর নিকট হইতে পত্র-যোগে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কয়েক জন সর্দ্দার ও বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১৭২৯ সালের ১২ই মার্চ্চ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মোগল সৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এক মাস কাল যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র সৈন্য মহম্মদ খান বঙ্গষকে সসৈন্যে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। রসদের অভাবে মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা অশ্ব, উষ্ট্র ও গো-গর্দ্দভাদি নিহত করিয়া উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। শত মুদ্রার বিনিময়েও এক সের গোধূম দুষ্প্রাপ্য হইল! শত্রু পক্ষীয় অনেকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া বাজীরাও ঘোষণা করিলেন, "যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইবে।" তখন দলে দলে মুসলমান আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। বাজীরাও সদ্ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। তখন মহম্মদ খান উপায়ান্তরের অভাবে নারীবেশে অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে অতি কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন।

এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম-বলে মহম্মদ খান বঙ্গষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া হিন্দুরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। অতঃপর বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর ছত্রসালের পুত্রগণের সহিত বাজীরাওয়ের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে মহারাষ্ট্রীয় ও বুন্দেলাদিগের মধ্যে সখ্য-বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে। ইহার কয়েক বৎসর পরে মুসলমানেরা আর এক বার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। কিন্তু সেবারেও মারাঠা ও বুন্দেলাগণের সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদিগের পরাভব ঘটে।

এইরূপে বুন্দেলা জাতিকে স্বাধীনতা-রত্নে ভূষিত করিয়া মহাত্মা ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এখনও তাঁহার স্বদেশবাসী প্রত্যহ প্রাতঃকালে—

"ছত্রসাল মহাবলী, রহে সদা ভলী ভলী।"
ও—"কৃষ্ণ মহম্মদ দেবচন্দ্র প্রাণনাথ ছত্রসাল।
ইন্ পঞ্চন্‌কো জো ভজে দুঃখ হরে তৎকাল॥"

প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া থাকেন। বুন্দেলখণ্ড এখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, কিন্তু সেখানকার প্রত্যেক রাজ্যেই রাজা ছত্রসালের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র সিংহাসন, ও তদুপরি একটি করিয়া ছত্রসালের চিত্র স্থাপিত আছে। প্রত্যহ সেই সকল চিত্রের ও সিংহাসনের পূজা করিয়া বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত নরপতিগণ বুন্দেলখণ্ড-কেশরী মহারাজ ছত্রসালের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মুসলমান শাসন-কালে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ছত্রসালের ন্যায় মহাপ্রাণ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতিকে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই মহীয়সী বাণী শ্রবণ করাইয়া জাতীয় জীবন-সংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, "উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি"—এই শ্রুতি বাক্যে বর্ণিত লক্ষণ মুসলমান আমলেও এদেশে বিদ্যমান ছিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

দান

৪

মিস্ গ্রেস্ অনেকক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সেবারে ইস্কুলে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিনের মধ্যে একজন নূতন সঙ্গিনী পাইলাম, সে একটি অনাথা বালিকা তার নাম 'মিস্ গর্ডন', মিস্ গর্ডনের খৃষ্টান নাম ছিল 'মার্লট' কিন্তু আমরা তাহাকে লোটি বলিয়া ডাকিতাম।

লোটি আমাদের কাছে অপরিচিতা নয়, অনেক দিন পূর্ব্বে আমরা যখন অত্যন্ত ছোটো ছিলাম, সেই সময় সে আমার সঙ্গে একত্রে পড়িত ; তখন আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল,তারপর আমার বয়স যখন বারো বৎসর এবং লোটির চৌদ্দ তখন সে এখান হইতে চলিয়া যায়। শুনিলাম, তাহার মা মারা গিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতার সেবা এবং শিশু ভাই বোন গুলির পালনের জন্য দরিদ্র পাদরি কন্যাকে নিকটেই রাখিবেন। লোটি চলিয়া গেলে কিছুদিন পর্য্যন্ত আমার সব শূন্য হইয়া গিয়াছিল, কিছুই ভালো লাগিত না; তারপর আবার বিরহ-ব্যথা অভ্যস্ত হইয়া গেল।

এবারে গভীর বিশ্বাসের উপর যেন একটা আকস্মিক নিদারুণ আঘাত পাইয়া সুপ্রচুর গর্ব্ব ও রমণীর স্বভাবজ লজ্জাভিমান নিরাশ হৃদয়কে যখন নীরবে পীড়ন করিতেছিল, অথচ একথা লইয়া জগতে একটি প্রাণীরও নিকটে আলোচনা করিবার উপায় ছিলনা. এমন কি মাসীমা শুদ্ধ যখন এ বিষয়ে আমায় একটি মাত্র সান্ত্বনার কথা না বলিয়া বরং উল্টিয়া পাল্টিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ সুঠাম দেহের,—তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল নেত্রের এবং বিনীত ব্যবহারেরই উল্লেখ করিতে লাগিলেন; সেই সময় পূর্ব্ব-স্নেহের সঙ্গিনীকে পাইয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা আর হইবার নয়। লোটি আর সে লোটি নাই। আমি আমার বেদনা দু' দিনেই ভুলিয়া আসিলাম কিন্তু তাহার সুগভীর আঘাত-ক্ষত শুকাইল না। মাতৃ-হীনা লোটি সম্প্রতি সংসারের একমাত্র ভরসা পিতাকে হারাইয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধ পাদরী রোগ-শয্যায় অনেক দিনই পড়িয়াছিলেন, সম্প্রতি 'হার্ট ফেল' করিয়া অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন। অনাথা লোটি 'মাদার আগষ্টাইন'কে পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহাদের তিনটি ভাই বোনকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই যে

লোটির শুভ্র ললাটে বিষাদের কালিমা ঘনীভূত হইয়াছিল, আমাদের শত চেষ্টাতেও তাহা আর মুছা গেলনা। সে স্বভাবতই খুব ধীর ও সহিষ্ণু ছিল; আজ কাল আর যেন তাহার ছায়ার মতন ক্ষীণ, মার্ব্বেলের মতন শুভ্র, দলিত পুষ্পের মতো পরিম্লান অঙ্গে জীবনী শক্তির সঞ্চার আছে কি না তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হইত। আমার চোখ ফাটিয়া কেবলি জল আসিত! কী লোটি—কী হইল! প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা দিতাম। পড়া ভুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম! মধ্যে মধ্যে তাহার গলা ধরিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতাম "লোটি, কি করলে তুই সুখী হোস্, ভাই বলনা, আমি প্রাণ দিয়েও তা কোরবো।"

লোটি স্নেহের হাসি হাসিয়া আমার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিত,—গভীর নিরাশার হাসি হাসিয়া বলিত—"অসম্ভব—সে অসম্ভব!"

তারপর অনেকদিন পরে—প্রায় বৎসরাধিক পরে একদিন সে আমায় তাহার নিরাশার কারণ জানাইল। শুনিলাম সে একজনকে ভালোবাসিয়াছিল এবং প্রতিদানও পাইয়াছিল! শুনিয়া আমার হৃদয়ের তুফান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তবে আবার তাহার দুঃখ কি? ভালোবাসিয়া যদি প্রতিদান পাওয়া গেল, তাহার পর আর কী চাই? কিন্তু লোটি এতটা স্বার্থহীনা হইতে ইচ্ছুক ছিল না! সে ভালোবাসার প্রতিদান পাইয়াই লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল কিম্বা মানব-ধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া জানিনা, কেন অশরীরী এবং শরীরী দুইটি পদার্থের উপরই আশা করিয়া বসিয়াছিল। অবশ্য এ আশার মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহার প্রণয়ী। লোটির মুখে শুনিলাম তাহার প্রণয়ী তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিতেন—বাসিতেন কেন এখনো তিনি তাহাকে তেমনি ভালোবাসেন এবং প্রতিজ্ঞা আছে চিরদিনই তেমনি বাসিবেন! কিন্তু এ জন্মে আর একটি বারও তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই! 'কেন?' তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাই নাই, একটা মর্ম্মভেদী রোদনোচ্ছ্বাসে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আহা বেচারা লোটি! নিশ্চয়ই হৃদয়হীন কালের কঠোর হস্ত তাহার সুকোমল হৃদয় খানিকে দলিত করিয়া ফেলিয়াছে! বেদনায় আমার মুখে সান্ত্বনা বাক্য মিলাইয়া গেল!

তারপর আরো দুইটি সুদীর্ঘ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল। এখন আর আমি 'কন্‌ভেণ্টে'র ছাত্রী নই। প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল আমি বাড়ি আসিয়াছি।

মাসীমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আফ্রিকার যে যুদ্ধে মিঃ ব্রাউন দুই বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরি জয় হইয়াছিল ও লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রাউন সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। এবার আফ্রিকার ফেরত তিনি আমাদের বাড়িতে আপনিই আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও ভৎর্সনায়ও আমি বেশভূষার প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ললাট ও কপোল যে অস্বাভাবিক রক্তিমার দ্বারা আনন্দ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহাকে কেমন করিয়া বাধা দিব?

আমাদের দ্বিতীয় মিলন প্রথম পরিচয়ের অপরিসীম লজ্জার স্মৃতিতে আমার কাছে যতখানি নিরানন্দকর হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য ক্ষণের কথাবার্ত্তায় সেটুকু মুছিয়া গিয়া যে আনন্দ, যে আশা বুকে বহিয়া ঘরে ফিরিলাম, তাহার একটুখানি কণা মাত্র আমার আনন্দহীনা সঙ্গিনী লোটির নিরানন্দ মুখকেও আলোকিত করিয়াছিল। সূর্য্যের আলো মেঘের ও রাত্রের সমুদয় অন্ধকার মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দেয়। লোটিকে চুম্বন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিলাম—"কী ভুল বুঝেছিলুম লোটি, তিনি এত স্নেহময়! তাঁকে কত নিষ্ঠুর ভেবেছি!" লোটি ম্লান মুখে হাসিয়া কহিল,—"স্নেহ, প্রেম যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ভ্যালী, তোমার প্রেমাস্পদ এবার তবে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন?" প্রকৃতিস্থ? হাঁ তিনি তখন তবে বাস্তবিকই অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর স্বার্থপরায়ণা অভিমানে জ্ঞানহীনা আমি তাঁহার এই নির্ম্মল চরিত্র কী মসীবর্ণেই রঞ্জিত করিতেছিলাম! না বুঝিয়া না জানিয়া অনর্থক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলাম, 'হায় দুর্ভাগিনী, লোটি প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে জানে; তাই সে তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিল। ছি ছি এমন হৃদয়হীনা আমি—আমি তাঁহাকে চিনিলাম না!' লজ্জায় লোটির বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলিলাম,—"ঠিক কথা লোটি, ঠিক তুমি বলেছ। সেই সময় তাঁর বাপ মারা যান আর তাঁদের বৃহৎ সংসারে তখন দারিদ্র্যের বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর হস্ত পতিত হয়েছিল, আমি তাঁকে চিনিনি লোটি; তাঁর সেই গভীর বেদনাভরা দৃষ্টিতেও আমার অভিমান চূর্ণ হয়নি! আহা গেব্রিয়েল! যে তোমার সুখ দুঃখ বোঝে না এমন

পাষাণীকেও তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী করতে হবে।

লোটি চমকিয়া আমায় তাহার বাহু-বেষ্টন হইতে ছাড়িয়া দিল। আমার কপালের উপর খুব বড় বড় নিশ্বাসের বাতাস মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া আমি বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলাম;—একি! মৃগী রোগীর মতন তাহার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু কি? লোটির শুভ্র কপোলের সমুদয় রক্তাভা নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল! রক্তহীন অধর কাঁপিতে-ছিল, সভয়ে উঠিয়া বসিয়া তাহার কম্পিত হাত দু' খানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া ভীতকণ্ঠে ডাকিলাম,—"লোটি' কি হ'ল! এ কি হ'ল!" সেই রক্তহীন মুখের বিবর্ণ ওষ্ঠে বিষাদের হাসি কী ভয়ানক বিবর্ণ ও ম্লান দেখাইল। লোটি বলিল,—"কিছু হয়নি ভ্যালী, তোমার প্রেমাস্পদের নাম কি ভ্যালী গ্রেবিয়েল? * * ডেন্‌সলির ডাক্তার ব্রাউনের ছেলে কি তিনি?"

নিশ্চয়ই লোটির হিষ্টিরিয়া আছে 'হার্ট' নিশ্চয়ই খুব দুর্ব্বল, জীবন্ত মানুষের মুখে এ রকম দুর্ব্বল অস্ফুট স্বর আমি আর কখনো ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই! সে তাঁহাকে তবে চেনে! শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল, আজ তবে লোটিকে ছাড়া হইবে না; আমাদের নূতন সুখের সেও কিছু অংশ গ্রহণ করিলে নিজের দুঃখ কতকটা তবু ভুলিতে পারিবে! বলিলাম,—"তবে তো খুব ভালোই হ'ল, আমিও যে ভুলে গেছলুম, তিনি যে তোমার দেশের লোক! আয়না ভাই তোদের আলাপ করিয়ে দি। তবে ভয় হয় লোটি যদি তিনি তোকে দেখে আমায় আর না চেয়ে দেখেন। যদি............"

আমার চপলতার এমন ফল হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোটি তড়িতাহতের মতো এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া পর মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মতন উঠিয়া চলিয়া গেল, লজ্জায় অনুশোচনায় আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

কর্ণেল ব্রাউন এবার সর্ব্বদাই মাসীমার কাছে কাছে থাকেন, আমাকেও দিনের অধিকাংশ সময় তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বেই কাটাইতে হয়; মাসীমা তাঁহার স্নেহ-ব্যাকুল দুই স্তিমিত নেত্রে যখন আমাদের পানে চাহিয়া থাকেন, তখন তাহার মধ্য হইতে এমন দুইটি নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদের ধারা নীরব-আনন্দে আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতে থাকে তাহাতে মনে হইত যে, আমার ভবিষ্যতের দিকটা আমার কাছে যেন সমধিক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইয়া

উঠিতে লাগিল। মাসীমাকেও এবার আমার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত দেখিলাম। আমরা অধীর,—একটু খানি বিলম্বও আমাদের সহেনা। তাই আমরা এত দুঃখ পাই, লোটির শরীর ভারী অসুস্থ কিন্তু বেশ বুঝিলাম শরীরের অপেক্ষা তার মনে অশান্তি শতগুণ বেশি। কি আশ্চর্য্য! আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম সর্ব্ব নিয়ন্তার নিয়মে সে আজ এ অবস্থায় পতিত! তাহা নয়, মানুষের স্বার্থপর হস্ত তাহাদের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আজ তাহার এ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়াছে। তাহার প্রাণাধার, পিতার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যে কোনো কারণেই হোক তাহাকে তিনি পত্নী-পদ দান করিবেন না। পিতৃভক্তির পদে হৃদয়কে বলিদান করিয়া তাই তিনি সুদীর্ঘ কালের জন্য দেশত্যাগী; এ জগতে আর তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। লোটি তাই উৎসুক-চিত্তে পরলোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! কী নিষ্ঠুরতা! কী কঠোর পিতৃ-আজ্ঞা! আহা অভাগিনী! মৃত্যুর অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই! এ যে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত নির্ম্মমতা!

অনেক অনুরোধেও লোটি তাহার প্রেমাস্পদের নাম বলিল না। চোখের জল মুছিয়া কেবল মাত্র বলিল,—"ও কথা ছেড়ে দাও ভ্যালী।"

ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু কি একটা অস্ফুট সন্দেহের ছায়া অন্ধকার ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র আলোকের মতো মনের ভিতর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে চাপিয়া রাখা কঠিন বুঝিলাম। (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

তামাক, গাঁজা, সিদ্ধি, চরশ, অহিফেন, সুরা প্রভৃতি মাদক শ্রেণীভুক্ত। চিকিৎসকগণ এই সকল দ্রব্য ঔষধ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেকানেক কষ্টসাধ্য পীড়ার শান্তি করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ উহাদের অপব্যবহার প্রযুক্ত কিরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ও আত্ম-সম্ভ্রমহীন হইয়া সমাজে বসতি করেন তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল, সেই সকল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাহাতে অস্মদেশীয় যুবকগণ মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কুফল জানিয়া সতর্ক হইতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

তামাক। সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়ানা ট্যাবেকম্ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র। ইহা আমেরিকার জন্মে। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে রোপিত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন বহু প্রাচীন কালে তামাক ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং মুসলমান রাজত্বকালেই উহা এখানে আনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমাদের দেশে হুঁকায় সেবন, চুরুট্ টানা, নস্য গ্রহণ এবং গুঁড়া করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তামাক সেবনের প্রচলন আছে। তামাকে নাইকোটিন (Nicotine) নামক এক প্রকার ভয়ানক বিষ আছে। বিষ মাত্রায় এই নাইকোটিন্ উদরস্থ হইলে তিন মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। একদা একটি ৮ বৎসর বয়স্ক বালকের মস্তকের ক্ষতে তামাকের রস প্রয়োগ করায় ৩ঘণ্টার মধ্যে উহার মৃত্যু হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে, ফুটন্ত জলে তামাকের পাতা অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া মলদ্বারে উক্ত জলের পিচ্‌কারী দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্যার্ আষ্ট্লি কুপার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হইতে দেখায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় এই প্রয়োগ-প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব দেখুন তামাকের পাতা গুঁড়া করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করা কতদূর বিপজ্জনক। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে তাম্বুলের সহিত দোক্তা খাইয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। তামাকের নস্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে ঘ্রাণশক্তির হানি হয়, স্বরভঙ্গ হয় এবং আনু-নাসিক বর্ণ উচ্চারণের শক্তি থাকে না। তামাকের ধূম পান করিলেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথম ধূমপান আরম্ভ কালে বমন, শারীরিক অবসাদ এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। অধিক পরিমাণে তামাক সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, স্মরণ শক্তির হানি, পরিশ্রমে অনিচ্ছা, শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়।

যাহা দ্বারা এতদূর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কি তাহার দাসত্ব স্বীকার করা সমীচীন? স্কুলের বালকগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদা সিগারেট্ ও বিড়ি টানিয়া থাকেন। ইহাতে তামাক সেবনের অপকারিতা তো আছেই অধিকন্তু কাগজ ও নানাবিধ শুষ্ক পত্রের ধূম গ্রহণে বায়ুনলী ও

ফুসফুসের পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হাঙ্গেরী রাজ্যে কোনো লোক প্রত্যহ অন্যূন ৫৬টি সিগারেটের ধূম পান করিতেন। এক দিন তাঁহার হটাৎ মৃত্যু হওয়ায় ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ হইল যে, নাইকোটিন্ বিষই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। আশা করি ধূমপানরত যুবকগণের ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবে।

গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশ। ক্যানেবিনেসী জাতীয় ক্যানেবিস সেটাইভা নামক বৃক্ষের শুষ্ক মুঞ্জরিত ও ফলিত শাখাগ্রের নাম গাঁজা। এই বৃক্ষের পত্রকে সিদ্ধি এবং ইহার পত্র ও শাখা প্রভৃতি হইতে যে ধূনাবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাকে চরশ কহে। চরশই গাঁজার বীর্য্য। ডাক্তারী শাস্ত্রে চরশকে ক্যানেবিন বলে। গাঁজার মাদকতা শক্তি এই ক্যানেবিনের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধির মাদকতা শক্তি অপেক্ষা গাঁজা ও চরশের মাদকতা শক্তি অনেকগুণে অধিক। গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশ ইহারা সকলেই মস্তিষ্কের উত্তেজক; অধিক মাত্রায় সিদ্ধি খাইলে জিহ্বা শুষ্ক হয় এবং মত্ততা উপস্থিত হয়।

মত্ত ব্যক্তি কখনো হাস্য করে, কখনো গান করে এবং কখনো বা নানারূপ প্রলাপ বকিতে থাকে। গাঁজা-খোরের দুর্দ্দশা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। গাঁজা ও চরশের ধূম পানে ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। গাঁজা খাইলে দেহ কঙ্কালসার হইয়া থাকে। গাঁজা-খোরের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয়, আত্মসম্ভ্রম বোধ থাকে না এবং সচরাচর শতকরা প্রায় ৫০ জনের পরিণামে উন্মাদ রোগ হইতে দেখা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার উন্মাদাগারে ২৯৬ জন উন্মাদ রোগী ছিল। ডাক্তার সিম্পসন্ সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ উহাদের মধ্যে ১৪৩ জন অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া উক্ত রোগগ্রস্ত হয়।

যে দ্রব্যের অপব্যবহারে সম্মানী ব্যক্তিও সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকেন, যে দ্রব্যের অপব্যবহারে মানুষ সমস্ত সদ্গুণ হারাইয়া নিরন্তর কুকার্য্যেই রত থাকে, যে দ্রব্যের অপব্যবহারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিও উন্মাদ হয়, সে বিষাক্ত দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

অহিফেণ ও সুরার কথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সম্বল

প্রতি প্রভাতেই, বাজিলে ললিত
আমি আসি এই পথে,
এই তরু তলে, স্নিগ্ধ ছায়ায়
এই নদীটির তটে !
কত লোক যায়, কত ফিরে আসে
সফল-গরবে, মলিন হতাশে
আপনার মনে চেয়ে চেয়ে হাসি,
বসে থাকি গ্রাম-পথে !
কেহ বেণু-বীণা বাজাইয়া চলে
কেহ বসে গায় গান ;
কারো আঁখি-কোণে ম্লান চেয়ে থাকে
রিক্ত, ব্যাকুল প্রাণ !
তাদের মিলন-বিরহ-নেশায়
পলে-পলে-বাঁধা, দিন চলে যায়,
বেলা পড়ে আসে, নদীতেও পড়ে
ভাঁটার অলস টান !
তীরে এসে লাগে ভোরে-খুলে-যাওয়া,
প্রবাসী আঁধার-তরী
ভেঙে আসে মেলা দিবস-গাঁয়ের
জয়-পরাজয়-ভরি !
পাখী আসে ফিরে আশ্রয়-নীড়ে
শান্তি শিশুটি ঘুমে নদী-তীরে,
চোখের পাতায় ফুটে উঠে মোর
ছোট এক ফোঁটা জল !
জীবনে আমার হাসি ও অশ্রু
করেছি সম্বল !

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন (২)

গতবারে যে বলিয়াছি, ৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রেই লাহোর যাত্রা করিলাম, তাহা ভুল বলা হইয়াছে। রাত্রে বংশীধর, মুরলীধরের নিকট বিদায় লইয়া ছত্রেই ছিলাম। ৯ই প্রাতে লাহোর যাত্রা করি। লাহোরের ঠিকানা এবার আগে হইতে ঠিক ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন দেরাদুন হইতে লাহোর যাত্রা করেন, তখন আমাকে তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিয়া Address দিয়া যান। লাহোর ষ্টেসন হইতে সহরে পৌঁছিতে বেলা ৯ টার অধিক হইল। বাবু হরলালের বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম। লাহোর সামান্য সহর নহে। সহজে রাস্তা ঠিক করা কঠিন।

বাবু হরলাল বলিলেন, "বাবু সাহেব (সারদা বাবু) অন্য বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছেন; আপনি সে ঠিকানা খুঁজিয়া পাইবেন না, এখন এখানে বিশ্রামাদি করুন, তারপর আমি লোক সঙ্গে দিয়া আপনাকে তথায় পৌঁছিয়া দিব।" অবশ্য তিনি সকল কথাই হিন্দি ভাষায় বলিয়াছিলেন। বাবু হরলাল তদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার অমায়িক ভাবে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যে এমনই বাধ্য হইতে হইল যে, আমি তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না, অধিকন্তু ভগবানের এ কি করুণা দেখিয়া সেই সঙ্গীতের অংশ আমার মনে আসিল,—"একি করুণা তোমার ওহে করুণা নিধান! অধম পতিত জনে এত তোমার করুণা কেন!"

তারপর বাবু হরলালের গৃহে স্নান আহার কালীন গৃহ-পদ্ধতি সকল দেখিয়া বুঝিলাম ইহা নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিকের গৃহ। ইতিমধ্যে পার্শ্বস্থ আর একটি ছোট বাড়ির দ্বিতল ঘরে আমার জন্য কখন শয্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে জানি না। আহারান্তে বাবু হরলাল বলিলেন "আপনি ঐ ঘরে গিয়া বিশ্রাম করুন, এবং বাবু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া এখানেই থাকিবেন। এখানে থাকিলে আপনি আরামে থাকিবেন, এবং আমার গৃহে রুটী প্রস্তুত থাকিবে, যখন ইচ্ছা আপনি আহার করিলেও অভাব হইবে না, না করিলেও ক্ষতি হইবে না।" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় একব্যক্তি আসিয়া আমাকে সারদা বাবুর বাসা দেখাইয়া দিবার জন্য ডাকিলেন; আমি তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেলাম।

শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু পুনরায় আমাকে এখানে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আমার নামে যে সকল পত্র আসিয়াছিল. তাহা ও লিখিবার উপাদান এবং কয়েকখানা টিকিট দিয়া, আমাকে অগ্রে পত্রোত্তর সকল লিখিবার জন্য ঈঙ্গিত করিলেন এবং তখন আর কোনো কথা না বলিয়া নিজেও যে সকল পত্রাদি লিখিতেছিলেন তাহা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি পত্রগুলি পাঠ করিয়া আবশ্যক মত ৪ খানার উত্তর লিখিলাম।

সে দিবস অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ধর্ম্মানুরাগী সাধক-প্রবর বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি গেলাম। অবিনাশ বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ছিল না বটে,কিন্তু অল্পক্ষণেই বেশ আলাপ হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সে দিন রবিবার, মন্দিরে উপাসনায় যাইবার সময় হইল ; একত্রে মন্দিরে গেলাম। বেদীর কার্য্য অবিনাশ বাবুই করিলেন। লাহোর ব্রহ্ম-মন্দিরটি মধ্যমাকারের—সুদৃশ্য সুরুচি সম্পন্ন। সেদিন ১৫।২০ জন উপাসক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রচারক প্রকাশদেবজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। এখানে আরো যে সকল ব্রাহ্ম আছেন, সকলের সহিত সাক্ষাত করিতে সময় পাইলাম না।

আমি এখানে কবে আসিয়াছি. কোথায় আছি, একথা অবিনাশ বাবু আমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; আমার থাকার কোনো কষ্ট নাই বরং স্বচ্ছন্দেই আছি শুনিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আমার কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হইবে আপনি তাহাতে যোগ দিবেন এবং রাত্রে আমার বাড়ি আপনার আহারের নিমন্ত্রণ।"

আজ ১০ই সোমবার সারদা বাবুর বাড়ি মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ ছিল। তারপর তাঁহার "আশ্রিত-কন্যা" আমার পারিবারিক সাহায্যার্থে খুলনায় পাঠাইবার জন্য আমাকে ৪৲ টাকা প্রদান করেন।

১১ই মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় প্রবীন ব্রাহ্ম বন্ধু লালা কাশীরামের বাড়ি গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলাম, তিনি তাঁহার কুমারী কন্যাকে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে বলিলেন, বালিকাটি হারমোনিয়াম যোগে একটি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইয়া শুনাইলেন। আমিও একটি গান গাহিলাম,—সে গানটি তখন অল্পদিন মাত্র রচিত হইয়াছিল, সে গানটি এই;—

ভৈরবী—একতালা।

"আমি বাছিয়া লব না তোমার দান, তুমি যাহা দাও তাই ভালো।
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ আঁধারের পাশে আলো।
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল, যদি তাহে কণ্টক রহে?
নিভাতে হবে কি পুণ্য হোমের অনল, যদি তাহে অম্বর দহে?
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা, তোমার কৃপা-পবনে,
আমি, কেমনে রোধিয়া লইব শরণ নীরব শূন্য মরণে।
এই শান্ত বিমল জীবন আকাশ, ঘেরে যদি মেঘ-জাল,
তব মন্দির-পথে ফেলে কি পালাব তোমার পূজার থাল?
যদি কামনায় সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পুরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত ক্ষুব্ধ-হতাশ সুরে?
আমি হেরিব সকলে চির মঙ্গল অক্ষয় চির সুখ,
আমার সব ব্যর্থতা-দুঃখের মাঝে, জাগে ঐ প্রেম মুখ;
তোমার মহা পূর্ণতা-মাঝে ক্ষুদ্র বাসনা মোর,
চির তরে নাথ যাউক ডুবিয়া ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর।"

লালা কাশীরাম ধর্ম্মানুরাগী নিষ্ঠাবান সাধক এবং ভক্ত ব্যক্তি। তিনি শিমলা পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট আপিসে কর্ম্ম করেন, এবং শিমলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তিনি আমাকে কিছু পান-ভোজন করাইবার জন্য যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনিয়া তাহা পান করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর অনেক বেলায় আমি বাবু হরলালের বাড়ি আসিলাম।

বাবু হরলাল একজন বিষয়ী, সাংসারিক লোক; অধিকন্তু তিনি পৌত্তলিক। আমি অন্নের সন্ধানে মাত্র তাঁহার বাড়ি আসিয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে এত যত্ন করিয়া (আমার অন্যত্র স্থান পাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও) গৃহে স্থান দান করিলেন কেন? এ কথা আমার একবার মনে যে না হইয়াছিল এমন নহে। তারপর সাধারণত মনে হয় যে, সাধু-ভক্ত লোক, তাই আমাকে ২।৫ দিনের জন্য রাখিয়াছেন।

মঙ্গলবার রাত্রে আহারাদি অন্তে নির্জ্জনে আমাকে লইয়া বাবু হরলাল ধর্ম্মালাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে শাস্ত্রজ্ঞ

মনে করিয়া তদ্রূপ ভাবে কথা কহিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, আমি সংস্কৃত জানি না এবং প্রকৃত প্রণালীতে শাস্ত্রাধ্যয়নাদিও করি নাই; কেবল সাধু, ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞগণের প্রমুখাৎ শাস্ত্রের ভাব এবং তাৎপর্য্য কিছু কিছু শুনিয়া বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শাস্ত্রার্থ অবগত আছি মাত্র। তার পর সরল ভাবে কিছু কিছু বিশ্বাস-ভক্তির কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ হইল। ফলত তখন বুঝিলাম বাবু হরলাল বাহিরে সংসারীর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আছেন মাত্র, কিন্তু ভিতরে অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী তত্ত্ব-পিপাসু জ্ঞানী ব্যক্তি।

তারপর কথা প্রসঙ্গে আমার স্মরণ হওয়ায় তাঁহাকে বলিলাম, অমৃতসরে এক মহাত্মা 'কুর্ত্তা' প্রস্তুত করিতে ১৲একটাকা দিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া বাবু হরলাল পরদিন আমাকে ঠিকানা লিখিয়া এবং নগদ ২৲ টাকা দিয়া বলিলেন যে, "আমার সময় অল্প আপনি এই দোকানে গিয়া ১টা পট্টি (পট্টুর) কাপড় খরিদ করিয়া আনিয়া আমার বাড়ির সম্মুখে যে ওস্তাগর আছে তাহাকে ১টা কোট প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিবেন।" পরে তিনি দর্জ্জীকে বলিলেন, "এক কোট বানায়কে মহারাজ কোঁ অংমে চড়ায় দেনা, মজুরী হ্যায়সে লেনা।"

আমি পট্টুরওয়ালা মহাজনের বৃহৎ দোকানে গিয়া ৩৲ টাকার মত এক পট্টুর চাহিলাম, কিন্তু ৩৷৹ টাকার কম একটু ভাল রকম পছন্দ হয় না;—৩৶৹ দামের একটা থান (এক পট্টিতে ৪৷৹ গজ কাপড় থাকে, বহর খুব কম কিন্তু তাহাতে প্রমাণ ১টা কোট বেশ হয়) পছন্দ করিয়া কর্ম্মচারীকে বলিলাম আমার নিকট ৩৲ টাকার বেশী নাই। তখন কর্ম্মচারী যেন মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিয়া কাপড়সহ আমাকে স্বয়ং ধনীর সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল "এই মহারাজ ৩৷৶৹ দামের এই থান লইতে ইচ্ছা করেন কিন্তু ইঁহার নিকট ৩৲ টাকার বেশী দাম নাই; ধনী একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "দে দেও।" আমি পট্টুর লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম এ দেশটা—এ লোকগুলা কী রকমের!

পট্টুর আনিয়া ওস্তাগরের দোকানে দিয়া, পরদিন বেলা ১১টার সময় কোট প্রস্তুত পাইলাম। আজ ১৩ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার। এইরূপে কয়েক দিন লাহোরে কাটাইলাম। প্রতিদিন প্রাতে এবং বৈকালে আমার বেড়ানো অভ্যাস। তাহাতে দেখিলাম, লাহোর প্রকাণ্ড সহর। ইহার মধ্যে কতকগুলি গেট আছে, তাহার নাম দরওজা, অর্থাৎ দিল্লী দরওজা কাশপুর

দরওজা ইত্যাদি। এখানে মুসলমানের সংখ্যা যেন অধিক ; বাদসাই ভাবের সঙ্গে শিখদিগের মিশ্রভাব। ইংরাজী ভাব তত যেন এখনো প্রবল হয় নাই। আর্য্যসমাজের উৎসব সে সময় ছিল, কিন্তু আমি তাহাতে তেমন মনোযোগ দিয়া বক্তৃতাদি শুনি নাই এবং কোনো বক্তৃতা আমার হৃদয়-গ্রাহী হয় নাই। যাহা হউক যথাসময়ে সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। খুলনায় ২৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বেলা ১টার সময় পুনরায় অমৃতসর যাত্রা করিলাম। (ক্রমশ)

স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত (গোবরডাঙ্গা) ইছাপুর গ্রামে ইংরাজি ১৯৪৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮১০ অব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে প্রয়াগ-ধামে মানবলীলা সংবরণ করেন। বাল্য-কালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি কঠোর দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হন। স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় গুণে এবং আন্তরিক চেষ্টার ফলে তিনি গোবরডাঙ্গা হাই-স্কুলে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া উক্ত গ্রামস্থ ৺ছকুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৎগুণসম্পন্না সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তদীয় খুল্লশ্বশুর এলাহাবাদের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তত্রত্য ট্রেজারি আপিসের কেরাণী-পদ প্রাপ্ত হন; এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলে ক্রমশ উন্নতিলাভ করিয়া হেডক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হন ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানে কার্য্য করেন। তিনি বহুবার অস্থায়ীভাবে ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অমানুষিক গাম্ভীর্য্য, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্গুণে সকলে মোহিত হইত। তাঁহার পরলোক গমনের ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় একমাত্র কৃতবিদ্য তনয় সত্যচরণ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনায় নবীনচন্দ্রের স্ত্রী এবং পরিজনাদি শোকাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার গম্ভীর হৃদয় এক বিন্দুও কেহ টলিতে দেখে নাই।

তিনি অতি সদাশয় সদ্‌গুণসম্পন্ন ও দয়ালু ছিলেন। কি কর্ম্মস্থলে, কি স্বীয় গৃহে বা সমাজে তিনি তৎসমুদয় গুণের নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। এরূপ সজ্জনের অভাব তাঁহার দেশবাসী প্রত্যেকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় সংবাদ

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের "কুশদহ"র স্থানীয় সংবাদে ইণ্টারমিডিএট পাসে,—ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম অতুলকৃষ্ণের স্থলে ভ্রমক্রমে মুরারীধর লেখা হইয়াছে।

অনিবার্য্য ত্রুটী—কুশদহবাসী যে সমস্ত ছাত্র বিবিধ পরীক্ষায় নানা স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া এবং "কুশদহ"তে প্রকাশ করা অসম্ভব, সুতরাং এ ত্রুটী অনিবার্য্য।

বি-এ পাস—চন্দনপুর হইতে শ্রীযুক্ত হাজারীলাল মিশ্র লিখিয়াছেন, "আমাদের জন-প্রিয় কবি, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জয়গোপাল রায় এবার বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ফুটবল খেলাতেও বিশেষ পারদর্শী।"

ইংলণ্ড প্রত্যাগত—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ির স্বর্গীয় কালীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র,—সিটি কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, গত অক্টোবর মাসে "পলিটীক্যাল ইকনমি" অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন, এ সংবাদ আমরা যথাসময়ে দিয়াছি; ঈশ্বর-কৃপায় তিনি উক্ত বিষয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন,এবং তিনি যে য়ুনিভার্সিটীতে অর্থ-নীতির লেক্‌চারার হইয়াছেন, এজন্য আমরা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

উপাধিলাভ—রাণাঘাটের নিকটস্থ হবিবপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাধারমণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণ সিংহ প্রায় চারি বৎসর কাল আমেরিকায় অধ্যয়ন করিয়া ইলিনয়স্ Illinois বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি অতি সম্মানের সহিত বি-এস-এ (Bachelor of Agricultural Science) উপাধি লাভ

করিয়াছেন। তিনি যুক্ত সাম্রাজ্য ও ইউরোপের বিখ্যাত কৃষিকার্য্যের কেন্দ্র সকল দর্শন করিয়া আগামী জানয়ারি মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন।

বুদ্ধমূর্ত্তি -বেড়গুম হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,— "এখানে সেখ সাতু মণ্ডল এক পুস্করিণী খনন করাইতেছেন, তাহাতে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে।"

প্রতারণা—সম্প্রতি ১২।২, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বিনয়ভূষণ কুণ্ডুর নিকট হইতে ধরণী সাহা প্রতারণা করিয়া ৬১৲ টাকা লইয়া গিয়াছে, পরে জানাগেল সে আরো কোথাও কোথাও ঐরূপ প্রতারণা করিয়াছে এবং করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কুশদহবাসী সাবধান! যিনি ধরণীকে চেনেন বা তাহার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিলে উপকৃত হইবে। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে ধরণীর বাসস্থান খাঁটুরা গ্রামে ছিল।

চুরি—গত ১৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রে গোবরডাঙ্গা বাবু পাড়ায় বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বাক্স ভাঙ্গিয়া প্রায় ১৫০ দেড়শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। শরৎ বাবুর বাড়ি গড়পাড়ার নিকট। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে চুরি হয় কেন?

এবারে স্থান অভাবে আরো কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইল না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

অর্চ্চনা।—(আষাঢ়, ১৩১৮)—শ্রীযুক্ত কেশবলাল গুপ্ত এম্-এ, বি-এল সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রাচীন ঋষিপত্তন ও বৌদ্ধধর্ম্ম" বহু জ্ঞাতব্য বিষয়-পূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেশ সুন্দর হইতেছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের ডিটেক্টিভ গল্প "বিদ্যাসাগর-বিদ্রোহ" এবার শেষ হইল, আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। "প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর" উল্লেখ যোগ্য রচনা, এরূপ

সারবান প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করে। "বর্ষার সুখ দুঃখ" কুৎসিৎ অপাঠ্য, ইহা যে কেন ছাপা হইল বুঝিতে পারিলাম না।

ভারত মহিলা (আষাঢ়, ১৩১৮)—শ্রীমতী সরযুবালা দত্ত সম্পাদিত। উয়ারি ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৷৵০।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "এডুকেশন" নামক গ্রন্থ হইতে একটি প্রবন্ধের সারাংশ সংকলন পূর্ব্বক "নৈতিক শিক্ষা ও পরিবার গঠন" শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্বারা এ দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের গভীর গবেষণার ফল ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া লেখিকা আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় শেষ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিবনা, কিন্তু লেখিকার ভাষা অতি সুন্দর ও ওজস্বী। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের রচনা "পরশুরামের প্রতি তদীয় পত্নী" নীরস ও বিশেষত্ব বিহীন ;—যেমন উদ্ভট ভাব তেমনি উৎকট ভাষা,—আবার ততোধিক সঙ্কট কাব্যব্যবসায়ীর কবিতা রচিবার সাধ। "নন্দন-বন" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা,—শ্রীমতী অনিভ শ্রীনারের স্বপ্ন হইতে অনুদিত,—অনুবাদ সুন্দর ও মনোজ্ঞ। মূলের ভাব ও রস ইহাতে অবিকৃতই রহিয়াছে। এই লেখকের ভাষা মধুর ও মিষ্ট, রচনাভঙ্গী অন্যান্য সাধারণ এবং অনুকরণাতীত! বর্ণনা-রীতি ও শব্দ-বিন্যাস বাংলায় অতুলনীয়! 'তুমি' শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত চমৎকার কবিতা, এমন সুন্দর কবিতা কদাচিৎ মাসিক পত্রকে অলঙ্কৃত করে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় "মডার্ণ রিভিউ" হইতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির অনুবাদ করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'সন্দেহের ফল' বেশ মুন্সিয়ানার সহিত লিখিত, ইহা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে, সাধনা করিলে ইনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। 'ধনী ও নির্ধন" চলনসই কবিতা।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press 35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from 28/1 Sukea Street, Calcutta

তৃতীয় বর্ষ।]　　আশ্বিন, ১৩১৮।　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয়;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। আশ্বিন, ১৩১৮ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গান

—:০:—

বিভাস।—একতালা।

সংসার মন্দিরে, প্রতি পরিবারে,
করিছ বিরাজ ওগো মা জননী।
পরম যতনে, পুত্র কন্যাগণে,
পালিছ আদরে দিবস রজনী।
মহাশক্তিরূপে নারীর হৃদয়ে,
সুকোমল মাতৃভাব প্রকাশিয়ে,
করিলে মোহিত, মানবের চিত, (জননী গো)
তুমি দেখালে মূরতি ভুবনমোহিনী।
প্রকৃতি মাধুর্য্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা প্রেমের অবতার,
তুমি মাত সকলের মূলাধার, (দয়াময়ী গো)
শিশু ভক্ত সন্তানের হৃদি বিলাসিনী।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা

যিশু চরিত

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত)

বাউলসম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা সকলের ঘরে খাও না? সে কহিল, "না।" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।" আমি কহিলাম "তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?" সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল "তা বটে ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।"

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখাদ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো না কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিশেষ-ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি—আপনাকেই ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চ্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র, এদেশে ধর্ম্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দুসমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল—স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সঙ্কট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ্ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচাররূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্য্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিপদ আমাদের পূর্ব্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না কিন্তু আমাদের অহঙ্কার বাড়িল। পূর্ব্বে এক দিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কার বশত আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহঙ্কারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট

দিব না, কোনো আবর্জ্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্ব্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জ্জীবতাই যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালও যেমন, মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি। জীবনের ধর্ম্মই নির্ব্বাচনের ধর্ম্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জ্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাল, তাহার কিছুই বর্জ্জনীয় নহে ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না—কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্ব্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি

আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না,—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্দ্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্ম্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সকল বিড়ম্বনাসৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই,—যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিলে সমস্ত কৃত্রিমতা, কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন. অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্ব্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জালবুনানীর মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্ত্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড় সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি;—স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব-চিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখ কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়োনা, আঘাত করিয়োনা, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়োনা, তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়োনা। সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীত-কেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই

লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্ত্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহবা দাস্যবৃত্তি, কেহবা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়, এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোমসাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যেদিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরব-চূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারিদিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র য়িহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোমসাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের যেমন প্রবল মূর্ত্তি, য়িহুদি সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

য়িহুদিদের ধর্ম্ম স্বজাতির গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোবা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু য়িহুদিদের সনাতন আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্রমর্ম্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃত-

বাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি য়িহুদি ঋষিগণ পরম দুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্রজ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে তাহাদের বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্ম্মের দ্বারাই য়িহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতি লাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে য়িহুদিদের সমাজে ঋষিঅভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসঙ্কলিত তাল্‌মদ্ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম্ম-পালনের মূলে যে একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে য়িহুদিরা আপনাআপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র য়িহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মূহুর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেককারী যোহন্ যখন য়িহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। য়িহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি ত রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন করিবে কি করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, সয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত য়িহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়া ছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই সর্ব্বত্রব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক্ দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; "যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।" "ধীরাঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাহা সর্ব্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। যেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না; যেখানে যে নত সেই

উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাঁহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র, আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্ত্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও, বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য, কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন, মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছু দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই সয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা, তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পক্ষে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে

আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে, আর, আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে মানকে দেখে,তখনি আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আচারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না, কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই; যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলি ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সঙ্কীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া নৈবেদ্য দিয়া বস্ত্র দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক্ তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চ্চনাদ্বারা দিন রাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দূর দেশ দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—কেননা; যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে

মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে; কারণ, এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখ বহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। দুর্ব্বলের নির্জ্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা—দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কারের গৌরব নহে—কারণ অহঙ্কারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক তাহার নিজের মধ্যে স্বত উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না—তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মত নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ব্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে—শক্তিউপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্ব্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে

নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার গৃহে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সঙ্কোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

দক্ষিণ রায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন সাহ গৌড়ের বাদসাহ হইলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ের বাদসাহগণ দিল্লীশ্বরের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আরব্যোপন্যাসেও দেখা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড় বাদসাহের সেনাপতি উড়িষ্যার গজপতির নিকট হইতে হিজলী অধিকার করেন। ক্রমে পিছলদহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যবিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তখনও হিন্দু ভূস্বামিগণ নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিলেও কার্য্যত স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৩৩৭ সালে সপ্তগ্রামে মুসলমান সুবাদার, তৎপরে লাউপালাগ্রামে মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইলেও ভূস্বামিগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

গোরাগাজি বা পীর গোরাচাঁদ হিজলির, মুসলমান সেনাপতির পুত্র—এই সময়ে, বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ দৈবীশক্তিসম্পন্ন ফকির হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বারো জন সাগরদ্বীপে গিয়াছিলেন। অপর দশ ব্যক্তি আধুনিক নদীয়া যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার অনেক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পীর একদিল সাহেব পরগণা আনরপুরে, গোরাগাজি সাহেব বালিণ্ডায় মবারক সাহা বারুইপুরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এখন পীর নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মবারক সাহাকে সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে ব্যাঘ্রের বিধাতা বলিয়া সকলেই জানে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের হিত করিতেন বলিয়া মবারক সাহা হিন্দু মুসলমান সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। এখনও সকলে ভক্তির সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু গোরা গাজি সাহেব সে প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি যে কেবল হিন্দুকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে, তাহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রথমেই বালিণ্ডায় আড্ডা স্থাপন করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ নগরে মুকুট রায়ের রাজ্যে ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন কালু নামে তাঁহার এক শিষ্য বা ভ্রাতা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঐ কালুকে দিয়া তিনি মুকুট রায়ের সুভদ্রা নামে অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এ প্রস্তাব ছলমাত্র। মুসলমান বিদ্বেষী মুকুট রায়কে জব্দ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন মুকুট রায় ক্রুদ্ধ হইয়া এমন কোন কাজ করিবেন যাহাতে তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইবার ছল খুঁজিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না। মুসলমান রচিত গ্রন্থে দেখা যায় কালু যেমন মুকুট রায়ের সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন অমনই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মুকুট রায় কালুকে কারারুদ্ধ করিলেন। এবং মুসলমান দর্শন ও সম্ভাষণের জন্য উপবাসী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সংবাদ অবিলম্বে গোরাগাজির নিকট পৌঁছিল। তিনি বাদসাহ হুসেন সাহার নিকট উক্ত সংবাদ পল্লবিত ও নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পাঠাইলেন। মুসলমানের রাজ্যে সামান্য বিধর্ম্মী কাফেরের নিকট সত্যধর্ম্মপ্রচারক ফকিরের অপমান—ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? এরূপ অপরাধের শাস্তি বিধর্ম্মীর প্রাণদণ্ড। তাহাতেও রাগ যায় কি? কাজেই মুকুট রায়ের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য বাদসাহী আদেশ প্রচারিত হইল। দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষত হিজলীর বাদসাহী শাসনকর্ত্তাগণ গোরাগাজির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। বালিণ্ডার অন্তর্গত হাড়োয়া নামক স্থানে সৈন্য সমবেত হইতে লাগিল। সমস্ত সাহায্যকারী সৈন্য উপস্থিত হইলে নৌকা-যোগে ব্রাহ্মণ নগরে আসিয়া সহসা আক্রমণ দ্বারা নগর হস্তগত করিবার মতলব স্থির হইল। তদনুসারে চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ নগরে একদল বণিক বানিজ্যার্থ আসিতেছিল। তাহারা এই ব্যাপার অবগত হইয়া যথাসম্ভব সত্বর গতিতে আসিয়া রাজা মুকুট রায়কে এই সংবাদ প্রদান করে। সেনাপতি দক্ষিণ রায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ নৌসেনা সংগ্রহ করিয়া বালিণ্ডা অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার ছিপগুলি এক রাত্রিতেই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছিল। প্রাতে দক্ষিণ রায় বজ্রপাতের ন্যায় শত্রুদিগের

উপর পতিত হইলেন। অতর্কিত আক্রমণের জন্য গোরাগাজি প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহার সৈন্যগণ সহজে পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিল। গোরাগাজি ও তাঁহার ভগিনী রৌসন বিবি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইলেন। ইছামতী তীরে তারাগুনিয়া গ্রামে তিতু মিঞার পূর্ব্বপুরুষ সৈয়দ সাদাউল্লার নিকট আশ্রয় লইয়া গোরাগাজি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পরে গোরাগাজি উক্ত সাদাউল্লা ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রৌসন বিবির বিবাহ দিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সংবাদ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের নিকট পৌঁছিল। কিন্তু কিছু দিন এ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল না। সম্ভবত গৌড়েশ্বর তখন উড়িয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অথবা অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় কিছুদিন মুকুট রায়কে নষ্ট করার অবসর পাইলেন না। দক্ষিণ রায় বুঝিয়াছিলেন গৌড়াধিপের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং তিনিও চুপ করিয়া ছিলেন না। রাজ্যের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে নৌসেনা সংস্থাপন করিয়া সৈন্য সুসজ্জিত করিলেন।

কতকগুলি মুসলমান লেখক বলেন গাজি সাহেব একবার কতকগুলি ভেড়া লইয়া ব্রাহ্মণ নগরে আসিবার জন্য নদী পার হইয়াছিলেন। এবং পাটুনিকে একটি ভেড়া পারাণীর মূল্য স্বরূপ দিয়াছিলেন। রাত্রিতে সেই ভেড়াগুলি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ভেড়া বাঘ হইতে দেখিয়া পাটুনীও ভয়ে অভিভূত হয়। কিন্তু দক্ষিণ রায় যুদ্ধে আসিয়া ব্যাঘ্রদিগকে নিগৃহীত করেন এবং তাহারা পলাইতে বাধ্য হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে গাজি সাহেব প্রচ্ছন্নভাবে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যগণকে ছদ্মবেশে আনিয়াছিলেন। পরে তাহারা রাত্রিকালে নগর আক্রমণ করিলে দক্ষিণ রায়ের বাহুবলে পরাস্ত হইয়া দূরীভূত হয়। এইরূপ কুম্ভীর সৈন্য লইয়া বারান্তরে গাজি সাহেব দক্ষিণ রায়কে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে বারও পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুম্ভীর লইয়া আগমন সম্ভবত নৌ-সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ জলে ও স্থলে বার বার পরাজিত হইয়া এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গোরাগাজি পুনরায় গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দান

৫

মানুষের জীবনে এমন এক একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে যে সময় সে তাহার সমুদয় সুখ দুঃখ লাভ লোকসানের মতন ভুলিয়া—এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়া অন্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সঁপিয়া দিয়া বসে। তখন নিজেকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়া অপরের জন্য কোনো একটা কিছু কাজ কোনো একটা প্রবল আত্মবিসর্জ্জন না করিতে পাইয়া বুকের মধ্যে প্রাণটা যেন রুদ্ধদ্বার লোহার খাঁচায় টিয়া পাখীর চঞ্চুর আঘাতের মতন খোঁচা মারিতে থাকে। মনের মধ্যে যখন সেই আত্মত্যাগের স্রোতময় উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠিয়া তাহা তটের উপর আছড়াইয়া পড়িতে চাহে তখন মনেও করে না সেই উচ্ছ্বাসের আবেগ তাহাকে সেই আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতে পারে!

লোটির সহিত সাক্ষাতের পর হইতে আমার মনে যে নূতন ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটাকে বুকে করিয়া লইয়া সেদিন সারা দিনটাই আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। জানালার বাহিরে মাসীমার বাগানে কোন্ সময় জানিতে পারি নাই বসন্তের বুঝি শুভাগমন হইয়াছিল, ছোট নদীটি গ্রীষ্মের আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই শীর্ণ হইয়া বালু-শয্যার উপরে অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করিয়া নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যালোকে তাহার তলস্থ কম্পিত নুড়িগুলি ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, বসন্তের বাতাস তাহার অঙ্গে পুলক-স্পন্দন আনিতেছিল, ও আকাশের প্রতিবিম্ব তাহার বক্ষে মৃদু আবেগের মতো কম্পিত হইতেছিল। বই খানা মুড়িয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া একবার ভালো করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। নদী-তীরে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ যুগ-যুগান্তরের সাক্ষীস্বরূপ নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মস্তক হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ জটাজাল নামিয়া ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার অবিরল শাখা প্রশাখার মধ্যে কোনো একটি নীড়ে সদ্য-প্রত্যাগত একটি পাখী মৃদু কাকলীতে সন্তান গুলির সহিত আলাপ করিতেছে। এ সমস্তই পুরাতন দৃশ্য, প্রায় প্রতিদিনই আমি ঐ নদী-তীরে ঐ বৃক্ষ-তলে ভ্রমণ করিয়া আমি এই জানালায় দাঁড়াইয়া ঐ শাখাজাল-নিবদ্ধ তরু-শ্রেণী-তলে সূর্য্য কিরণের নিভৃত লুকোচুরি খেলা অন্ধকারের গভীর সুপ্তি চাহিয়া দেখি। ঘন পল্লবের মর্ম্মরিত দীর্ঘ নিশ্বাসে,

সন্ধ্যার স্তব্ধ তন্ময়তায় এবং তরুতল-বিচ্যুত ঝরা ফুলের গন্ধের সহিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসা আর একটা মধুর মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনিতে সহসা আজ আমার জাগ্রত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! একটা অজানা আনন্দে প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! আনন্দে কি বেদনায় বলিতে পারি না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুরবাঁধা বেহালার তারের মতন আমার হৃদয়-তন্ত্রি কয়টা আপনা আপনি কোন এক অজ্ঞাত অঙ্গুলির স্পর্শ-সুখে বিহ্বল হইয়া বাজিতে লাগিল! মনে হইতে লাগিল—এ সুর যেন বিশ্বের বুকের মাঝখানে যে একটি মৃণাল-তন্তুর মতো সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপী অচ্ছিন্ন তন্ত্রিজাল পাতা আছে তাহারি মধ্যে বাঁধা ছিল! আজ বিশ্বের মাঝখানে আমি আমার চিত্ত-কমলের মধু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছি, আমার আলোক, আমার পুলক, আমার বসন্ত, আমার জ্যোৎস্না সমস্তই আজ বিশ্বের বিরাট প্রান্ত ছুঁইয়া আসিয়া আবার আমার নিবেদিত উৎসর্গিত চিত্তকে স্পর্শ করিতে লাগিল! প্রকৃতির মর্ম্মোচ্ছ্বাসময় আলিঙ্গনে নিঃশব্দে কণ্টকিতচিত্তে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া দিলাম, অন্তরের মধ্যে তাঁহারি মতো উদার উন্মুক্ত অবাধ স্বাধীন ও তেমনিতর সর্ব্বত্র বন্ধন-সুখ অনুভব করিতে করিতে নতমস্তকে বলিলাম,—'তুমি ধন্য, তোমার মতন আমিও তৃপ্ত হইতে চাই, ধন্য হইতে চাই।" প্রকৃতির অদৃশ্য করাঙ্গুলি তাহার দক্ষিণা বাতাসের সমস্ত পুষ্প-পরিমল লইয়া তাহার স্নেহ-স্পর্শের মতন আমার আনত ললাটের চারি পাশে ফিরিতে লাগিল। তাঁহার অনিমিষ দৃষ্টি দূরে ও নিকট হইতে আসিয়া উঠিয়া কোমল-স্নেহে আমার নবোচ্ছ্বাস-দীপ্ত মুখের উপর জাগিয়া রহিল! বৃক্ষলতা হইতে প্রকাণ্ডকায় বটবৃক্ষ এবং পরস্পরের ছায়া-ঢাকা বন-বীথী সকলেই মর্ম্মর তানে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে পত্র পুষ্প বর্ষণ করিয়া কহিল,—"তুমি এসো, তুমি আমাদের মতন হও,—তুমি আমাদের কাছে এসো।"

পুরস্কৃত বালিকা পুরস্কার বস্তুটিকে যেমন গর্ব্বিত আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুরস্কার প্রদাত্রীকে মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া আমার পুরস্কার, আমার উচ্ছ্বাস, আমি বক্ষে সংযত করিয়া—মাথা নীচু করিয়া জগতের রাজরাজেশ্বরীকে পুনঃপুন প্রণাম করিলাম। খুব একটা গুমোট করিয়া স্নিগ্ধ সুবিমল বারি-ধারায় ধূসর ধূলিজাল ও নিদারুণ উত্তাপ ঘুচাইয়া ধরণী-বক্ষ শীতল করিয়া যখন বর্ষার বাতাস প্রথম বহিতে থাকে,

তখন প্রকৃতির অঙ্গ যেমন নবীন স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় ভরিয়া উঠে, তাঁহার মুখে যেমন একটি পরিতৃপ্তির ভাব দেখা যায়, আমিও বোধ হয় সেই রকম একটি তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ করিয়া সেদিন আগতপ্রায় সন্ধ্যায় আমাদের উদ্যানে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন বাতাস একটু এলোমেলো বহিতেছিল। আমার 'পিন'-বদ্ধ নীল আকাশের মতো নীল রঙের আঁচল খানা দড়ি-বাঁধা নৌকার পা'লের মতন সেই দক্ষিণা বাতাসে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কপালের উপর এবং কানের পাশে কতকগুলো শ্লথ চূর্ণ কুন্তল বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকিত, তাহারা এবং শৃঙ্খল-মুক্ত হরিণ-শিশুর মতন আরো কয়েকটা গুচ্ছ সেই বাতাসে চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়া চঞ্চল-ক্রীড়াচ্ছলে আমায় বিরক্ত করিয়া তুলিল! মনটা তখন খুব উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল, প্রকৃতির মতন হঠাৎ ততখানি গাম্ভীর্য্য হইতে নামিয়া একেবারে এতদূর চাঞ্চল্য দেখানো মানুষের আত্ম-মর্য্যাদার অনুকূল নয়। মনে যে বিচিত্র আলো জ্বলিতেছিল পাছে তাহাতে ছায়াপাত করে তাই হাস্যোচ্ছ্বসিত সুখী প্রকৃতির পানে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলিলাম। আমার গলায় সেদিন একগাছি অম্লান মুক্তার ছোট মালা ছিল, হাতের চুড়ি কয়গাছি মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল! আকাশের একখানা চঞ্চলগতি চলন্ত তরল মেঘের মতন লঘু বলিয়া নিজেরি আজ অনুভব হইল। যেন এখানের মাটিতে না বেড়াইয়া আর কোন অদৃশ্য নূতন জগতে নব বসন্তের শোভাকীর্ণ বনবীথিকায় বনদেবীর মতন বেড়াইবার জন্য আজ আমার ডাক আসিয়াছে! সেখানকার পুষ্প-কুঞ্জ, সেখানকার তরু-মর্ম্মর, সেখানকার ছায়া-নিপতিত অপরাহ্নের রবি-রশ্মি, সেখানকার স্মিত হাস্যময়ী করুণোজ্জ্বলা প্রকৃতি, সেখানকার সন্ধ্যা-শ্রী সমস্তই এখান হইতে বিভিন্ন! আমার প্রতিদিনকার জগৎ আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিতে লাগিল! নিজেকে আজ জগতের কেন্দ্রস্থলে অভিষিক্তা মহিমাময়ী নারীরূপে তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য সমুদয় আলোক এবং সমুদয় সঙ্গীতের সারভূতা বলিয়া কল্পনা করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল! পৃথিবীর ছোট বড় কামনা বাসনা সব আজ সকরুণ স্নেহে নিজের কাছ হইতে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর মধ্যেই বিলাইয়া দিয়া নিস্ব হইয়া বসিবার জন্য প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল!

কিন্তু মধ্যপথেই আমার নির্জ্জন কল্পনা আমার সুকুমার দিবা-স্বপ্ন সহসা

একটি অতর্কিত সম্বোধনে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সেই সময় বসন্তের দক্ষিণ বাতাস জগতের সমুদয় সার্থক কবিত্বের বিজয় সঙ্গীতের মতন হু হু করিয়া বহিয়া গেল! গাছ-ভরা কুন্দ ও বেলফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া আমার চূর্ণালকগুলি চোখে মুখে আনিয়া ফেলিল! আমার বীণা তাল কাটিয়া ফেলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া আবার নূতন রাগিনীর সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিল! নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম! (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

প্রত্যাবর্ত্তন (৩)

লাহোর হইতে সোজা পথে "গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন" দিয়া দিল্লী যাইব মনে করিয়া যখন দেখিলাম, অমৃতসর দিয়া সাহারাণপুর হইয়া যে লাইন গিয়াছে, সে পথে গেলেও ভাড়া একই, তখন আর একবার অমৃতসর দেখিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। ফলত অমৃতসর 'গুরু দোয়ারা' আমার এত ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই আমি আবার অমৃতসরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার আমার "প্রত্যাবর্ত্তন" বাস্তবিক আরম্ভ হইল। উত্তর সীমা হৃষিকেশ হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দক্ষিণে অমৃতসর আসা পর্য্যন্ত "হিমালয় ভ্রমণ" প্রবন্ধের শেষ করিয়া, এবং "প্রত্যাবর্ত্তন" প্রবন্ধ আরম্ভে অমৃতসর হইতে লাহোর যাওয়া তাহাও গমন পক্ষেরই বৃত্তান্ত। যাহা হউক বেলা অনুমান ৪ টার সময় অমৃতসর আসিয়া প্রথমে দরবারার সেই ভজনানন্দ কিছুক্ষণ সম্ভোগ করিলাম। আজ আর সেই সাধুজীকে তথায় দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরে বংশীধর, মুরলীধরের দোকানে গিয়া মুরলীধরের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলাম "আমি এখান হইতে একেবারে দিল্লী যাইতে চাই, কিন্তু আমার নিকট সম্পূর্ণ ট্রেণভাড়া নাই; এক টাকা কয়েক আনা আছে।"

মুরলীধরকে এই কথা বলিবার পূর্ব্বে আমার মনে একটু সন্দিগ্ধ ভাব ছিল. একথাও সত্য যে, তার পূর্ব্বেও আমি আরো একটু ভাবিয়াছিলাম যে,তাইতো! আমার নিকট এক টাকা কয়েক আনা আছে, কিন্তু দিল্লীর ভাড়া তিন টাকা কয়েক আনা; মধ্যে আর কোথাও হইয়া যাইতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই অতএব মুরলীধরকে বলা ভিন্ন আর উপায় কি?

সাধারণত দেখা যায়, যখন যে কোনো ভাবে হউক না, নিজস্ব একটা ইচ্ছা প্রবল হইয়া পড়ে তখনই যেন ভগবানের করুণার প্রতি নির্ভরের ভাব কমিয়া আসে। এই সুযোগে সয়তান আপনার রাজ্য বিস্তারে অর্থাৎ নিজের মনের মধ্যে যে একটা দুর্ব্বলতার ভাব আছে তাহা মনকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু ভগবান যে আমাকে তাঁহার করুণার মধ্যে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তিনি জীবনের এই শুভ সুযোগে দেখাইলেন, এ ক্ষেত্রে তিনি আমার আব্‌দার বজায় রাখিলেন। মুরলীধর আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রসন্নভাবে দুই টাকা প্রদান করিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে চলিয়া আসিলাম। দিল্লীর টিকিট করিতে ৩।৶০ আনা লাগিল। রাত্রি ৯।০ টার সময় ট্রেন ছাড়িল।

টিকিট করিয়া এক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। দিল্লী পর্য্যন্ত টিকিট হইল, এই আনন্দে—"রাত্রিতে যদি কিছু খাওয়া না হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ?" এই ভাব মনের উপর এমন জোর করিয়া ছিল যে, তখন কোন অভাব বোধ আসিতেই পারিল না। এক পয়সার ছোলা সিদ্ধ লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। কতক নিদ্রায় কতক জাগরণে রাত্রি শেষ হইল। মন খুব সুস্থ, অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত। দয়াল নাম-স্মরণ বেশ যেন মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

প্রাতে ষ্টেসনে (নাম স্মরণ নাই) আধ ঘণ্টার জন্য গাড়ি থামিল। হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম। "চাই জল খাবার, চাই গরম দুধ" ইত্যাদি রব শুনিয়া মনকে ঠিক রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। বিশেষত রাত্রিতে এতটা সংযম চলিয়াছে, কিন্তু উপায় কি ? বসিয়া আছি। আমার কামরায় একটি হিন্দুস্থানী লোক পুরি তরকারি ইত্যাদি কিনিবার সময় আমার দিকে ২।১ বার দৃষ্টি করিল। তাহার মুখে কতকটা সাত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখিয়া কেমন আমার মনে একটু ভাব আসিল, বলিলাম "কুছু খানেকো মিলনে সক্তা ?"

"ক্যা চাইয়ে মহারাজ ?"

"যো কুছ তুম্‌হারা ইচ্ছা"।

অতঃপর সে ব্যক্তি বোধ হয় এক পোয়া পুরি ইত্যাদি প্রদান করিল।

এইরূপ ঘটনা অনেক সময় হয়তো আমাদের মনে সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে ঘটনায় ভগবানের প্রকাশ দেখায় তাহাতো সামান্য নহে। ফলত আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই সামান্য নহে। আমাদের জড়তার মধ্যে যে ঘটনা ঘটে তাহাকে মহৎ করিয়া দেখিতে পারি না, জীবনে যখন

শুভক্ষণ আসে তখনকার ঘটনাগুলি সাধারণ বুদ্ধির অতীত রাজ্যের অনেক সংবাদ প্রকাশ করে।

ট্রেন চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা হইয়া গেল। 'টাইম-টেবল্' দেখিয়া পূর্ব্বেই জানিয়াছি (এ শ্লো প্যাসেঞ্জার ট্রেন) বেলা ২টার পর দিল্লী পেঁাছিবে। তার পূর্ব্বে ক্ষুধা যতই হউক, আরতো কোনো উপায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় পাশের কামরা হইতে একজন পাঞ্জাবী শিখ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ ভোজন করেঙ্গা ?"

"করণে সক্তা।"

"বহুৎ আচ্ছি" বলিয়া নিজেদের কামরায় চলিয়া গেল। আমি ইতি পূর্ব্বে কয়েকবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে ৭।৮ জন শিখ, অনেক অ সবাব সঙ্গে, এক কামরা পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। পরে জানিলাম তাহারা এক রাজার সঙ্গী কারপরদাজ, রাজা ফার্ষ্ট কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাশে আছেন, তাহারা দূরে চলিয়াছে, সঙ্গে পর্য্যাপ্ত খাদ্যাদিও আছে। যখন তাহাদের আহারের সময় হইল তখন আমাকে বোধ হয় সাধু-বেশী দেখিয়া, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া আহার করা তাহাদের নিয়ম বিরুদ্ধ, কিম্বা ইহার মধ্যে বিধাতার আর কি খেলা ছিল, তাহা তখন তো তেমন যেন বুঝিতে পারি নাই, এখন যত ভাবি মনে হয় এ সকল কি রহস্য !!

একটু পরেই সে ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহাদের কামরায় লইয়া গেল এবং এক খানি থারিয়ায় (থালায়) যথেষ্ট পুরি তরকারি মিষ্টান্ন দধি পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া দিল। আহার করিয়া যথাস্থানে আসিয়া বসিলাম, তাহার পর গাড়ি ছাড়িল এবং আড়াইটার পর দিল্লী পেঁাছিলাম।　　(ক্রমশ)

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

১

অহিফেণ। প্যাপেভারেসী জাতীয় প্যাপেভার সাম্‌নিফেরাম্ নামক গাছের অপক্ক ফলকে অল্প অল্প চিরিয়া দিলে উহার গাত্র হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হয়। ঐ রস বায়ুতে শুষ্ক হইলে যে পাটলবর্ণ পদার্থ হয়, তাহাকে অহিফেণ বলে। তুরস্ক, মিশর এবং ভারতবর্ষে অহিফেণ জন্মিয়া থাকে।

তুরস্ক দেশীয় অহিফেণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অহিফেণের যে সকল বীর্য্য আছে তন্মধ্যে মর্ফিয়া নামক বীর্য্যই প্রধান; কারণ অহিফেণের মাদকতাশক্তি এই মর্ফিয়ার উপর নির্ভর করে।

অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ন্যায় অহিফেণও মস্তিষ্কের উত্তেজক। ইহা সেবনের অব্যবহিত পরেই মস্তকে অল্পভার বোধ হয়, প্রাণে আনন্দোদয় হয় এবং শারীরিক শ্রমপটুতা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু শীঘ্রই আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে অনেকেই কোন পীড়া বিশেষের শান্তি লাভের জন্য প্রথমে অল্পমাত্রায় অহিফেণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহার এমনই আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, প্রথম-ব্যবহৃত মাত্রা কখন স্থির থাকে না। দিন দিন ইহার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পরিশেষে অহিফেণসেবী ভয়ানক দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। ইহা দ্বারা রোগের শান্তি অনেক স্থলেই হয় না, অধিকন্তু ইহা নিজেই তখন শরীরে নানা-বিধ নূতন রোগ আনয়ন করে। অহিফেণ সেবনের নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে অহিফেণসেবী কিরূপ অস্থির হইয়া পড়ে তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় অহিফেণ সেবন করিলে শরীর শীর্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন অহিফেণসেবীর ধারণা ইহাতে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অজীর্ণ রোগীকে অল্প অল্প অহিফেন ব্যব-হার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এতৎ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সিড্‌নি রিঙ্গার (Dr Sydney Ringer) মহোদয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Taken into the stomach; opium lessens both its secretion and its movements, and consequently checks digestion,"

অহিফেন দ্বারা প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়; চর্ম্মের স্পর্শানুভব হ্রাস হয় এবং কখন কখন সমস্ত গাত্রে চুলকানি উপস্থিত হয়। অহিফেণসেবীর আদৌ সুনিদ্রা হয় না। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অকালে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সুরার কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পূজা

—০:0:—

ভরি লয়ে সাজি বাহিরিনু আজি
পূজিবারে দেবতায়,
শূন্য আকাশে দেবতা-সকাশে
... হের পূজা যায়।
হৃদয় কালি... শূন্য নিলীমা
মাখি... অঙ্গে,
ঢালি দিনু তার চরণে আমার
কালো যাহা ছিল সঙ্গে।
কালো সনে কালো মিলাইয়া গ্যালো
কালের কালিমা শেষ,
নিরখিল হৃদি সে কাল-জলধি
কালেররসে কালো বেশ।
না জানি কেমনে দেবতা গোপনে
ছিল সে কালোর মাঝ,
কালো করি পার আলোকে আমার
পূজা তুলি' নিল আজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৪)

কুশদহে—গোরবডাঙ্গায় ও ইছাপুরে যমুনা নদীর তীরে কার্ত্তিক মাসের রাস পুর্ণিমায় "ধর্ম্ম সন্ন্যাস" নামে বুদ্ধ দেবের পূজা উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে।

পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মপাল নামক পাল বংশের একজন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিবার সময় প্রচারক দ্বারা বাংলা দেশের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। সে সময়ে এই কুশদহে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। কারণ উক্ত "ধর্ম্মসন্ন্যাস" মুচির দ্বারা হইয়া

থাকে। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে লোক পাঠাইয়া ছিলেন তাহারা বুদ্ধ দেবের উপদেশ অনুসারে চলিতে শিক্ষা দিয়াছিল। কালে লোকে সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহার (বুদ্ধদেবের) মূর্ত্তি পূজায় রত হইল। ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হয়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। বুদ্ধ দেবের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পূজা হইত তাহা কালে হিন্দু পূজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন এই কুশদহে ধর্ম্মপাল দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয় তখন এখানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বাস ছিল না। সম্ভবত সে সময়ে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। কালে তাহারা মুচি এই নীচ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সেই সময়ের অনার্য্য জাতি এই মুচির দ্বারা এই ধর্ম্মসন্ন্যাসের পূজাদি হইয়া থাকে। মুচিরা এক্ষণে গোচী অর্থাৎ পাপ-মুক্ত জাতি বলিয়া আর্য্য জাতির মধ্যে স্থান পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

"কুশদহ" এই নাম কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা রাখা হয় তাহার কোনো স্থিরতা নাই। মাধব সেন যখন বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন তখন নবদ্বীপ বারোটি উপ-বিভাগে (দ্বীপে) বিভক্ত ছিল। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতে এই উপ-বিভাগ গুলির মধ্যে কুশদ্বীপও লিখিত হইয়াছে। মাধব সেনের সময় নবদ্বীপ যে দ্বাদশটি বিভাগের অগ্রণী ছিল নিম্নে সেই কয়টি লিখিত হইল। ইহাতে কুশদ্বীপের কথাও লিখিত আছে। মাধব সেন ও তাহার বংশধরেরা ১০০০ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে "কুশদহ" ১০০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বেও কুশদ্বীপ নামে অভিহিত হইত।

১ম। অগ্রদ্বীপ—উত্তরে মুর্শিদাবাদ প্রদেশ, দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। অতএব দেখা যাইতেছে অম্বিকা পরগণা পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত।

২য়। নবদ্বীপ—ব্রাহ্মণী ও খড়ী নদীর পূর্ব্ব সীমা এবং ভাগীরথীর মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশ।

৩য়। মধ্যদ্বীপ—গঙ্গার পূর্ব্বাংশ জলঙ্গী ইচ্ছামতী ও অঞ্জনা নদীর মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশ।

৪র্থ। চক্রদ্বীপ—মথাভাঙ্গার (বর্ত্তমান চূর্ণা) দক্ষিণ, গঙ্গার পূর্ব্ব এবং

যমুনা নদীর উত্তরাংশের ভূমিভাগ চক্রদ্বীপের অন্তর্গত বর্ত্তমান চাকদা।

৫ম। এড়ুদ্বীপ—যমুনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, গঙ্গার পূর্ব্বাংশ, কলিকাতার উত্তরাংশ এড়ুদ্বীপের অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ। প্রবালদ্বীপ—কলিকাতা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। জয়নগর, পলাবাড়ী প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৭ম। বুদ্ধদ্বীপ—বুড়ান, ধুলেপুর পরগণা, সেনহাটী প্রভৃতি।

৮ম। কুশদ্বীপ—চক্রদ্বীপের পূর্ব্ব, এড়ুদ্বীপের উত্তর ও বুদ্ধদ্বীপের পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর প্রভৃতি কুশদ্বীপের অন্তর্গত।

৯ম। অন্ধ্রদ্বীপ—চক্রদ্বীপের উত্তর, মধ্যদ্বীপের পূর্ব্ব, কুশদ্বীপের পশ্চিম এবং করতোয়া বেত্রবতী নদীর দক্ষিণাংশ।

১০ম। সূর্য্যদ্বীপ বা যোগীন্দ্রদ্বীপ—ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, ইছামতীর পূর্ব্ব ও উত্তরাংশ করতোয়ার উত্তরাংশ, কপোতাক্ষ নদ ও বড়গঙ্গার পূর্ব্বাংশস্থিত প্রদেশ।

১১শ। জয়দ্বীপ—ভৈরব নদের উত্তর, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী ও গৌরী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ।

১২শ। চন্দ্রদ্বীপ—বাক্‌লা নামে কোন প্রসিদ্ধ স্থান।"

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

বেড়গুম

(প্রাপ্ত)

গোবরডাঙ্গার তিন মাইল পশ্চিম দক্ষিণে কুশদহ সমাজের অন্তর্গত বেড়গুম গ্রাম অবস্থিত। খুলনা রেল লাইনের, মসলন্দপুর ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পশ্চিম-উত্তরে পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখীন, বৃক্ষাদিতে পরিবৃত হইয়া বেড়গুম এখনও অতীতের শান্তিময় নিস্তব্ধতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কতকগুলি জনশ্রুতি প্রবাদ বাক্য এবং ঐতিহাসিক দুই একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রাম সংক্রান্ত পূর্ব্ব বিবরণ লিখিত হইল।

অতীত কালে এ প্রদেশ সমুদ্রগর্ভে নিহিত থাকিয়া তৎপরে নিবিড় অরণ্যে, পরিণত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে অদ্যাপি

পুষ্করিণী খনন করিতে গেলে নৌকার জীর্ণ কাষ্ঠ, পেরেক ইত্যাদি পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

বেড়গুমের উত্তরে "ঝোর" নদী বর্ত্তমানে যাহার নাম "ঝোরা" এক্ষণে সামান্য খালরূপে পরিণত হইয়াছে। এক সময় ইহা স্রোতস্বতী ছিল। প্রবাদ আছে, বঙ্গের সুবাদার মানসিংহ যখন মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন, তৎকালে রসদপূর্ণ বৃহৎ নৌকা সকল এই নদী দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল। এই নদী বালিয়ানী গ্রামের নিম্নে যমুনা নদী হইতে বহির্গত হইয়া বেড়গুমের উত্তরাংশে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে হাবড়া, মানিকনগরের মধ্যদিয়া গুমার সন্নিকটে পদ্মা নামক নদীতে সম্মিলিত হইয়াছে। এই পদ্মা নদী পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রবল ছিল। এই নদী ইছামতীর সহিত মিলিয়াছে। ঝোরার দ্বিতীয় শাখা বেড়গুমের উত্তরাংশ হইতে যথাক্রমে কলাসিম, ধর্ম্মপুর, জলেশ্বরের পশ্চিম দিয়া চণ্ডীগড়ের অনতিদূরে পুনরায় যমুনায় মিলিয়াছে।

১১০৬ সালের পূর্ব্বে এই জঙ্গলাবৃত গ্রামে যখন মাত্র কয়েক ঘর কর্ম্মকার ও গোপের বাস ছিল, তখন সর্ব্বপ্রথমে সনাতন ও জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় দুই সহোদরে এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে ছিল। ১১০৬ সালের কিছু পূর্ব্বে ইছাপুরের সিদ্ধপুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশকে জব্দ করিবার জন্য মহারাজা প্রতাপাদিত্য, গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে, বর্ত্তমান প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া যখন শিবির স্থাপন করেন, তখন সম্ভবত ইছাপুরবাসী অনেকেই ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। সনাতন ও জনার্দ্দনের বেড়গুম বাসের ইহাই কারণ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সনাতন খুব বলবান এবং কনিষ্ঠ জনার্দ্দন ধর্ম্মভীরু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে গিয়া, মল্লিকপুর, বালিয়ানি, বেড়গুম, জানানগর (বর্ত্তমান জানাপোল) প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম পাট্টা লইয়া আসেন। প্রথমে মল্লিকপুর কিম্বা বালিয়ানি বাস করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঝোরা নদী পার হইয়া বেড়গুমে আসিয়া দেখিলেন উত্তর-বাহিনী ঝোরা নদী অগাধ বারি-রাশি বক্ষে লইয়া হেলিতে দুলিতে, নাচিতে নাচিতে প্রবলবেগে যমুনার দিকে চলিয়াছে। গ্রামের এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অথবা কয়েক ঘর গরীব

অধিবাসীকেই প্রিয় বোধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

জঙ্গল কাটিবার সময় দেখেন তন্মধ্যে এক বিশাল মনোহর সরোবর শোভা পাইতেছে। এই সরোবরের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদিগের বসবাসের উদ্যম আরো বর্দ্ধিত হইল। এই সরোবর বর্ত্তমানে দীঘী নামে প্রচলিত এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়, তথাপি ফাল্গুন চৈত্র মাসে পদ্ম-পুষ্প বক্ষে ধারণ করত নিজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে এখনো বিস্মৃত হয় নাই।

বর্ত্তমানে সকল রকমেই এই গ্রামের হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ভালো রাস্তা নাই। যাহা আছে ক্রমশ জঙ্গলাবৃত হইতেছে। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র বড় রাস্তা হাবড়ার অনতিদূরে যশোহর রোডে মিলিত হইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। গোবরডাঙ্গার চাটুজ্যে বংশের প্রাতস্মরণীয় স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১২৫৯ সালে যশোহর রোড হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত ৬ মাইল রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া ও বেড়গুমের পূর্ব্বাংশে এই রাস্তার ধারে একটি পুষ্করিণী দান করিয়া কুশদহবাসীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে উভয়েরই অবস্থা মন্দ হইয়াছে। রেল হওয়ায় যদিও এ পথে ভদ্র লোকের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে তথাপি মাল বোঝাই গাড়ী এবং অপর সাধারণের এখনো এই পথেই যাতায়াত করিতে হয়। এখন এই রাস্তা জেলা বোর্ডের অধীন হইয়াছে; ইহার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বেড়গুমের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের কাছারী বাড়ির নিকট ঝোরা নদীর তীরে ১২৪০ সালে জমিদার মহাশয় দিগের এক নীলকুঠী হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান দেখা যায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

আঙুর—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। ৩৫।৬।২ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানিপুর হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত মূল্য আট আনা—বাঁধাই দশ আনা।

এখানি ছোট গল্পের বই, ইহাতে এগারোটি মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষক গল্প

আছে। অল্প স্থানের ভিতর একটি ছবি আঁকিয়া তাহাতে একটা উচ্চ ও পবিত্র ভাব ফুটাইয়া তোলা যেমন চিত্রশিল্পীর নিপুণতার পরিচায়ক, ছোট গল্পের ভিতর একটি সম্পূর্ণ ছবিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অঙ্কিত করাও তেমনি গল্পলেখকের কৃতিত্বের নিদর্শন। পাঁচুবাবুর 'আঙুর' এই শ্রেণীর বই। ইহার প্রত্যেক গল্পই খুব ছোট অথচ সেগুলি লিপিচাতুর্য্যে, ভাব মাধুর্য্যে ও ভাষার বিচিত্র লীলায় এমনি মনোহর হইয়াছে যে পড়িলেই মনের ভিতর একটি সঙ্গীতের মতন সুমধুর অথচ নির্দ্দোষ পবিত্র ছবি অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকে। 'আঙুরে'র সমস্ত গল্পগুলিই ছবির ন্যায় উজ্জ্বল—কবিত্বে রসে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ 'আঙুরে'র এই পূত ও মিষ্ট রসে যে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

ইন্দ্রিয়-গ্রাম—শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্য মিশন দ্বারা প্রকাশিত, স্বদেশ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

শরীর কিভাবে রক্ষিত হইলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে নিয়মিত হইলে রিপুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এবং তাহাতেই যে শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক শান্তি সম্পাদিত হইতে পারে; এই সমস্ত বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ নিজ জীবনের অনেক পরীক্ষিত ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে অনেকের উপকার হইতে পারে।

বারাণসী-রহস্য—শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত, মূল্যের উল্লেখ নাই। বোধহয় বিনামূল্যে বিতরিত।

এখানিও লেখকের নিজ জীবনের কয়েকটি ঘটনা এবং কতকগুলি সাধারণ মত ও বিশ্বাসের কথায় পূর্ণ, লেখকের মত বা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমারা কিছুই বলিতে চাহিনা। তবে গ্রন্থ খানিতে বারাণসী সম্বন্ধে দুই একটি জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষট্পঞ্চাশদ্বার্ষিকী বিজ্ঞাপনী।—এখানি উক্ত স্কুলের ১৯১০ খৃঃ অব্দের কার্য্য বিবরণী।—কলিকাতা মহানগরীতে গভর্ণমেণ্ট বাংলা পাঠশালা ব্যতিরেকে সুন্দররূপে

বঙ্গ-ভাষা শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় না থাকায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মৈত্র ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের যত্নে ৮টি মাত্র বালক লইয়া ১৮৫৫খৃঃ অব্দের ১০ই জুলাই "শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়" নামে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ইহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসর পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গড়ে ৪ জন হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুশদহ-খাঁটুরা নিবাসী প্রবীণ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মে মাসে নিযুক্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত, আন্তরিক যত্ন সহকারে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে পণ্ডিত মহাশয় এই স্কুলের প্রাণ-স্বরূপ। এমন কি শ্যামবাজার অঞ্চলে এই স্কুল "জগদ্বন্ধু পণ্ডিতের স্কুল" বলিয়াই খ্যাত।

গত বৎসর অনারেবল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ সভার সভাপতিরূপে একস্থানে বলিয়াছেন " * * * আজ আমি যেখানে উপস্থিত হইয়াছি ইহা আমার প্রথম শিক্ষাস্থল এবং প্রধান পণ্ডিত মহাশয় আমার গুরু। * * * প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় বশিষ্টদেবের ন্যায় সুদীর্ঘকাল গুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।"

(সমালোচক)

স্থানীয় সংবাদ

আবার সেই ভীষণ সময় উপস্থিত। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশবাসী আচ্ছন্ন। ভাবিলে আতঙ্ক হয়,—কি এক বিষাদ-কালিমা-ছায়া আসিয়া প্রাণে পতিত হয়। যেরূপ প্রবলবেগে এই লোকক্ষয়-কারিণী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দেশ ধ্বংশ করিতেছে যদি অচিরাৎ ইহার বিশেষ কোনো প্রতিকার সাধিত না হয়, তবে মনে হয়, আর পঁচিশ বৎসর পরে এ প্রদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। গত পঁচিশ বৎসরে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না? অবশ্য গভর্ণমেণ্ট হইতে এজন্য বহু আলোচনা আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি,

কিন্তু তাহা আমরা বুঝি কয় জনে, বিশ্বাস করি কয় জনে,—দেশব্যাপী কুসংস্কারে যে আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন, প্রতিকার চেষ্টাই বা কে করে?

ম্যালেরিয়ার অনেকগুলি কারণ থাকিলেও প্রধান প্রতিকার পানীয় জলের বিশুদ্ধি, বাসস্থানের স্যাঁৎ সেঁতে দূর করা, এবং অতিরিক্ত জঙ্গল না রাখা। এগুলি যে আমাদের একেবারেই সাধ্যাতীত তাহা নহে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, দৃঢ়তার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। আহারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে থাকিয়াও অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়।

বেড়গুম হইতে আমরা যে একটি বিবরণ পাইয়াছি তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। এইরূপ কুশদহের প্রত্যেক গ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে আমরা দেশভক্ত গ্রামবাসিগণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

খাঁটুরা নিবাসী পরলোকগত যাদবচন্দ্র মোদকের পুত্র,—পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদকের দুহিতৃ-জামাতা শ্রীমান্ ফণিভূষণ মোদক এবার আই-এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমরা ক্রমশ "কুশদহ"র আকার বৃদ্ধি ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত বিশিষ্ট লেখক লেখিকাগণের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিয়া ইহার উন্নতি-কল্পে, একান্ত চেষ্টা বিস্তর আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতেছি; দেশ-ভক্ত, এবং শিক্ষিত মহিলা মাত্রেই "কুশদহ"র গ্রাহক হউন।

গোবরডাঙ্গার ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—বিদ্যোৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের যত্নে এখানে "গোবরডাঙ্গা বান্ধব লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সকলেই ৵০ দুই আনা মাসিক চাঁদা দিয়া এখান হইতে পুস্তক লইয়া পড়িতে পারেন। আশা করি, যুবক সম্প্রদায়ের এই শুভানুষ্ঠানে দেশবাসী সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press 35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from 28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র

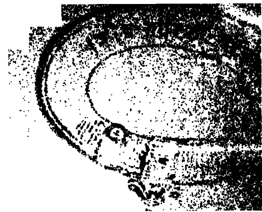


দাসযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩১৮ ৭ম সংখ্যা।

গান

কীর্ত্তন—খয়রা

(ভক্ত গায়ক—কালীনাথ ঘোষ রচিত)

এত কাছে কাছে. হৃদয়ের মাঝে রয়েছ হে তুমি হরি !
(কিন্তু) মনে ভাবি আমি, কতদূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি !
(আমি পাপী ব'লে)
(যেমন.) ছায়াবাজী করে, কত খেলা করে, আড়ালে লুকায়ে থেকে,
(পাছে কেহ দেখ্‌তে পায়)
(তেমনি) আমাদের ল'য়ে, লীলা-মত্ত হ'য়ে, তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে
(পাছে ধ'রে ফেলি)
(যেমন,) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বন-মাঝে. না জেনেও অলি ধায়,
(ফুল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে)
(তেমনি,) না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে, আমার প্রাণ কোথা যেতে চায়।
(ঘরে রইতে নারে)
(নিজ,) নাভি-গন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ, ছুটে গন্ধ-অন্বেষণে,
(কোথা গন্ধ না জেনে)
(তেমনি,) তোমায় বুকে ধরে', আকুল তোমা-তরে, ছুটে বেড়াই ভব-বনে।
(কোথায় আছ বলে !)

(যেমন,) আলোক-সাগরে, অন্ধ স্নান করে, আলো কেমন বুঝ্‌তে নারে ;
(কত অনুমান করে'ও তবু)
(তেমনি,) তোমাতে বাঁচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া, বুঝ্‌তে নারি হে তোমারে।
(প্রভু কেমন তুমি)

(কাওয়ালি)

দেখা যদি নাহি দিলে, দুই আঁখি কেন দিলে ? কেন দিলে এই প্রাণ-মন !
(হরি হে)
ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে, কেন প্রাণে এই আকর্ষণ ?
(হরি তোমার তরে হে)
খুলে দাও আঁখির ভোর ঘুচাও হে মোহ-ঘোর, দূর কর যত ব্যবধান,
(হরি হে)
এই তুমি, এই আমি, এই ত হৃদয়-স্বামী, দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ।
(জনম সফল কর হে)
(ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন)

কর্ম্মদেবী

রাজপুত ইতিহাসে "কর্ম্মদেবী" নামটিতে যেন দৈবশক্তি নিহিত। গৌরবাত্মক অবদান ও কঠোর বীরধর্ম্ম প্রায়ই এই নামের অনুসরণ করে, এইরূপ পরিলক্ষিত হয়। রাজপুত বীর জাতি ; বীরত্বই তাহাদের আরাধ্য। রাজপুত রমণিগণ নিজেরাই শক্তিস্বরূপিনী, অপিচ বীর্য্য-আরাধনায় তাঁহারা নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া থাকেন। এই স্থলে যে কর্ম্মদেবীর কথা উক্ত হইতেছে, তিনিও চিতোরের ভূতপূর্ব্ব রাণা সংগ্রামসিংহের দয়িতা কর্ম্মদেবী অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহেন। যদিও ইনি সম্মুখ-সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তাঁহার অমানুষী মানসিক বল ও অপূর্ব্ব তেজ অধিকতর গৌরবজনক। বস্তুত উভয়েই রাজপুতের আদর্শস্থানীয় এবং আদরের বস্তু।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে মাণিক রায় মোহিল নগরের রাজা

ছিলেন। কর্ম্মদেবী তাঁহারই কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মারওয়ার দেশের তাৎকালিক বরবর্ণিনিগণের মধ্যে কর্ম্মদেবী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন। চন্দ্র-রশ্মির লাবণ্য, কুসুমের সৌকুমার্য্য, গুঞ্জরবের হৃদয়োন্মাদকারী ক্ষমতা, বালসূর্য্যের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ একাধারে তাঁহাতে মিলিত ছিল। বিধাতা পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন বিরলে বসিয়া একান্তমনে তাঁহাকে সৃজন করিয়াছিলেন।

তত্রত্য রাজপুত রাজগণ-মধ্যে কঠোর বীর মহারাজ চণ্ডই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমল অতি সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতি অপেক্ষা সাধু নামক অপর একজন সামান্য যুবকের বীর্য্য-মহিমা এই সময়ে অধিকতর প্রখ্যাত হইয়াছিল। সাধু, পুগল নামক জনপদের ভট্ট বীরদিগের সর্দ্দার রণঙ্গদেবের পুত্র। সাধুর বীরত্ব, সাধুর উৎসাহ, সাধুর কার্য্যকরী ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে, মরুস্থলীর ভদ্রেতর সকলেরই সে ভীতিস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ড-পুত্র অনঙ্গদেবের সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহ-প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মোহিল-কুল গৌরব ও ক্ষমতায় রাঠোর অপেক্ষা হীন হইলেও কর্ম্মদেবীর সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চণ্ড এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়েন নাই। মাণিক রায়ও এ বিবাহ শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহে সহসা এক অন্তরায় উপস্থিত হইল। বীরহৃদয় কর্ম্মদেবী স্বভাবতই বীরত্বের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি এ বিবাহে অসম্মত হইয়া সাধুকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। রাজবধূ হইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সামান্য গৃহস্থের গৃহিণী হইতে প্রলুব্ধা হইলেন।

মাণিক রায় তনয়ার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে মুহ্যমান হইলেন। অরণ্যকমলের সহিত বিবাহ না হইলে উচ্চতর বংশ-গৌরব লাভের আশা তো নির্ম্মূল হইবেই, অধিকন্তু অরণ্যকমল ক্রুদ্ধ হইয়া মোহিল বংশের উচ্ছেদসাধন না করিলেই মঙ্গল! মাণিক রায় কন্যাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সকলই নিরর্থক হইল। পরিশেষে তিনিও অপত্য-বাৎসল্যের প্রবণতায় কর্ম্মদেবীর সহিত একমত হইয়া সাধুর নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন এবং ভাবী বিপদের কথাও যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তেজোদীপ্ত সাধু বিপদের আহ্বানই ভালো

বাসিতেন, তাই তিনি আগ্রহের সহিত বিবাহে সম্মত হইয়া বলিলেন—"আপনি কৌলিক-প্রাথানুসারে পুগলে নারিকেল প্রেরণ করুন, তাহা হইলেই আমি বিবাহে অগ্রসর হইব।" নারিকেল প্রেরিত হইল এবং অল্পদিন মধ্যেই পিতৃভবনে কর্ম্মদেবী সাধুর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহান্তে কর্ম্মদেবী স্বামী-সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। পঞ্চাশৎ মোহিল সৈন্য ও সাধুর সমভিব্যাহারী সপ্তশত ভট্টবীর তাঁহাদের অনুগমন করিল। এদিকে অরণ্যকমল বিবাহের কথা অবগত হইয়া সাধুর শোণিতে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য চারি সহস্র পরাক্রান্ত রাঠোর সৈন্য সঙ্গে লইয়া সাধুর পথাবরোধার্থ ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে সাধু সদলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অরণ্যকমল সেই স্থলেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চারি সহস্রের সহিত সার্দ্ধ সপ্তশতের যুদ্ধ হাস্যকর হইলেও বীরবর সাধু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইবার সময়ে বিদায় গ্রহণার্থ কর্ম্মদেবীর চতুর্দোল-সন্নিধানে গমন করিলেন। কর্ম্মদেবী বলিলেন,—"আপনি স্বচ্ছন্দমনে যুদ্ধে গমন করুন, আমি আপনার যুদ্ধ দর্শন করিব। আপনি তরবারি ধারণ করুন, আমি আপনাকে উৎসাহিত করিব, আর যদি দৈববশে আপনার বরদেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয় আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হইব।" সাধু মহোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে অযথা লোকনাশ অরণ্যকমলের উদ্দেশ্য ছিলনা, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধুর বিনাশ। সাধু ভীষণবেগে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনি সানন্দে স্বীয় অশ্ব তদভিমুখে ধাবিত করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র সৈনিক শিষ্টাচারে ব্যয়িত হইল, পরক্ষণেই আবার ভীষণ সংগ্রাম। দেখিতে দেখিতে সাধুর ভীম অসি অরণ্যকমলের মস্তক-উদ্দেশে প্রহৃত হইল। অরণ্যকমল তাহার আংশিক প্রতিরোধে সমর্থ হইয়া সাধুর মস্তকে বিপুল বলে স্বীয় অসির প্রহার করিলেন। উভয় বীরই ভূপতিত হইলেন। অরণ্যকমল অল্পই আঘাত পাইয়াছিলেন সুতরাং কিছুকাল পরে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল;—সাধু আর উঠিলেন না। তাঁহার জীবন-দীপ চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইল।

নব-বিবাহিতা সতী কর্ম্মদেবীর সমুদয় আশা ভরসা বিলয় প্রাপ্ত হইল। সুখের তরুণ ভানু উদিত হইতে না হইতেই অস্তমিত হইল! বীণার মধুময়

স্বর-লহরী আলাপের প্রথমোচ্ছ্বাসেই নীরব হইল ! এ দুঃখ অসহ্য। বীরনারী তাঁহার দুঃখ বিমোচনের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন—তিনি চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন।

চিতা সজ্জিত হইলে তিনি যথাবিহিত পূজাকৃত্য সমাপন করিয়া একখানি তরবারিদ্বারা নিজের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিলেন, তৎপরে সেই ছিন্ন হস্ত একজন ভট্টবীরের করে অর্পণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—"ইহা আমার শ্বশুরকে প্রদান করিয়া বলিবেন,—"আপনার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" পরে সেই তরবারিখানি অপর সৈনিকের করে অর্পণ করিয়া তাহাকে বাম হস্ত ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। সৈনিক সেই অপার্থিব তেজোময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না—বাম হস্তও ছিন্ন হইল। তখন তিনি নিরুদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন—"ইহা ভর্ত্তাদিগকে প্রদান করিয়া বলিবেন,—'কর্ম্মদেবী তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে।" সতী চিতায় আরোহণ করিলেন; অল্পকাল মধ্যে হৃদয়োন্মাদকারী হাহাকার ধ্বনির মধ্যে তেজোগর্ব্বমিশ্রিত প্রেমপবিত্রতাপূরিত অনিন্দ্য যৌবন-সুষমা চিতা-ভস্মে লুক্কায়িত হইল !

হায় ! সে মুখের কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ! সে নয়নের কী দৃঢ় কটাক্ষ ! সে হৃদয়ের কী মধুর সৌরভ ও কী প্রবল তেজ !

রাজপুতনার সে দিন গিয়াছে। তাহারা এখন নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ। তবে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই সব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

দান

৬

সম্মুখেই লতাগৃহের কাচের দরজা খুলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। একজন শুধু আমার দিকে চাহিয়া বিনম্রমস্তকে নমস্কার করিয়া প্রতি নমস্কার পাইতে না পাইতেই উদ্যানের

রাস্তা ধরিয়া বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। অপর লোকটি একটুখানি হাসিয়া মাথাটা একটু নীচু করিলেন, কিন্তু চলিয়া গেলেন না; বরং কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা গিয়েছিলে ?" মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্ত-স্রোত থম্‌কিয়া থম্‌কিয়া বহিতে লাগিল। তাহার একটা উচ্ছ্বাস মুখের উপর যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। মনের সে বিশ্বাসঘাতকতায় ঈষৎ বিরক্ত হইয়া অথবা স্বাভাবিক লজ্জায়—তাহা ঠিক বলিতে পারি না, আমার নেত্র-পল্লব সহসা আনত হইয়া আসিল, ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে তাঁহার প্রসারিত করে আমার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম,—"নদীর ধারে।" আমার হাতখানা সস্নেহে স্পর্শ করিয়া—এক মুহূর্ত্ত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিলেন ! আমার চকিত নেত্র তাঁহার প্রেমোদ্দীপ্ত মুখ-মণ্ডলে এক মুহূর্ত্তের জন্য একটা পুলকোচ্ছ্বাস আনিয়া দিল ! কমনীয়তার সঙ্গে সুদৃঢ় হৃদয়-বৃত্তির একটি ছবি কে যেন এই মর্ম্মরিত লতা-কুঞ্জের পাশে অপরাহ্নের আলোকে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিল ! আমার জীবনের যে অংশটা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবার জন্য এতখানি আগ্রহ, এত খানি অস্থিরতা জাগিয়া উঠিয়াছিল; মুহূর্ত্তে তাহা ঐ মুখের, ঐ হৃদয়-ভারাবনত সুগভীর দৃষ্টির তলে আকুল হইয়া পরিত্যাগভীত শিশুর মতন দুই হাতে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল !

তিনি বলিলেন,—"নদীতীর তোমার খুব ভালো লাগে, না ভায়োলা ?" এই 'ভায়োলা' সম্বোধনটা আমার হৃদয়-বীণার একটা তারের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। সে আহত তন্ত্রীর মধুময় রাগিনী আমার কানের কাছে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল; আমি স্পষ্টই তাহা শুনিতে পাইলাম ! ইতিপূর্ব্বে 'মিস্ ম্যানিং'এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ দাঁড়াইয়াছিল 'ভায়োলীন'; আজ বন্ধন যখন শিথিল হইয়া খুলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় আবার সজোর চেষ্টা কেন ? আমি মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নত নেত্রযুগল তুলিয়া বলিলাম,—"আমার একটি অনুরোধ আছে—" কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাধা দিলেন—"যেখানে আদেশ করলে চলে সেখানে অনুরোধের প্রয়োজন ?"

আমি এ কথাটায় কান না দিয়া নিজের বক্তব্য শেষ করিলাম,—"অনুগ্রহ করে যদি শোনেন তবে বল্‌তে সাহস পাই।" আমার ভবিষ্যৎ প্রভু সচকিতে এক

বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া অদূরস্থ কাষ্ঠাসনখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"অনুগ্রহ করে যদি কিছু আদেশ কর ঐখানে বসেই সেটা শোনা যাক্‌না, তোমার ভূমিকা দেখে মনে হচ্চে দুই এক কথায় বক্তব্যটা শেষ হবে না!" আমিও তাহাই খুঁজিতেছিলাম—ঠিক মুখো-মুখি দাঁড়াইয়া বলা কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল। বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিলে তিনি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলবে বলো।" বলিলাম,—"আগে বলুন আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না ?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি স্বীকার করলুম; নিশ্চয়ই তুমি কিছু আমায় 'রক' পাখীর ডিম বা তেমনি কিছু খুঁজে আন্‌তে বলবে না।"

উপমার ধরণটায় আমার মুখে বোধ হয় একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; বলিলাম,—"না সে রকম খেয়াল আমার হয়নি, আমার একটি বন্ধু আছে তার নাম লোটি—" বলিয়া একটু থামিয়া আমার শ্রোতার পানে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তিনি একটু ঝুঁকিয়া হাতে-হাতে বদ্ধ করিয়া মনোযোগ দিবার ভাবে বসিয়াছেন। সেই দক্ষিণে এলোমেলো হাওয়া তাঁহারো প্রশস্ত ললাটের উপরে সংযত সুবিন্যস্ত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে তাহার সরু সরু অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া সযত্নে একটু একটু নাড়িতেছিল! পশ্চাতের 'অরোকেরিয়া'র ছায়া-বিচ্যুত সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখের উপর তাঁহারি মতো কৌতূহলে চাহিয়া দেখিতেছিল! আমি বলিলাম,—"না, তার নাম লোটি নয়, তার নাম সার্লট, সবাই তাকে 'লোটি' বলে ডাকে; সে ছোট বেলা থেকে আমার বন্ধু, আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।"

এই কথার পরেই যে তাঁহার অধর-প্রান্ত একটা সকৌতুক অবিশ্বাসের হাস্যে ঈষৎ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার অগোচর রহিল না; মনের উচ্ছ্বাসটা যেন একটা অনাবশ্যক আঘাত প্রাপ্তে চারিদিক দিয়া আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! স্বর একটুখানি উচ্চ করিয়া—দ্বিধা একটুখানি কাটাইয়া বলিতে লাগিলাম,—"আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, সেও আমাকে তেমনি ভালোবাসে।" এই কথাটায় প্রমাণ করিতে চাহিলাম, তোমার হাসিটা তুমি ফিরাইয়া লও। স্ত্রীলোকের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় জিনিষটাকে যে এমন উপহাসের সহিত সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিতেছ, সেটা তত ক্ষুদ্র জিনিষ নয়! কিন্তু তিনি কি বুঝিলেন জানি না; তাঁহার মুখেবেশ একটু রহস্যপূর্ণ করুণার হাসি

ঈষৎ আগ্রহের সহিত ফুটিয়া রহিল। আমার বড় রাগ হইল, এ কী অন্যায় অবিশ্বাস! ইনি বোধ হয় ভাবিতেছেন, আমি আজ বসন্তের উন্মাদ সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে মুগ্ধ পুষ্পের মদিরাময় পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া এই নির্জ্জন উদ্যানের প্রান্তে বসিয়া একপাতা 'নভেল' শুনাইবার অদম্য লোভে তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া সাধিয়া আনিয়াছি! কেমন করিয়া আমাদের সুপ্ত-প্রেম-নির্ঝরের ধারা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিব, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু এ লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য মন পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম হইতে অবিশ্বাসের হাসি! তবে শেষ হইবে কিসে? এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,— "অত কষ্ট করে তাঁর পরিচয় দিতে হবে না, আমি তাঁকে খুব চিনি, 'মিস লোটি' কনভেন্টের একটি ছাত্রী, তোমার সখী এবং একটি অনাথা, 'নান্'দের দয়ায় পড়াশোনা অনেকটা হয়েছে," আমি এইখানে বাধা দিলাম, "হ্যাঁ'লোটি পড়াশুনা ভালোই করেছে, সে ভারি সুন্দরী! শুধু অনাথা এইটুকু তার খুঁত" মিঃ ব্রাউন ঈষৎ হাসিলেন,—"কী আমায় আদেশ কর্‌চো? কুমারীটির জন্য একটি কুমারের যোগাড় করা? সে এমন কি আশ্চর্য্য, তোমার সখী দু' একটা দিন আমাদের সোসাইটিতে ঘুর্‌লেই অনেকের আবেদন পত্র পাবেন। আচ্ছা আমি আমার একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটু কথা কইব; তিনি বিপত্নীক—" আমার বেশ মনে হইল তিনি এসব কথাগুলো যতক্ষণ বলিতে লাগিলেন, সমস্তক্ষণই তাঁহার মুখে একটা বেদনার ভাব স্পষ্ট জাগিয়া রহিল, গলাটাও কেমন যেন কাঁপিয়া যাইতে লাগিল! ঠিক কি ইহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না, হয়তো ইহা আমারি কল্পনা। তিনি চুপ করিলেন বেঞ্চের পিঠের উপর একটু হেলিয়া বসিয়া একটুখানি নিশ্বাস ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন! আমি সঙ্কোচের সহিত বলিয়া ফেলিলাম,—"আমার অনুরোধ—আপনি নিজেই লোটিকে বিয়ে করেন।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, অস্ফুটবিস্ময়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি? সে কী করে হবে? সে কি কখনো হয়?" আমি তাঁহার তরল বিদ্রূপের উচ্চ হাসি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কল্পনা করিতে ছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে এতখানি মনোদ্বেগ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যানুভব করিলাম, একটু সুখ কি দুঃখ, আশা কি নিরাশা, কে জানে কি একটা একবারটি মাত্র বুকের কাছটাতে ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তখনি জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"কেন হবে না? আপনি স্বাধীন, ইচ্ছা করলেই হয়; মাসীমাকে আমি বোল্‌বো 'আমার অনিচ্ছাতে এ বিয়ে ভেঙে গেল।' উইলের সর্ত্তেও এ-তে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না।" তিনি যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! হাতে-হাতে ঘর্ষণ করিয়া ঠোঁটে-ঠোঁটে চাপিয়া নিজেকে যেন কি একটা ঘোর প্রলোভনের হাত হইতে—কঠোর পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া রুদ্ধপ্রায়স্বরে কহিলেন,—"কেন ভ্যালী! আমায় কেন প্রত্যাখ্যান করচো? আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি?" আমি বলিলাম,—"কিছুই না"। তারপর আর কি বলিব তাহা ভুলিয়া গেলাম।

সমস্ত দিন ধরিয়া এতক্ষণ নদীর কূলে বসিয়া বসিয়া বক্তব্যটিকে এমন প্রাঞ্জলভাবে এমন শোভনীয়-রূপে সাজাইয়া লইয়াছিলাম! কিন্তু যে রকম আশা করিয়াছিলাম ঠিক তেমন হইল না; তাই আমার কল্পনা, আমার কাব্য ম্লান হইয়া গেল। ইহার চেয়ে তিনি যদি আমার এই মহত্ত্ব, এই অপরিসীম আত্মত্যাগকে ছেলেখেলা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, তাহাহইলেও বোধ হয় আমার সাধের কল্পনা এমন করিয়া শুকাইয়া উঠিতে চাহিত না! হৃদয়ের বল মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গিয়া বুক ফাটিয়া হাহাকার বাহির হইয়া আসিত না! কিন্তু এখন আর উপায় নাই! আমার সন্দেহ সত্য, আমার আশা স্বপ্নমাত্র! হায় স্বার্থ-পরিপূর্ণ মানবী!

(সমাপ্ত) শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ফুল

(মূল পারসী হইতে)

প্রভাতে কাননে যবে ফোটে ফুল সুষমা বিকাশি'
সোহাগ সম্মান কত দেয় তারে ধরণী-নিবাসী।
নৃপতি-উরসে কভু বিলসিত—সাজি' ফুল হারে,—
বিবাহ-বাসরে কভু হেরিয়াছি নব বর-করে;
পড়েনি কভু গো কিন্তু আঁখি-পথে হেন ভাব আর,
হতাশের শবোপরি নিরখিনু তার যে আকার।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

দক্ষিণ রায়

প্রবাদ আছে, গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেনসাহা বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র খাঁ-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ হুসেনসাহার পিতা বালক-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থ বাংলায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হয়। যে স্থানে হুসেনসাহার জাহাজ ডুবিয়াছিল, সে স্থান এখনও বৃদ্ধেরা দেখাইয়া থাকেন। বালক হুসেনসাহা কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রথমে গোচারণে নিযুক্ত করেন। এক দিন বালক হুসেন গোরু ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষ-তলে নিদ্রাগত হইলে এক বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প তাঁহাকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করার মানসে ফণা বিস্তার করিয়া মস্তকে ধরিয়াছে, এমন সময়ে দৈবাৎ রামচন্দ্র সেই দিকে যাইতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন; এবং হুসেন যে ভবিষ্যতে রাজ-মুকুট ধারণ করিবে তাহা বুঝিতে রামচন্দ্রের বাকী রহিল না। তদবধি রামচন্দ্র গোচারণ হইতে হুসেনকে অব্যাহতি দিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। হুসেন অল্প দিনের মধ্যে যথেষ্ট শিখিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র তাঁহাকে এক পত্র দিয়া নিজ উকিলের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়া কোন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সুবুদ্ধি রায় ঐ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার নিকট সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ প্রতিভা-বলে হুসেনসাহ কয়েক বৎসরের মধ্যে গৌড়ের বাদসাহ হইয়াছিলেন। কিন্তু বেনাপোলে অবস্থিতি-কালে স্বার্থপর রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, হুসেন রাজা হইয়া কখন ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিবেন না এবং রামচন্দ্রকে নিজ ভু-সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করিতে দিবেন। কার্য্যতঃ হুসেনসাহ রাজা হইয়া শেষ প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমটি কতদূর রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

বেনাপোলে অবস্থিতি-সময়ে হুসেনসাহ মুকুট রায়ের মুসলমান বিদ্বেষের সংবাদ রাখিতেন। দক্ষিণ রায়ের অসামান্য রণকুশলতার পরিচয়ও জানিতেন। এক্ষণে গোরাগাজি কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া ভূরি পরিমাণে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। জনৈক সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে

একদল সেনা নৌকাযোগে পাঠাইলেন। উত্তর দিকে মুকুট রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সেনাদল আদিষ্ট হইল। গোরাগাজি দক্ষিণ দিক হইতে ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ দেশস্থ হিজলী প্রভৃতি স্থানের পাঠান ভূস্বামিগণ গোরাগাজির সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। এইরূপে যুগপৎ ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া গৌড়েশ্বর জয়াশায় উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু তিনি মুকুট রায়ের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। এই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া সম্ভবতঃ হুসেনসাহ্ পরলোক গমন করেন।

দক্ষিণ রায় এই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নদী-তীরস্থ গ্রামগুলি বসতি-শূন্য করিয়া খাদ্য-সামগ্রী মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে গুপ্ত সৈন্যদল স্থাপন করিয়া শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে পাঠান সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি নবগঙ্গা বাহিয়া আসিয়াছিলেন। আবশ্যকমত খাদ্য সামগ্রী নৌকায় ছিল। তিনি কয়েক দিনের আহারীয় সঙ্গে লইয়া শত্রুর রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আধুনিক কালীগঞ্জের নিকটস্থ নদী পার কালে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণ রায় তাঁহাকে হটাইয়া তাঁহার অনুসরণ জন্য অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া গোরাগাজির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সত্বর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন।

পাঠান-সেনাপতি পশ্চাৎ গমন করিয়া আধুনিক নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌঁছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আহার্য্যাভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হইয়াছিল। সেনাপতি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া সৈন্যগণের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বেঙ্গা নদী-তীরে শিবির-স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর এক অতি প্রিয় শিষ্য বেঙ্গা নদী-তীরে ক্ষেত্রগুনি গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নাম শ্রীগালিম। নলডাঙ্গা রাজ-বংশের স্থাপয়িতা বিষ্ণুদাস হাজরা সেখ গালিমের শিষ্য ছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীগালিম রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম আনন্দে বাস করিতে ছিলেন। জীবে দয়া সাধুর ধর্ম্ম। বিপন্ন পাঠান সেনার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাঁহার ঠাকুরের কৃপায় বিপন্নকে অন্নদান করিতে সমর্থ

হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুদাস সুযোগ বুঝিলেন। তিনি সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচুর আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার ভার লইলেন এবং পাঠান সৈন্য সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত শস্য সকল দেখাইতে লাগিলেন। প্রচুর শস্য সংগৃহীত হওয়ায় সেনাপতি আশান্বিত হইলেন। তিনি বিষ্ণুদাসকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া দক্ষিণ রায়ের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করিতে বলিলেন। বিষ্ণুদাস স্বীকৃত হইলেন। পরম ভাগবত শ্রীগালিম ইহাতে বিষ্ণুদাসের উপর বিরক্ত হইয়া ক্ষেত্রগুলি পরিত্যাগ করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে সেখানে দেখে নাই। শিষ্যের বিষয়-লোভে বিরক্ত হইয়া সম্ভবতঃ তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদাস এই কার্য্য করিয়া পাঁচ খানি গ্রাম লাভ করেন। তাহাই নলডাঙ্গা রাজ্যের প্রথম সম্পত্তি।

যাহা হউক, বিষ্ণুদাসের সহায়তায়, পাঠান সেনাপতি কিছুদিনের মধ্যে আবশ্যকীয় সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। দক্ষিণ রায় যুদ্ধার্থ সৈন্যসহ দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছেন শুনিয়া অবিলম্বে অরক্ষিত ব্রাহ্মণ নগর অবরোধ করিলেন। দক্ষিণ রায় সে সময় গোরাগাজির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন। নগর সেনাপতি-শূন্য হইলেও রাজা মুকুট রায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁহার সহায় ছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পরে মুসলমান সৈন্য কৌশলক্রমে পানীয় জল বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। মুসলমান লেখকেরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ নগরে অমৃত কুণ্ড ছিল; তাহার জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত। সূর্য্যদেবের বরে এইরূপ ঘটিত। যাহা হউক, সেই কুণ্ডে নিষিদ্ধ মাংস নিক্ষিপ্ত করায় কুণ্ডের গুণ নষ্ট হইয়া গেল। আর দৈব-সাহায্য মিলিল না। কাজেই মুকুট রায় পরাস্ত হইলেন। পরাজয়ের পর জীবন রক্ষা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মুকুট রায় কূপ-মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনীও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণের মধ্যে দুই জন সপরিবারে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব ধৃত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার কেবল উপনয়ন হইয়াছে মাত্র। কনিষ্ঠা কন্যা সুভদ্রাকে লইয়া জনৈক বিশ্বস্ত আত্মীয় বুড়নের গণরাজার আশ্রয় লইয়াছিল।

যখন ব্রাহ্মণ নগর বিধ্বস্ত হইল, তখন দক্ষিণ রায় প্রধান শত্রু গোরাগাজির

সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন-কালে তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার আগমনের অনতিপূর্ব্বেই নগর শত্রু-হস্তগত হইয়াছে। রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে মৃতপ্রায় হইয়া তিনি সহচর ও সঙ্গিগণকে বিদায় দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বুড়নের গণরাজার নিকটে আশ্রয় লইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। তিনি নিজের নিতান্ত বিশ্বস্ত কয়েক শত সৈন্য লইয়া বিজয়ী মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ লোককে হতাহত করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, দক্ষিণ রায়কে তাঁহারা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদ অনুসারে দক্ষিণ রায় নিজ ইষ্টদেবতা সূর্য্যের মন্দিরের সম্মুখে, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন! তাঁহার দৈহিক বল, সাহস, সমর-কুশলতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রভুভক্তি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছে। এখনও সুন্দর-বনাঞ্চলে তাঁহার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাঁহার দেবতুল্য চরিত্র ও ইষ্ট-নিষ্ঠার জন্য তিনি তথায় দেবতা-তুল্য পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পানীয় জল

মনুষ্য-শরীর একটি কল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কল দিবা ও রাত্রি সকল সময়েই চলিতেছে। যেমন কয়লা ও জল না দিলে কল অচল হয়, তেমনি খাদ্য ও পানীয় জল সময়মত না যোগাইতে পারিলে শরীর ক্ষয় হইয়া জীবের মৃত্যু হয়। আমাদের শরীর সর্ব্বদাই ক্ষয় হইতেছে। সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য আমরা আহার করি ও জল পান করি। ফল কথা, শরীর রক্ষা করিতে হইলে খাদ্য যেমন প্রয়োজনীয়, পানীয় জলও তদপেক্ষা কম নহে। দারুণ গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিনে, যখন তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন আহার না করিয়া বরং দিন কাটাইতে পারি কিন্তু জলপান না করিয়া থাকা বড়ই কষ্টসাধ্য। এই জন্যই বোধ হয় জলের আর একটি নাম জীবন। আর্য্য ঋষিগণ জলের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—"আপো নারায়ণঃ স্বয়ং"। হিন্দু-শাস্ত্রে জলকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবার

কথা বহুস্থলে লিখিত আছে। "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাশন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ" ইত্যাদি কথা আজও ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, অপরিষ্কার ও দূষিত জল পানে আমাদের শরীরে কোন্ কোন্ ব্যাধি কি ভাবে আসিতে পারে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপকারিতাই বা কি এবং কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমরা বিশুদ্ধ সুপেয় জল লাভ করিতে পারি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা দেশে কলিকাতা, ঢাকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় সহরে কলের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ জল যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সুপেয় তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং উক্ত সহরবাসী ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হয় না। মফঃস্বলে কলের জল নাই; তথায় নদী, পুষ্করিণী বা কূপের জল লোকের একমাত্র সম্বল। ঐ জলের অবস্থা ভাল থাকিলে কোন দুঃখ ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা দেখিতে পাই, নদী স্বল্পতোয়া ও মৃদুস্রোতা হইয়া মজিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীতে শৈবালাদি জন্মিয়া জল দূষিত হইতেছে। অগভীর ও কাঁচা কূপ সকলের মধ্যে নানা আবর্জ্জনা পড়িয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতেছে। কদর্য্য আহারে যেমন নানাবিধ রোগ জন্মে, দূষিত জল পানে সেইরূপ অনেকানেক পীড়া জন্মাইয়া থাকে। আমরা সচরাচর যে সকল মরা নদী বা পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকি, তাহাতেই স্নান করি, বাসন মাজি ময়লা কাপড় ও মলমূত্র সংযুক্ত বিছানাদি ধৌত করি। একে উহারা স্বচ্ছসলিলা ও খরস্রোতা নহে, তাহাতে আবার তৈল, ময়লা, মলমূত্র কফ কাসাদি মিশ্রিত হইয়া উহাদের জল দ্বিগুণ দূষিত হইয়া পড়ে। অনেকে পুষ্করিণীর সন্নিকটেই পাইখানা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী বা কূপের ২০০ হাতের মধ্যে পাইখানা, পচা ড্রেণ, খানা ডোবা প্রভৃতি থাকিলে তাহার চোয়ানি জল আসিয়া পুষ্করিণী বা কূপের জলে মিশ্রিত হইতে পারে।

মল-মূত্রাদির অংশ পানীয় জলের সহিত উদরস্থ হইলে কলেরা, অতিসার, উদরাময়, রক্ত আমাশা, কৃমি এবং আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, যে পুষ্করিণীতে কলেরা রোগীর মল ও বমিত পদার্থ সংযুক্ত শয্যাদি ধৌত করা হয়, সেই পুষ্করিণীর জল পানে সেই পল্লিবাসী বহুলোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে অনেক সময় কলেরা

রোগ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। সেই জন্য কলেরা রোগীর শয্যা-বস্ত্রাদি মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত করা অথবা পুড়াইয়া ফেলা সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। পরিপাক যন্ত্রের অধিকাংশ পীড়ার বীজ মল ও বমিত পদার্থের সহিত নির্গত হয়। আবার ঐ সকল বীজের এমন স্বভাব যে উহারা কোন জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে উহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যে জলে কফ, কাস নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা কফ কাসাদি রক্ষা করিবার আধার পরিষ্কার করা হয়, সেই জল পান করিলে যক্ষ্মা প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া জন্মাইয়া থাকে। মল ও বমিত পদার্থের সহিত পরিপাক যন্ত্রের ব্যাধি-সমূহের বীজ যেমন নির্গত হয়, কফ কাসাদির সহিত সেইরূপ শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি-সমূহের বীজ নির্গত হইয়া থাকে।

কর্দ্দম ও বালি-পরিপূর্ণ ঘোলা জল পান করিলে উদরাময়, অজীর্ণ শূল প্রভৃতি রোগ জন্মে। যে "প্রাসাদ-নগর" কলিকাতা আমাদের বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান, ইতিপূর্ব্বে সেই কলিকাতাই ব্যাধি-নিকেতন ও যমালয় বলিয়া বোধ হইত। এই সহরের অবস্থা তখন এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল যে, কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে এখানকার য়ুরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিন ভাগ মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। যে এক ভাগ জীবিত থাকিত তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটি আনন্দ-ভোজের অনুষ্ঠান করিত। আমাশা ও পাকাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বর রোগে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইত। যদিও তখন কলিকাতায় বন-জঙ্গল, আর্দ্র মৃত্তিকা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর অনেক কারণ ছিল, তথাচ উত্তম পানীয় জলের অভাবও তন্মধ্যে অন্যতম। তৎকালে কলিকাতায় একটি লবণাক্ত হ্রদ ছিল; স্থানে স্থানে যে দুই চারিটি পুষ্করিণী দৃষ্ট হইত তাহাদের জলও কদর্য্য। বর্ষাসমাগমে গঙ্গার জল আবিল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিত। সুতরাং ঐ জল পান করিয়া লোকে আমাশা ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

ভাদ্র আশ্বিন মাসে আমাদের দেশে পাট ও শৈবালাদি পচা জল পান করিয়া অনেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। স্থানে স্থানে ঐ সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব এত অধিক হয় যে, সঙ্গতিপন্ন লোকেরা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সহরে পলায়ন করেন। অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিরা গ্রামে থাকিয়া শীর্ণ কঙ্কাল-সার-দেহে প্লীহা যকৃতের দুঃসহ বোঝা বহিয়া সাশ্রুলোচনে

ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকে। যদবধি আমাদের যমুনা নদী মজিতে আরম্ভ করিয়াছে, তদবধি উহার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল গ্রামে প্রবল স্রোতযুক্ত বড় নদী নাই, তথায় কেবল মাত্র পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র দুই একটি পুষ্করিণী (Reserved Tank) রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল পুষ্করিণীতে স্নান করা, বাসন মাজা, শয্যা বসনাদি ধৌত করা নিষিদ্ধ। পানীয় জলের পুষ্করিণী রৌদ্র ও আলোকময় স্থানে খনন করা উচিত। ঐ জল যাহাতে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ থাকে তৎ-পক্ষে গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্র মহোদয়গণের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া ভাল; ইহাতে জল পরিষ্কার থাকে।

বিশুদ্ধ জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদি দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ সকল নির্গত হইয়া যায়। অতি ভোজন বা অল্প ভোজন যেরূপ দূষনীয়, অতিরিক্ত জল পান করা অথবা অত্যল্প পরিমাণে জল পান করা, সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর। অতিরিক্ত জল পানে অজীর্ণ রোগ জন্মে, অপর পক্ষে স্বল্প পানেও শরীর কৃশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, ফল কথা পরিমিত পানই শ্রেষ্ঠ। রোগ ও অবস্থা বিশেষে জলপানের অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। অজীর্ণ রোগী আহারের অন্যূন অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে জলপান করিবেন। পরিশ্রান্ত অথবা নিদাঘ-তপ্ত হইয়া কিছুকাল বিশ্রামান্তর জল পান করা কর্ত্তব্য। যাহাদের পেট সর্ব্বদা গরম হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ঊষা-পান হিতকর। কাহার কাহার অতি প্রত্যূষে জল পান করিলে প্রথম প্রথম একটু সর্দ্দি হয়; কিন্তু ঊষা পান অভ্যস্ত হইলে আর কোন অসুখ থাকে না। যখন অম্লরোগীর অম্লোদ্গার ও বুকজ্বালা উপস্থিত হয়, তখন এক গ্লাস পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পান করিলে সাময়িক উপকার দর্শে।

দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার অনেক প্রকার উপায় আছে। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জল অনায়াসলভ্য নহে; সুতরাং সকলেরই ঐ সকল উপায় কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

১। জল গরম করিয়া ফট্‌কিরির দ্বারা শোধন করা:—এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। প্রথমে পনেরো মিনিট কাল জলকে উত্তমরূপে ফুটা-ইতে হইবে। পরে ঐ সুসিদ্ধ জল শীতল হইলে উহাতে অল্প ফট্‌কিরি ফেলিয়া দিবেন অথবা একখণ্ড ফট্‌কিরি লইয়া ঐ জলের মধ্যে আট দশ বার ঘুরাইবেন।

পাঁচ বা সাতঘণ্টার মধ্যে, ইহা দ্বারা জলের সমস্ত ময়লা মাটি পাত্রের তলায় জমা হইবে। তখন আস্তে আস্তে ঐ উপরের পরিষ্কার জল অপর একটি কলসীতে ঢালিয়া ব্যবহার করিবেন। জল সিদ্ধ করিলে উহাতে যে সকল রোগবীজ থাকে, তাহারা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২। জল ফিলটার করাঃ—পূর্ব্বোক্ত রূপে জল সিদ্ধ করিয়া ফিল্‌টার করিতে হয়। ধনবান লোকেরা "প্যাস্‌চুর-ফিল্‌টার" (pasteur filter) ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে কলসী-ফিল্‌টারই ভাল। তিনটি কলসীর তলদেশে এক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া একটি কাষ্ঠের বা বাঁশের ফ্রেমে পর পর বসাইবেন। মধ্যের প্রথম কলসীতে কাষ্ঠের পরিষ্কার কয়লা ও দ্বিতীয়টীতে ভাল বালি দিবেন। সর্ব্ব নিম্নে জল ধরিবার জন্য আর একটি ভাল কলসী রাখিবেন। জল সিদ্ধ করিয়া উপরের কলসীতে ঢালিয়া দিলে উহা কয়লা ও বালীর ভিতর দিয়া পরিষ্কার হইয়া নিম্নের কলসীতে জমা হইবে। কলসী-ফিলটারের জল প্রথম তিন চারি দিন নির্ম্মল হয় না; সুতরাং ঐ জল অব্যবহার্য্য। চারি পাঁচ দিন পরে জল বিশুদ্ধ ও সুপেয় হয়। মধ্যে মধ্যে কয়লা ও বালি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৩। পারম্যাঙ্গানেট্‌ অফ্‌ পটাশ (permanganate of potash) দ্বারা কূপ বা পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ করাঃ—এই দ্রব্য ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। ইহা রক্তবর্ণ দানাবিশিষ্ট পদার্থ। একটি পরিষ্কার পাত্রে এই পারম্যাঙ্গানেট অফ্‌ পটাশ কূপ বা পুষ্করিণীর জলে ঢালিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ না হয়, ততক্ষণ অল্প অল্প গুলিয়া জলে ঢালিয়া দিবেন; জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ হইলে আর দিবার আবশ্যক নাই। এইরূপে শোধন করার পর দুই তিন দিন ঐ জল ব্যবহার না করিলে ভাল হয়। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে বারো ঘণ্টা পরে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য এই উপায়ে জল শোধন করা কিছু ব্যয়সাধ্য। গ্রামে কলেরা, অতিসার প্রভৃতি রোগ আরম্ভ হইলে সকলেরই নিজ নিজ কূপ বা পুষ্করিণীর জল ব্যতীত বাড়ীতে অন্য কোন জল ব্যবহার করা উচিত নহে। অবিশুদ্ধ জলে বাসন মাজিয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখিলে অনেক সময় অলক্ষিত ভাবে রোগ-বিষ উদরস্থ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রত্যাবর্ত্তন (৪)

লাহোর হইতে আসিবার সময় বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে বলেন,—"দিল্লীতে বাবু নেহালচাঁদ আছেন, তিনি তথায় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক; তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন, তিনি খুব বাঙালীপ্রিয়।"

আমি দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রথমে তাঁহার অনুসন্ধানে স্কুলে আসিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম। সংক্ষেপে অবিনাশ বাবুর কথা ও আমার পরিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন, "সম্প্রতি এখানে এল, জি, অর্থাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন সম্বন্ধে আমার উপর অনেক কাজের ভার আছে, আমি সে জন্য বড় ব্যস্ত আছি; আপনি আমার বাসায় যান, আমি পরে যাইব।" এই বলিয়া তিনি আমার সঙ্গে একজন লোক দিলেন, সে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেল। দিল্লী হেড্ পোষ্ট আপিষের উপর পোষ্টমাষ্টার বাবু ও তিনি সপরিবারে থাকেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুও পাঞ্জাবী।

আমি বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; কিছুক্ষণ পরে বেহারা আসিয়া আমাকে বলিল, "মাজী আপ্‌কো বোলাতে হেঁ।" আমি তাহার সঙ্গে বারাণ্ডার অপর দিকে গেলাম, সেখানে কতকটা যায়গা রান্নাঘরের মত ঘেরা ছিল, নেহালচাঁদ বাবুর স্ত্রী তথায় রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন। অনতিদূরে একখানি আসন পাতা ছিল, তিনি আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া সেই আসনে বসিতে বলিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি বাঙালী স্ত্রীলোক। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি ঘরের ভিতর হইতে আপনাকে দেখিয়া চিনিয়াছি, আমি বরাহনগর শশিপদ বাবুর 'মহিলা আশ্রমে' যখন ছিলাম, সেখানে আপনার ভগিনীর সঙ্গে আমরা একত্রে থাকিতাম, আপনি তথায় মধ্যে মধ্যে যাইতেন।" আমি এই ঘটনায় অবাক্ হইয়া গেলাম! বলিলাম,—"তোমার এদেশে বিবাহ হইয়াছে?" তারপর সেই আসনে বসাইয়াই আমাকে গরম গরম রুটী পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি সুন্দর শিশু পুত্র অনুমান চারি ও দুই বৎসরের হইবে, তাহারা মায়ের কাছে কাছে এদিক ওদিক করিয়া কিছু কিছু খাইতে লাগিল, এবং হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাংলা কথাও বলিতে শুনিয়াছিলাম।

রাত্রে নেহালচাঁদ বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইল, তিনি বলিলেন, "আমি বড় ব্যস্ত আছি, আপনি এখানে ৩।৪ দিন থাকুন, আপনাকে লইয়া কিছু কাজ করা যাইবে। এখানে আর যাঁহারা আমাদের বন্ধু আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করাইয়া দিব।" আমি বলিলাম,—"আর বিলম্ব করিতে পারিব না, এক আধ দিনে ভগবান্ যাহা করান তাহাই হইবে।" দ্বিতীয় দিন প্রাতে পারিবারিক ঈশ্বরোপাসনা হইল।

পরদিন প্রাতে ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমি প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া সহসা পথিমধ্যে আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু কলিকাতা নন্দরাম সেনের গলি-নিবাসী বাবু মনীন্দ্রমোহন মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য; তিনি এখানে রেলওয়ে অডিট্ আপিষে কাজ করেন। সহসা আমাকে পাইয়া তিনি যেমন আনন্দিত হইলেন, আমিও তাঁহাকে পাইয়া তেমনি আহ্লাদিত হইলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি ভদ্র লোকের নিকট লইয়া গেলেন, এক বাড়ীতে রাত্রে আমার গান গাইবার ব্যবস্থা করিলেন, গান হইল, ৩০।৩৫ জন লোক হইয়াছিল।

আমার বন্ধু স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের পুত্র শ্রীমান্ অনুকূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে "কুতব মিনার" "জুম্মা মস্‌জিদ্" প্রভৃতি দেখাইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু ভিতরে গিয়া সমস্ত দেখিতে হইলে বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা একটু সময় সাপেক্ষ বলিয়া ঘটিয়া উঠিল না এবং তখন আমার মনের ভাব এক রকম আন্তরিকতার দিকেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয় ঐ বাহ্য-দর্শনে মন আকৃষ্ট হইল না।

বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক এখানে ছিলেন, তাঁহার বাড়ী এক বেলা আমার নিমন্ত্রণ হইল। সেখানে ব্রহ্মোপাসনা হইল।

এইরূপে তিনদিন দিল্লীতে কাটাইয়া বেশ আনন্দসম্ভোগ করা গেল। ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়া টাইম্ টেবলে দেখিলাম, এখান হইতে খুর্জা খুব নিকটে, তাহাতে মনে হইল, স্নেহাস্পদ বসন্তকুমার দত্ত তথায় ঘৃত খরিদার্থে সপরিবারে আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ বেলা সাড়ে এগারোটার ট্রেণে দিল্লী হইতে খুর্জায় আসিলাম। গমনকালে নেহালচাঁদ বাবু ট্রেণ ভাড়ার জন্য এক টাকা প্রদান করেন।

খুর্জা ষ্টেশন হইতে খুর্জা সিটী প্রায় ৩ মাইল কিন্তু এক্কা এবং ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া এক আনা ও দুই আনা মাত্র। এখানে অত্যন্ত ধূলা; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অধিকাংশ স্থানে যেমন পাথরের সঙ্গে কাঁকর মাটি, এখানে তদপেক্ষা দোআঁশ মাটী অধিক ও বেশ নরম, এজন্য অধিক ধূলা।

বসন্ত বাবু সহসা আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। প্রায় দুই দিন তথায় থাকা হইল। এখানকার ভঁয়সা ঘৃত উৎকৃষ্ট; কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে জন্মায় না। জগতে উৎকৃষ্টতা প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক জন্মায় না, নিকৃষ্টের উৎপত্তিই অধিক; এ রহস্য কে বুঝিবে?

ঘৃত খরিদ উপলক্ষে এখানে আরো কয়েকটি বাঙালী থাকেন। এখানকার ঘৃতে কোনোরূপ কিছু মিশ্রিত হয় না। ঘৃতে ভেজাল দেওয়া প্রধানত কলিকাতাতেই হয়, তবে গয়া জেলা বা গোরখপুর অঞ্চলের নিকৃষ্ট ঘৃতে ভেজাল হয় বলিয়া বোধ হয়। এখান হইতে বসন্ত বাবু যে ঘৃত খরিদ করিয়া কানেস্তায় "অন্নপূর্ণা" মার্কা দিয়া কলিকাতার হাটখোলায় স্বর্গীয় মহানন্দ দত্তের ফার্মে চালান দেন, তাহা বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট।

খুর্জা সিটী সামান্য রকমের; এখানে তুলা, ঘৃত প্রভৃতি মাল খরিদ-বিক্রয়ের জন্য বাজারটি একটু জমকালো। ক্যানেলের ধারে অনেকগুলি সাধুর আশ্রম দেখা গেল, কিন্তু কোনো বিশিষ্ট মহাত্মার সংবাদ এখানে পাইলাম না।

২০শে তারিখে আহারাদি করিয়া বেলা ১২টার পর সানন্দচিত্তে ভ্রাতা বসন্তকুমারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। বিদায়-কালীন বসন্ত বাবুর নিকট ট্রেণ ভাড়া দুই টাকা প্রাপ্ত হইলাম।

একেবারে বৃন্দাবনে আসা আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনেক দিন হইতে হাতরস জংসনে বাবু অটলবিহারী নন্দীর নাম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সাধনানুরাগ, তাঁহার সাধুভক্তির কথা তিনি নিজে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও ধর্ম্মানুরাগী যে কোনো ব্যক্তি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখনো ভুলিতে পারেন না। বৃন্দাবন যাতায়াতের সন্ধিস্থল এই হাতরস জংসন ষ্টেশনে যেন তিনি ভক্তবৃন্দের পথ আগ্‌লাইয়া আছেন। দুঃখের বিষয়, আমি এখানে আসিয়া এক বেলাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিলাম না, কেবল একবার দেখা করিয়াই করস্‌পণ্ডিংট্রেণে বৃন্দাবন রওনা হইলাম।

(ক্রমশ)

প্রভাতে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই
হের দেখ ওগো চাহিয়া !
সমীর এনেছে কার সংবাদ
সুপ্তি-সাগর বাহিয়া !
রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও আঁখি মেলে চাও,
কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,
চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী
উড়িছে পড়িছে গাহিয়া
স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ
প্রেম-নীরে অবগাহিয়া।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৫)

মানব সামাজিক জীব। মানব কোন কালে সমাজবদ্ধ না থাকিয়া একাকী বাস করিত এরূপ বোধ হয় না। "কুশদ্বীপ" এই নামকরণ হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে যদিও সামাজিক প্রথা ছিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত আদিম অবস্থার ন্যায়। তৎপরে যখন ভাল মন্দের নির্ব্বাচন হইয়া মাঝামাঝি একটা গড়িয়া উঠিল, তখন "কুশদ্বীপ" সমাজ হইল। * এই সময় হইতে সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কালকে কুশদ্বীপের প্রথমাবস্থা বলা যাইতে পারে।

কুশদ্বীপের প্রথমাবস্থার প্রথমভাগে এই স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্য দৃষ্টি-গোচর হয়। বর্ত্তমান হাড়ী, মুচী প্রভৃতি জাতিরা সেই সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা প্রাচীন সময়ের বুদ্ধ মূর্ত্তিকে মহাদেবের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। (শঙ্করাচার্য্যের জীবনী)

এই সময়ে "কুশদহ"তে দৈহিক বলের আদর অত্যন্ত ছিল। তৎপরে সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, তখন দৈহিক বল অপেক্ষা মানসিক বলের আদর বেশী হইতে লাগিল। মানসিক বল চিরকালই দৈহিক বলকে

---

* Galton's "Law of Regression' towards Mediocrity.

পরাজিত করে। সেই জন্য প্রতাপাদিত্য দৈহিক বলে বলীয়ান হইয়াও নিঃস্ব, মানসিক বলে বলিয়ান সিদ্ধান্তবাগীশের পদানত হইয়াছিলেন। এই সময়কে "কুশদহ"র দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় "কুশদহতে" ধীরে ধীরে বিদ্যার জ্যোতিঃ "কুশদহর" তৃতীয়াবস্থায় পূর্ণমাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয়াবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

তৎপরে 'কুশদহ'র শেষ বা অন্তিম অবস্থা। কুশদ্বীপ-মধ্য-প্রবাহিতা যমুনা নদীর পতনের সহিত "কুশদহ''রও পতন দেখা যাইতেছে। এই স্থানে যমুনা নদীর একটু বিবরণ লিখিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ডি, ব্যারস্ বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সরস্বতী ও যমুনা এই দুইটি ভাগীরথীর বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমান। ভ্যাণ্ডেন ব্রুকের ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, তখন যমুনা একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যমুনা নদী যত দিন প্রবল ছিল "কুশদহ"র অবস্থা তত দিন ভালো ছিল। এক্ষণে এই যমুনা নদী গোস্পদে পরিণত হইয়াছে। 'কুশদহর' ভাবী উন্নতি এই যমুনা নদীর পঙ্কোদ্ধারের উপর নির্ভর করিতেছে। গৈপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পঙ্কোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু "কুশদহ'-বাসীর সমবেত চেষ্টা ব্যতীত ইহার পঙ্কোদ্ধার সুদুরপরাহত।

এক্ষণে ম্যালেরিয়ায় এই "কুশদহ"কে কঙ্কালসার করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি হইতেছে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে দেশবাসীকে উদ্ধার করিতে কবিরাজগণ অক্ষম হওয়ায় দেশের লোক চিকিৎসা-অভাবে মারা যাইতে লাগিল। এই সময়ে এখানে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয়। যেন দেশকে রক্ষা করিবার জন্য গোবরডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত L. M. S. উপাধিতে ভূষিত হইয়া "কুশদহ'র চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন "কুশদহ''র বর্ত্তমান চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেশব বাবু অগ্রণী।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

প্রেরিত পত্র

"কুশদহ" সংক্রান্ত, সম্পাদকের নামীয়, একখানি পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, পত্রখানি দীর্ঘ হওয়ায় সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হইল। (কুঃ সঃ)

প্রিয় যোগীন বাবু!

সে দিন বৈকালে কলিকাতার * * * পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আপনার সম্পাদিত "কুশদহ" কেমন চলিতেছে জিজ্ঞাসা করায় আপনি উত্তর করিলেন—"দেশের কাগজ, আপনাদের যত্ন নাই।" সত্যকথা বলিয়াছেন। দেশের প্রতি (আমাদের) যত্ন আদৌ নাই * * * *।

দেশের মধ্যে আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহোদয় নিজ অর্থব্যয়ে ও শারীরিক, মানসিক যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে "কুশদহ" সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশ করিয়া দেশের অভাব মোচনার্থেই স্থানীয় সংবাদ প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, আমার বেশ মনে হইতেছে, অবশ্য আমি নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও, 'কুশদহ'র পুষ্টি সাধনে কাটবিড়ালের সাহায্যবৎ যে কিছু না করিয়াছি, এমন তো মনে হয় না। তখন মনে হইত—"কুশদহ" পত্রিকাখানিকে বোধ হয় কালে বাংলার (একখানি) প্রধান সংবাদ পত্ররূপে উন্নীত করিতে পারা যাইবে। এখনকার মত তখন এত বড় বড় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু কালের কুটিল ভ্রূভঙ্গে 'কুশদহ' অকালে লীলাসম্বরণ করিল। এখন আবার দেখিতেছি, আপনি সেই মরা 'কুশদহ'কে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ধন্য আপনার যোগবল—ধন্য আপনার সাহস। যে কার্য্যে পূজ্য ক্ষেত্রমোহন বাবু টাকা ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তিনি ঘরের পয়সা দিয়া কাগজ ছাপাইয়া গ্রাহকদিগকে দিলেও, গ্রাহক এক সহস্রও হয় নাই। * * * * দেশের কয় জন লোকে বুঝিতে শিখিয়াছেন যে, স্থানীয় খবরের কাগজ একখানি থাকিলে দেশের হিতসাধন হইতে পারে। পরন্তু অতীত স্মৃতির ছবিগুলি একে একে সংগৃহীত করিয়া 'কুশদহ'র অঙ্গে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিলে ভাবী-সন্তানদিগের যে কীদৃশ্য উপকার হইবে, তাহা গবেষণা-গরিষ্ট মস্তিষ্কের বিচার্য্য বিষয়, সাধারণে কি বুঝিবে? * * * * *।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতী (ভাদ্র, ১৩১৮)—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত। ৪৪নং ওল্ড্ বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০।

মুখপত্রে একখানি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি তিনবর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "নব ভারতে নব সামাজিকতা" সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ। তিনি লিখিয়াছেন,—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়া অনেক নূতন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, নব ভারতের সামাজিক জীবন কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা কি পুরাতন ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অদৃষ্টবাদ, পারত্রিকতা, শাসন-ক্ষমতা, অধীনতা, জাতিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব? না, প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্বাবলম্বন, ঐহিকতা ও সাম্য অবলম্বন করিব?—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, নব ভারতে নব সামাজিকতার প্রয়োজন, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিলিত করিবে, যাহা ঐহিকতার সহিত পারত্রিকতাকে, স্বাধীনতার সহিত সাধুভক্তিকে মিলিত করিবে তাহারই আবশ্যক; এবং তাহা তখনই সম্ভব যখন সামাজিক জীবনে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নানা তথ্যপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষের "রাজা" গল্পটি অতি সুন্দর—অতি মনোরম হইয়াছে। "আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ" শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের সুচিন্তিত সদ্ভাবপূর্ণ সারবান প্রবন্ধ; ইহার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রতিমা" গল্পটি বড় সরস ও কবিত্বপূর্ণ; বর্ণনাভঙ্গীতে প্রাণের সহানুভূতি স্বতই জাগিয়া উঠে। 'চিরমৌন' শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাটি চমৎকার হইয়াছে। 'চয়নে'র মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত "ঠগী-কাহিনীর একটি চিত্র" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক সরস ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। এই লেখকের ভাষার মধ্যে চমৎকার একটি নিজস্ব স্বচ্ছ প্রবাহ আছে যাহাতে বক্তব্য সর্ব্বত্রই অনন্যসাধারণ কবিত্বরসে ভরপুর এবং সুপরিস্ফুট ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র

মোহন মুখোপাধ্যায়ের "মাতৃঋণ" চলিতেছে। "পৃথিবীর বয়স" উল্লেখযোগ্য রচনা। "রাজকন্যা" নাট্যোপন্যাস, সম্পাদিকার নিজের লেখা এখনো শেষ হয় নাই; ইহার শেষাংশ পড়িবার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক রহিলাম। "উদীয়মান কবি" প্রবন্ধে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সমালোচনা করিয়াছেন, এই সঙ্গে কবির একখানি হাফটোন্ ছবিও ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশেষ সাবধানতার সহিত নিরপেক্ষভাবে লিখিত। সত্যেন্দ্র বাবুর সুমধুর কবিত্ব-ঝঙ্কারে বঙ্গভাষা আজ মুখরিত একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার অমূল্য কাব্যগুলির বিস্তৃত সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবিও এই সংখ্যায় আছে। বাংলা মাসিক পত্র সমূহের মধ্যে ভারতী যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্থানীয় সংবাদ

সম্প্রতি গোবরডাঙ্গার জমীদার এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত দেশের স্বাস্থ্য এবং সাধারণ নীতি ও অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দেশের বিবিধ অভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া, এ সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টাই যে প্রধান কার্য্যকরী, এ কথা আমরা তাঁহাকে বলায়, তিনি তাহা অস্বীকার করেন নাই, বরং অনেক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলেন, দেশের সাধারণ জ্ঞান এবং সংস্কার এত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে যে, এখানে কোন হিতকর কার্য্য করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে পানীয় জলের জন্য ঘটক পাড়ায় যে একটি ইদারা কাটান হইয়াছিল, তাহা কেবল দেশের লোকের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গেল।"

আমরা তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আরো একটি বিশেষ কথার আভাষ পাইয়াছি। তিনি এখনো দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী হইতে গোবরডাঙ্গা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী (Reserved Tank) কাটাইবার ইচ্ছুক আছেন। দেশের এখনো যাঁহারা প্রধান লোক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা যদি সচেষ্ট হন, তবে বোধ হয় ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া

অসম্ভব নয়। সাধারণে মনে করিতে পারেন যে, একগ্রামে একটি পুষ্করিণী হইলে তাহাতে কয় জনেরই বা সুবিধা হইবে? কিন্তু আমরা বলি, এই হিতকর কার্য্য একটি হইলে ক্রমে গ্রামান্তরে আরো হইতে পারে। দেশে সাধারণের অবস্থা ভাল নহে বটে কিন্তু মনে করিলে দেশের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যক্তি বিশেষে এক একটি পুষ্করিণী দান করিতে পারেন।

রাস্তা সম্বন্ধে যে কথা হইয়াছিল, তাহাতে আমরা বলি, "মিউনিসিপ্যালিটীর দুই একটি সদর রাস্তা ছাড়া অধিকাংশ রাস্তা ঘাটের অবস্থা সকল সময় ভাল থাকে না, বিশেষত বর্ষা কালে কোনো কোনো রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হয়। এজন্য গ্রামবাসী করদাতাগণের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শোনা যায়। এ কথার উত্তরে তিনি বলেন, "গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ১৪ মাইল রাস্তা আছে, তাহার জন্য ১১০০, এগার শত টাকা থাকে সুতরাং সমস্ত রাস্তা ভালরূপে মেরামৎ হইতে পারে না।"

হয়দাদপুর, ডাক্তার বরদাকান্ত ঘোষের বাড়ী যাইবার পাকা রাস্তা এবং কাছারী বাড়ীর সম্মুখ হইতে সরকার পাড়ার রাস্তার মধ্যে একস্থানে অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। এই ২টি রাস্তা এবং গৈপুর গ্রামের মধ্যের কোনো কোনো রাস্তার প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক।

গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমীদার বাবু অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত হয়দাদপুরের জমীদার বসু মল্লিকদিগের প্রায় বৎসরাবধি ব্যাপিয়া ডুমোর বাঁমোড় লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ ও মোকর্দ্দমা চলিতেছে, পর্য্যায়ক্রমে উভয়পক্ষেরই জয় পরাজয় হইতেছে, ইহাতে উভয়পক্ষেরই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইতেছে। দেশের মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছে যে, জন সাধারণে মামলা মোকর্দ্দমা না করিয়া যাহাতে শালিসী নিষ্পত্তি হয় তাহার চেষ্টা করা হউক। দেশের যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি, যাঁহারা ঐ সকল কাজে অগ্রণী হইবেন, তাঁহারা যদি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখান, তবে আর সাধারণে কি করিবে?

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press
35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from
28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



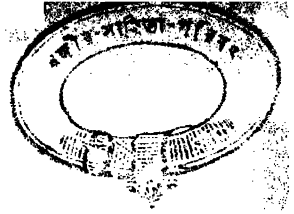
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ৮ম সংখ্যা

প্রার্থনা

প্রভু, অসার ভাবনা অসার কল্পনা
মন হ'তে মুছে দাও হে ;
আজি অহমিকারূপে ঘিরেছে যা' মোরে
সে গুলোও কেড়ে নাও হে।
তুমি দাও হে আমারে শকতি নব
পর-হিত-ব্রত সাধিতে ;—
মম দাও হৃদে প্রেম, অনাবিল প্রীতি,
জীবগণে ভালোবাসিতে।
শুধু ভকতি দাও হে করুণা নিলয়,
ভক্ত সাধুকে পূজিতে,—
আর নিখিলের মাঝে পারি যেন নাথ,
তোমারি নিদেশ পালিতে।
আমি চাহিনাক প্রভু অন্য কিছুই
এই গুলি তুমি দিয়ো হে,
যদি কুপথে কথনো যাই পরমেশ,
সুপথে টানিয়া নিয়ো হে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সরমা

(সামাজিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বৌমা—বৌমা—ও বৌমা!"

"কেন মা!"

"হরিপদ আজ নাকি একটা চাকরির চেষ্টায় যাবে, তুমি একটু সকাল সকাল কাপড় খানা কেচে দুটো ভাত চড়িয়ে দাও। তাকে নাকি ন'টার মধ্যেই বেরুতে হবে।"

"তা যাচ্চি মা" বলিয়া কমলা তাহার পরিচিত দেবতাগুলিকে উদ্দেশে এক এক বার প্রণাম করিল ও অস্ফুটস্বরে বলিল,—"হে মা কালী, হে মা দুর্গা, যেন এবার তাঁর চাকরিটুকু হয়। আমার পাঁচ সিকা পূজো মানসিক রইল।"

কলিকাতা সহরতলীর কোনো এক ভদ্রপল্লীতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটী। তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও তাঁহার পল্লীতে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম। তিনি একটি সরকারী (Government) আপিসে চাকরি করিতেন। এখন সামান্য পেন্‌সনের উপর তাঁহার সংসারটি নির্ভর করিতেছে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁহার গৃহিণী, পুত্র হরিপদ, পুত্রবধূ কমলা, অবিবাহিতা কন্যা মেনকা ও তাহার আদরের বিড়াল ছেনু। আর একটি আছেন কৈলিসী—তবে কৈলিসী সম্পূর্ণ পরিবারভুক্ত নহেন। ইনি সকালে বাটীতে পদার্পণ করেন ও কাজ কর্ম্ম সারিয়া আহারাদির পর, পান চিবাইতে চিবাইতে স্ব-স্থানে যাইয়া নিদ্রা দেন (এখানে নাকি নিদ্রার ব্যাঘাত হয়) ও চারিটার সময় আসিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। রাত্রি নয়টার পর এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। অতি আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য অনুনয় বিনয় করিলেও রাত্রে এ বাটীতে থাকিতে পারেননা কারণ তাঁহার বাসায় নাকি তাঁহার কোনো আপনার লোক থাকে।

এইগুলি লইয়াই রাজকৃষ্ণ বাবুর সংসার। উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্র হারাইয়া শোকে তাপে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। হরিপদ ও মেনকা তাঁহাকে কতকটা শান্তি প্রদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের আর উন্নতি হইল না। ইদানীং তিনি নানাবিধ রোগে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

মানসিক কষ্টই তাঁহার রোগের প্রধান কারণ। প্রথমত তিনি যে পেন্‌সন পান তাহা দ্বারা কোনো রকমেই এই কয়েকটি জীবের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় না। কাজেই সঞ্চিত ধন ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত মেনকার বিবাহের অর্থ কোথা হইতে আসিবে। এই সমস্ত চিন্তাতেই তাঁহার রোগ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হরিপদ গত বৎসর এল্‌-এ পাশ করিয়াছে। বি-এল্‌ পাশ করিয়া উকিল হইবার তাহার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থের অভাব বশত ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এবং শীঘ্র একটি চাকরির জোগাড় করিতে না পারিলে সমূহ বিপদ বুঝিয়া, চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে লাগিল। হরিপদ দরখাস্ত হস্তে এ আপিস্‌ সে আপিস্‌ যেখানে যায়—কর্ম্ম খালি নাই শুনিয়া বিষন্নমনে ফিরিয়া আসে। তবে হরিপদকে কখনো কখনো আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে যে, যদি সে কোনো আপিসের বড় বাবুর শ্যালক হইত, তাহা হইলে চাকরির বিশেষ ভাবনা থাকিত না।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় হরিপদ ফিরিয়া আসিল।

আগ্রহসহকারে হরিপদর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজকের খবর কি বাবা!"

"মা তোমার আশীর্ব্বাদে আজ একটু সুবিধা হয়েচে বলে বোধ হয়। একটা ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি খালি ছিল, আমরা দশ জন তার জন্যে দরখাস্ত করে-ছিলুম। বড় সাহেব নিজে আমাদের সকলকে এক্‌জামিন কর্‌লেন। আমি এক্‌জামিনে সকলের ওপরে হলুম। বড় সাহেব সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকেই সেই চাকরিতে বাহাল করেচেন।"

"বুঝি এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চাইলেন। বৌমা কাল স'পাঁচ আনার চিনি-সন্দেশ কিনে মা কালীর পূজো দিতে হবে, মনে থাকে যেন।" কমলা মনে মনে বলিল, মা তুমি স'পাঁচ আনার পূজো মেনেছিলে আমি যে পাঁচ-সিকে মেনেচি—হাতে কিন্তু একটিও পয়সা নেই। যাই হোক্ কানের মাকৃড়ি ক'টা তো আছে!

হরিপদ বলিল,—"মা পূজো দেওয়াটা এখন থাক্‌না—এক মাস কাজ করি, মাইনেটা পাই—তার পর পূজো দেওয়া যাবে।"

"বাপরে—দেবতার পূজো সেকি হয়? দেবতাদের রাগ কিসে হয় কিসে যায়, তা' কে বল্‌তে পারে?"

পীড়িত রাজকৃষ্ণ বাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, —"সেটা কোন আপিস হরিপদ ?"

"বাবা সেটা টেলিগ্রাফ আপিস।"

"তা বেশ—সরকারি আপিস, পেন্‌সন আছে।"

"আপনি আজ কেমন আছেন ?"

"আমার আর থাকা না থাকা---এখন তোমাদের রেখে যেতে পারলেই সুখী হই।"

হরিপদ তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তাই তো মা, এত ভাল ভাল ওষুধ দেওয়া হচ্চে, ঐ খুক্‌খুকে কাসি আর জ্বর টুকু কিছুতেই যাচ্চে না—কাল প্রফুল্ল এলে তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে' এক জন ভাল কবিরাজ আন্‌বার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

"সেই ভাল, এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দাওগে। সমস্ত দিনটা গায়ের ওপর দিয়ে গেছে।" কৈলিসি বলিল,—"মা, দাদা বাবুর চাকরি হয়েচে, মাইনে পেলে আমাকে মিটুই খেতে দিতি হবে।" মেনকা বলিল, "মা, দাদা মাইনে পেলে আমার ছেন্নুর জন্যে ঘুঙুর কিনে দিতে বোলো।"

"আচ্ছা তা হবে।"

রাত্রি নয়টা বাজে,হরিপদ আপনার প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক খানি খবরের কাগজ পড়িতেছে—পড়িতেছে কি কাগজের আকার দেখিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। কাগজ খানি রাখিয়া বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" বাহির করিল। দুই এক খানি পাতা উল্টাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এক বার একটা দেরাজের টানা টানিয়া কি দেখিল—এক বার বাক্স খুলিল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। কি যেন হারাইয়াছে তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কি হারাইয়াছে, তাহা যেন সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একটু এ দিক ও দিক করিয়া অলস-ভাবে পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল, হরিপদ উৎসুকনেত্রে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কমলা ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিপদ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

কমলা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল, মেঘান্তরিত চন্দ্র যেন গগন-পটে হাসিয়া উঠিল! কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি ভাব্‌চ এখনো যে ঘুমোও নাই!"

"তবু ভাল—মনে পড়েচে।"

"কি কোর্‌বো বল, মা স্বভাবতই একটু বেশি রাত্রে খান—মার খাওয়া হ'লে তবে কৈলিসী ভাত নিয়ে যায়, তারপর আমি রান্নাঘর পরিষ্কার করে, হেন্সেল তুলেই তো আর এখানে আস্‌তে পারি নে ; মা যতক্ষণ না শোন ততক্ষণ আমাকে বসে' থাক্‌তে হয়" কমলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিপদ বলিল,—"বাঃ তোমার তো বেশ বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা আছে দেখ্‌চি। আজ বলে' নয়, মাঝে মাঝে আমি তোমার এ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে থাকি। আচ্ছা একটা কাজ......"

কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া পতির মুখে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বাম হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "এর গুরু কে ?"

হরিপদ এতক্ষণ যাহা শত চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পায় নাই, এখন যেন তাহা কোথা হইতে আপনি হাতে আসিয়া পড়িল।

হরিপদ কমলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল—কমলা ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা সুখী আর কে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাত সাতটার সময় মেনকা আসিয়া বলিল,—"মা ফুল বাবু এসেছেন।"

"যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসোগে—তোমার দাদা কোথায় ?"

"দাদা বুঝি এখন বাগানে লড়াই করচে" বলিয়া মেনকা আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।

প্রফুল্ল মেনকার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মা, কাজের ঝঞ্ঝাটে ক'দিন আস্‌তে পারিনি—বাড়ির সব খবর ভাল তো ?"

"কাল থেকে নাকি হরিপদর একটা চাকরি হয়েচে। আর কত্তার যা'হয় একটা বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। ডাক্তারি ওষুধে তাঁর কোনো সুবিধা হচ্চে না। তা বাবা একটু বসো হরিপদ এল বলে'। তোমার ছেলে পুলে সব ভাল—বৌমা ভাল আছেন তো ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল" বলিয়া প্রফুল্ল এক খানি চেয়ার লইয়া কর্ত্তার নিকটে বসিল।

মেনকা প্রফুল্লকে ফুল বাবু বলিয়া ডাকিত ; তাহার কারণ এই যে, প্রফুল্লকে দেখিতে ঠিক সাহেবের মত। সাহেবী পোষাক পরিলে তাহাকে ইংরাজ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রফুল্ল একে তো সুপুরুষ তাহাতে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত—

তাহার সোনার চশমা, পম্প সু, আইভরি ষ্টীক্, শান্তিপুরের মিহী ধুতি—সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর সিল্কের চাদর—এই সব দেখিয়া মেনকা তাহাকে ফুল বাবু ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত পদ খুঁজিয়া পায় নাই।

প্রফুল্লের বাটী হইতে হরিপদর বাটী একটু তফাত। প্রফুল্লের পিতা কমলার কৃপায় 'ডারবি সুইপে'র একটা প্রাইজ পাইয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছেন। ইহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ অমূল্য ও কনিষ্ঠ প্রফুল্ল। অমূল্যের সন্তানাদি হয় নাই। প্রফুল্লের দুইটি পুত্র। প্রফুল্লের সহিত হরিপদর বাল্য প্রণয়, তাহাতে আবার সহাধ্যায়ী এক সঙ্গে উভয়েই এল্-এ পাশ করিয়াছে। হরিপদ অর্থাভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রফুল্ল এবার বি-এ, পাশ করিয়া কলিকাতার কোনো একটি কলেজে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—সে ইংরাজি ও গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। প্রফুল্লের ইচ্ছা—সে এবার বি এল্ পরীক্ষা দিয়া উকিল হয়।

হরিপদ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ। তাহার শরীরের গঠন দেখিলে তাহাকে একটি ছোট খাটো 'রামমূর্ত্তি' বলিয়া বোধ হয়।

হরিপদর বাটীর খিড়কিতে একটি বাঁধা ঘাটযুক্ত পুষ্করিণী আছে ও তাহার চতুস্পার্শ্বে বাগান। এই বাগানে তাহার একটি ব্যায়ামের আখ্ড়া আছে। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে পাড়ার ছেলেরা এই বাগানে ব্যায়াম শিক্ষা করে। হরিপদ উহাদের নেতা। লাঠি খেলা কুস্তি ও অন্যান্য ব্যায়াম-কার্য্যে হরিপদ সিদ্ধহস্ত। হরিপদর শারীরিক বলও কম নয়, সে একটা তিন মণ লোহার গোলা দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। এক দিকে যেমন সে মহাবলে বলীয়ান, অপর দিকে তেমনি সে নম্র বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। অনেক বার সে তাহার বলের পরিচয় দিয়াছে। এক বার প্রফুল্ল ও হরিপদ নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল, হটাৎ একটা বড় ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা এক পেশে হইয়া জল উঠিতে লাগিল। মাঝি মাল্লা সকলে লাফাইয়া পড়িল। প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি যে সাঁতার জানিনা, ভাই।"

হরিপদ বলিল,—"আমি বেঁচে থাক্‌তে তুমি কি ভাই ডুবে মরবে?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিপদ প্রফুল্লকে আপনার পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল,—"তুমি আমার পিঠের উপর শুয়ে দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে থাক। আমার হাত আর পা খালি থাক্‌লেই হ'ল।" নৌকাও ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও বন্ধুকে পৃষ্ঠে লইয়া অবলীলাক্রমে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদ বাগান হইতে আসিয়া দেখিল যে প্রফুল্ল তাহার পিতার নিকট বসিয় রহিয়াছে। প্রফুল্ল হরিপদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কিহে তোমার পালোয়ানী করা শেষ হ'ল।"

হরিপদ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"একটু না করলে শরীরটা থাকে কি করে?"

"তোমার চাকরি হয়েচে শুনে সুখী হলুম।"

"বাবাকে কেমন দেখলে? আমার ইচ্ছা—কবিরাজ দেখাই।"

"আমারো সেই মত। ডাক্তারি মতে ঘুশ্ ঘুশে জ্বরের বিশেষ সুবিধা হয় না।"

"আমার ইচ্ছা—দ্বারিক কবিরাজকে আনি।"

"তা মন্দ নয়।"

এই বার ক্ষীণকণ্ঠে রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"তাঁর ভিজিট্ কত?"

হরিপদ বলিল,—"বোধ হয় ষোলো টাকা।"

রাজকৃষ্ণ বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"ষোলো টাকা! টাকা গুলো কি খোলাম্ কুচি? না তোমাদের কবিরাজ আনতে হবে না।"

"তবে না হয় এখন এক জন ছোট কবিরাজ এনে দেখাই, তারপর যা' বিবেচনা হয় করা যাবে" এই বলিয়া হরিপদ প্রফুল্লকে উঠিতে সঙ্কেত করিল—প্রফুল্ল প্রণাম করিয়া হরিপদর সহিত বাহিরে আসিল।

হরিপদ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"দেখলে ভাই, দ্বারিক কবিরাজকে যে আনবো, টাকা দেবে কে!"

"তুমি যা'ই বল ভাই, রোগটি আমার সহজ বলে' বোধ হচ্চে না।"

"তাই তো কি করা উচিত?"

"তুমি দ্বারিক কবিরাজকেই নিয়ে এসো—ভিজিট্ আমি দেব।"

"তবে আমি আপিস থেকে আসবার সময় তাঁকে বলে' আসবো যেন তিনি কাল্ ৭ টার সময় এখানে আসেন—আর তুমিও ঐ সময় এখানে এসো।"

"সেই ভাল এখন আসি" বলিয়া প্রফুল্ল গমনোদ্যত হইল।

হরিপদ তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিল,—"ভাই টাকাটার কথা কিছুই বল্লেনা—কবে দিতে হ'বে?"

"সেকি তুমি আমায় পর ভাবো, আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? আমার ছেলে দুটো যদি খেতে না পায়, তুমি কি তা'দের দেখবে না? এখন ভগবানের কৃপায় যা'হোক দশ টাকা উপায় করচি, এখন কি আমি তোমার

কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুতে পারি না? ছি ভাই, আর ও কথা আমায় বোলো না প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।"

"বেলা হ'ল ভাই এখন আসি" বলিয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল। হরিপদ নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। পুলকে প্রাণটা ভরিয়া উঠিল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ-সঙ্গীত

যুদ্ধের সময়কার বাদ্যধ্বনি যোদ্ধাগণকে উৎসাহিত করিয়া দেয়। সেই বাদ্যধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রে যে নবীন শক্তির সঞ্চার করিয়া তুলে, তাহা তরবারীর ক্ষমতা অপেক্ষাও ভীষণ! সেই প্রাণ-মাতানো বাজনা যোদ্ধাগণকে জয়ের অভিমুখে নিঃসন্দেহ অগ্রসর করিয়া দেয়। তাহারা অনেকে আহত হয়, অনেকে নিহত হয়; কিন্তু সে কেবল চরম লক্ষ্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া। আমাদের জীবনেও জয়ের আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে! সংসারে, সমাজে এবং আমাদের নিজের কাছে আমরা যে প্রত্যেকে জয়ী, তাহা সত্য করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তথাচ, আমাদের এই আশার সঙ্গীত,—আমাদের, এই জয়-গান যেন পৃথিবীর সমগ্র কষ্টের উপর, ক্ষোভের উপর, দারিদ্র্যের উপর, সংসারের প্রবল প্রতিকূলতার উপর অনাহত শব্দে ধ্বনিত হইতে থাকে। আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁহার পক্ষের বিজয়-গাথা গীত করি। এই জগতে আজ পর্য্যন্ত কত মনীষি সেই মহান্ পুরুষের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত অত্যন্ত সহজেই তাঁহাতে নিজেদের নিঃশেষে সমর্পন করিয়া দিয়াছেন। গ্রহণ করিয়াছেন,—দুঃখের কণ্টকময় শিরোভূষণ, দান করিয়াছেন—আপনাদের সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনা সাধারণের মঙ্গল-উদ্দেশে। পৃথিবীর সংগ্রামে তাঁহারা নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন আর নিঃশেষ হইতেছে না, মানব-সমাজে আদর্শ স্থানে তাহা চিরবিরাজিত, সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিদ্বারা তাহা চির-প্রণম্য।

কে আমাদিগকে জীবনের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করাইবে? সংগ্রামের সেই মহাবাদ্য ধ্বনিত করিয়া তুলিবে কোন জন? কে

ডাকিয়া কহিবে—পৃথিবীতে কেবল দুঃখ নাই—আছে আশা, আছে আনন্দ, আছে কল্যাণ ? কে সেই আনন্দময়ের আনন্দ-সঙ্গীতে মত্ত করিয়া দিবে ? কে সে জন, যে জন বিধাতার পাতাকাকে সহস্র দুঃখের ভিতর দিয়াও অবিচলিতচিত্তে বহন করিয়া আনন্দে উত্তীর্ণ হইবে ? কে প্রত্যেকের আত্মশক্তির উপর গভীর বিশ্বাসী, একান্ত শ্রদ্ধাবান হইতে শিক্ষা দান করিবে ? কে আমাদের আশ্বাস দিয়া কহিবে,—"হে বিধাতার সৈনিক, তোমাদের প্রত্যেকের ললাটে তাঁহার শুভস্পর্শ রহিয়াছে,—নির্ভয়চিত্তে বাহির হও জয়ী হইবে। ভীত হইয়ো না। দৃঢ়মুষ্টিতে আপনার অস্ত্র ধারণ করিয়া ছুটিয়া যাও, পাপ থাকিবে কোথায় ? হে মানব ! তুমি যে বীর—বীরের পুত্র !"

চারিদিক্ হইতে যে, সকল দ্রব্যই আমাদিগকে বন্দী করিতে চায়। কিন্তু আমাদের এই বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া বীরের ন্যায় চলিতে হইবে। মরুভূমির উপর শঙ্কিত না হইয়া আমাদের মরু-বালুকা-নিম্নস্থ নির্ম্মল জলধারাটি আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু হায়, শক্তি কোথায় ?—লাভ করিতে হইবে সাধনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা। দিনের পর দিনে যে উত্তাপ এবং বোঝা বাড়িয়া চলিল। একবার পূর্ণ জয়ীর বিজয়গাথা গীত করিয়া জয়ের টিকা ললাটে ধারণ করিয়া এখন আমাদের যে নির্ভয় হইতে হইবে। ভাসিয়া যাক্ তোমার সমস্ত—আজ আনন্দের পূর্ণ স্রোতে। ধরণীর সমস্ত শব্দের উপর তোমার জয়গান ধ্বনিত হইতে থাক্। তোমার চতুর্দ্দিকে ঘন অন্ধকার,—কিন্তু হে সাধক ! হে বীর ! তুমি সেই সত্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে সমস্ত বিভীষিকা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ভয় করিয়ো না। তুমি যে মানুষ হইয়া কী প্রকাণ্ড অধিকার লাভ করিয়াছ, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি বীর, তুমি বিধাতার সৈনিক, পারিবে না আনন্দিত হইতে ? লাভ করিবে না অমোঘ পদার্থ ? ধরাতলে ব্যর্থ হইবে ?

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

একটা আবশ্যক কথা

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের পত্তন হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় এই গ্রাম বর্ত্তমান ছিল,—ইহার প্রমাণ এখনো বিদ্যমান। গ্রামের উত্তর-

পূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত প্রতাপপুরের মাঠ। চাষী লোকের বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইছাপুরনিবাসী স্বনামধন্য রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ধূমঘাট যশোরের অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই বিস্তীর্ণ মাঠে সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই মাঠ সেই প্রতাপের নামে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে। মাঠের উত্তর-পূর্ব্বে কঙ্কণা হ্রদ। জনপ্রবাদ, বিষ্ণুচক্রছিন্ন সতীর হস্তের কঙ্কণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার নাম কঙ্কণা হইয়াছে। কিন্তু এই জনশ্রুতির মূল কোথায়, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।*

এই গ্রামে ভট্টাচার্য্য পাড়ার দক্ষিণে 'ধোপার বিতেরে' এখন ধর্ম্মপূজা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-প্রভাবের ক্ষীণ নিদর্শন, ইহা ইদানীন্তন ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বৌদ্ধদিগের নিদর্শন সেই শ্বেতছত্র এখনো ধর্ম্মসন্ন্যাসের দিন ঐ মেলায় ক্ষুদ্র সোলার ছাতারূপে বিক্রয় হইয়া থাকে। লোকে উহা ঐ পূজার উপহারস্বরূপ ধর্ম্মঠাকুরকে প্রদান করে। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মঠাকুরের গৃহ প্রস্তুতে ও মৃন্ময় স্তূপগঠনে বৌদ্ধ ঢং বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের দ্বারা এই ঠাকুরের পূজা হয় না। ইহা যে বৌদ্ধ উৎসব তাহা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে "কুশদহ"তে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। সেই অতীতের স্মৃতি অতীতরে অন্ধকারেই আত্মগোপন করিয়াছে।

গোবরডাঙ্গার অতীত ইতিহাস যাহাই হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আলোচনা করিব না। এই গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থাই আমার আলোচ্য বিষয়। ইদানীং শ্রমশিল্পেই গোবরডাঙ্গা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। চিনির কারখানার জন্যই এই গ্রাম বিখ্যাত, পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা ও ইহার সন্নিহিত জনপদে প্রায় নব্বুইটি চিনির:কারখানা ছিল। এক একটি কারখানায় গড়ে প্রায় সাত আট হাজার টাকার চিনি প্রস্তুত হইত। নিতান্ত ছোট কারখানাতেও আনুমানিক দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার চিনি জন্মিত। ইহা ভিন্ন তাহাতে বিস্তর টাকার চিটা গুড় ও খাঁড় গুড় প্রস্তুত হইত। এখন সে সমস্ত প্রায়

* প্রবাদ আছে কঙ্কণের ন্যায়, আকার বলিয়াই, ইহার নাম কঙ্কণা। (কুঃ সঃ)

লোপ পাইয়াছে। এখন প্রতি বৎসর দুইটি কারখানা 'উঠে' কিনা সন্দেহ। এখন কারখানার ভাঙা বাড়ি ও রাস্তা ঘাটে 'খাপরা'র ছড়াছড়ি সেই অতীত শিল্পের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

এই শিল্প লোপে আমাদের লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করা উচিত। এক একটি কারখানায় মরশুমের সময় আট হইতে যোলো জন করিয়া মজুর কাজ করিত। প্রতি কারখানায় গড়ে দশ জন করিয়া মজুর ধরিলেও এই নব্বুইটি কারখানায় নয় শত মজুরের বা নয় শত গৃহস্থের অন্ন-সংস্থান হইত। ইহা ভিন্ন মুটে, মাঝি, দালাল, কয়াল প্রভৃতি প্রায় তিন শত লোক এই কাজে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইত। মুটেই ছিল প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন। হাটুরে নৌকা আনুমানিক একশত পঁচিশ। ইহা ভিন্ন প্রায় ত্রিশ চল্লিশ খানি নৌকা পাটা শেওলা (শৈবাল) কাটিতে ও বেচিতে নিযুক্ত থাকিত। চালানি কাজেও বিস্তর নৌকা খাটিত। ঝুড়ি, চুপড়ি, কোলা, মেছলা, নাদা, খুলি, ঝর্ণি, ডাবা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কত ডোম ও কুমার স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা বলা কঠিন। আর এক কথা,—এই নব্বুইটি কারখানায় নব্বুই জন মুহুরীর আবশ্যক হইত। সামান্য শুভঙ্করের অঙ্ক কসিয়া ও হাতের লেখা দোরস্ত করিয়া অনেক ভদ্র সন্তান এই মুহুরীগিরি করিতেন। ইহাতে নব্বুই ঘর ভদ্র গৃহস্থ প্রতিপালিত হইত।

কারখানার অবস্থা যখন ভাল ছিল,—তখন কারখানার স্বত্বাধিকারীরা বৎসরে খরচ খরচা বাদ প্রায় দুই তিন হাজার টাকা লাভ করিতেন। অবশ্য সকল বৎসর সমান লাভ হইত না। যাহা হউক, তাঁহারা বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিয়া, দশজন আশ্রিত অনুগতকে প্রতিপালন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কারখানার মরশুম ছিল। মজুরেরা অনেকে চৈত্রে বিদায় লইয়া বৈশাখে চাষে মন দিত। ফলে মোটের উপর এই কারবার লুপ্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আনুমানিক দুই হাজার লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের একটা উপায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভদ্র লোক মহলে ইহার প্রভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, অনেক বড় বড় বাড়ির চূণকাম খসিতেছে, দেউল ভাঙিতেছে,—অনেক পূজার দালানে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনির পরিবর্ত্তে চামচিকা ও বাদুড়ের ছুটাছুটি শুনা যাইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে,—তাহা কি অন্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না? অবশ্য যে উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইত, সে উপায়ে আর

চলিবে না। যদি চলিবে তাহা হইলে কারখানা গুলি যাইবে কেন? উহাতে অপচয় অধিক, খরচও অধিক,—সুতরাং প্রতিযোগিতায় উহা টিকিতে পারেই না। কিন্তু যদি বর্ত্তমান যুগের উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে শর্করা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে খরচও অল্প হয় মালেও অধিক ভজে। অবশ্য প্রথমে যন্ত্রাদি কিনিয়া দেখিতে হয়। লোককে যন্ত্রাদির ব্যবহার শিখাইতে হয়: তাহাতে প্রথমে কিছু ব্যয় এবং ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ সকল কার্য্যে প্রথমে একটু ক্ষতি স্বীকার না করিলে পরিণামে মঙ্গল হইতেই পারে না। একটা বৃত্তি—জীবিকার্জ্জনের একটা উপায়—একবার ছাড়িয়া দিলে আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না। তাই বলি বৃত্তি ছাড়িবার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের কথাটা এক বার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জানিয়া শুনিয়া প্রথমে ক্ষতি স্বীকার করিতে কে অগ্রসর হইবে? সমস্যা ঐ খানেই। আমার বোধ হয়, দশ জন ধনী মিলিত হইয়া সকলে কিছু কিছু টাকা দিয়া প্রথমে পরীক্ষা-স্বরূপ একটা কারখানার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যদি কারবারে লাভ হয়, এক জন ঐ কাজ বুঝিয়া লইবেন, এবং অন্যের অংশের টাকা মায় সুদ ফিরাইয়া দিবেন। যিনি কারবারের কর্ত্তা থাকিবেন,—তাঁহার দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। সুদের হার অল্প করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে দশ জনেই যৌথ-কার্য্যের পত্তন করিতে পারেন। শুনিতে পাই, আমাদের 'সাজার' কাজ সাজে না। এখন দেশ কাল পাত্র ভাবিয়া যাহাতে সাজে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কেবল 'ফরওয়ার্ড সেলে' যাভার চিনি কণ্ট্রাক্ট্ পত্রে স্বাক্ষর করত খরিদ করিয়া হাজার হাজার টাকা লোক্সান দিলে চলিবে না। ঐরূপ সুর্ত্তি খেলা পরিণামে শুভাবহ হইতেই পারে না। কারণ যাহাদের সহিত আমরা সুর্ত্তি খেলিতেছি, তাহাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক পাকা তাহারা কানে জল দিয়া কানের জল বাহির করিতে জানে।

অনেকেই ভাবিতে পারেন যে,দশ জনে টাকা দিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠা করিব--কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা যায়? দুই তিন বৎসর ধরিয়া তাহার পরীক্ষা দশ জনেই করিব, লোক্সান হয় দশ জনেই তাহা সহিব, কিন্তু যেমন লাভের উপায় আবিষ্কৃত হইবে, অমনই তাহা এক জনে পাইবে, বাকী সকলে নিজ নিজ অংশের টাকা লইয়াই সরিয়া পড়িবে, ইহা কেমন ব্যবস্থা?

ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ কি? আমার ধারণা, স্বার্থকে অত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়িয়া সমাজগত স্বার্থের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি ঐ চিনির কারবার রক্ষা করিবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে সকলেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন; সকলেরই অর্থ উপার্জ্জনের একটা পন্থা হইবে। নতুবা পরে আমাদের বংশধরগণ কি করিবে? চাকুরী মিলে না, আড়তদারী থাকেনা, অন্য ব্যবসায়ও সুবিধাজনক নহে। এই ব্যবসায়ের প্রভাবে তাম্বুলি-সমাজ এই অঞ্চলে প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও ইহার দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন,—এখন ইহার লোপে অনেকের দুর্দ্দশা হইয়াছে,—পরে দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদিবে।

আমার শেষ কথা,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে গোবরডাঙ্গা গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছিল,—আমাদের আমলে যাহাতে উহা একেবারে অপদার্থ লোকের আবাসস্থলে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি চিনির-কারখানার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভবই হয়, অন্য কারবারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে পরিণামে সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

সুরা। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, রম্, জিন্, ধেনো প্রভৃতি বহুবিধ সুরা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত সুরার নাম ব্রাণ্ডি; যব হইতে প্রস্তুত সুরার নাম হুইস্কি; গুড় হইতে প্রস্তুত সুরার নাম রম্; জুনিপার ফল হইতে প্রস্তুত সুরার নাম জিন্; ধান্য হইতে প্রস্তুত সুরার নাম ধেনো। সুরা সাধারণত উত্তেজক। এই উত্তেজনা শরীরের সমস্ত যন্ত্রে প্রকাশ পায়। পরন্তু মস্তিষ্কের উপর ইহার ক্রিয়া কিছু অধিক। মাত্রাধিক্য হইলে উত্তেজনা শীঘ্রই অবসাদাবস্থায় পরিণত হয়। সুরাপানের অল্পকাল পরেই পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ হয়, চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, আত্মশাসন-শক্তি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হয়, পেশীসকল দুর্ব্বল হয় এবং গতিশক্তি লোপ পায়। সুরাপায়ী অসংলগ্ন বকিতে থাকে, কখনো চীৎকার, কখনো হাস্য কখনো বা ক্রন্দন করে এবং ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। সচরাচর

৬ হইতে ১০ ঘণ্টার মধ্যে বা কিছু পরে চৈতন্যোদয় হয়। তখন বমন বা বমনেচ্ছা, পিপাসা, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা প্রভৃতি অনেক প্রকার শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হয়। সুরাপায়ীদিগের বিবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ, অম্ল, অজীর্ণ, শোথ, মস্তিষ্ক ও যকৃতের পীড়া, হৃদ্‌রোগ, ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ, মৃগী ও পক্ষাঘাত সর্ব্বদাই হইতে দেখা যায়। অবিরত সুরাপানরত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রা, অভিঘর্ম্ম, প্রলাপ, ভয়, কাল্পনিক চিন্তা, নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন, হস্তপদাদির কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ সংযুক্ত এক প্রকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তারেরা এই অবস্থাকে Delirium Tremens বলেন। সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার Roberts প্রমুখ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কি বলিতেছেন, দেখুন :-

"Spirits do by far the greatest harm, specially when taken in frequent drams, strong and on an empty stomach".

F. T Roberts, M, D, , B, Sc, F, R, C, P.

"When taken in a large dose it may immediately destroy life, like any other active poison, In smaller quantities, frequently repeated, its effects are very prejudicial; all the important organs suffeing more or less from its influence, but specially the stomach, liver, kidneys, and the nervous system."

T. H, Tanner, M., D, M. R. C. P. F. L. S.

প্রত্যহ অল্প পরিমাণে সুরাপান করিলে শরীর স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার আধার হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসকের বিনা পরামর্শে অনেকে গোপনে সুরাপান অভ্যাস করেন। প্রত্যহ সুরাপান করিলে শীঘ্রই উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং মাত্রাও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এতে স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে গিয়া অনেকে পাকা মাতাল হইয়া উঠেন। সুরা পানে মাননাশ, অর্থনাশ, জীবননাশ, সমস্তই হইয়া থাকে। কত শত ধনী, মানী ব্যক্তি এক সুরার প্রসাদে ধন, মান হারাইয়া রাস্তার কাঙাল হইতেছেন। "একোহি দোষোগুণরাশিনাশী।" এক সুরাপানদোষে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। সুরাপায়ী সমস্ত মান সম্ভ্রম শৌণ্ডিকের চরণে সমর্পণ করিয়া সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-প্রবল দেশে ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপান একই প্রকার মহাপাতক বলিয়া গণ্য হয়। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—"সুরা অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য।" আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে

উক্ত আছে ;—

"মদ্যোপ হত বিজ্ঞানো বিমুক্তঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥"

মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ বিযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দূষ্য, নিন্দনীয় ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

"গচ্ছেদগম্যান্ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্ট সংজ্ঞঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদিস্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥"

মদ্যপায়ী ব্যক্তি অগম্য স্থানে গমন করে, গুরুজনের সম্মান করে না, অভক্ষ্য ভোজন করে, জ্ঞানহীন হয়, হৃদয়ের গুহ্য কথা প্রকাশ করে এবং তাহার আত্ম-শাসন-শক্তি থাকে না। "Habit is tho second nature" ইহা মহাজন-বাক্য। এক বার সুরাপান অভ্যস্ত হইলে সে অভ্যাস সহজে দূর হয় না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে মনঃসংযোগ করা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঐ পাপ অভ্যাস ত্যাগ করা ব্যতীত উহার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। আর অধিক বলিব না ; কেবল এই মহা কবিবাক্যটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করি—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং।" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-পরিচয়

পাট বা নালিতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে শ্রীযুক্ত রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকের অধিকাংশই 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাটের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা-করেন, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহারা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

An Easy Introduction, to tho study of Telegraphy—শ্রীযুক্ত সুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বেনারস মহালক্ষ্মী-প্রেসে এ, কে, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা।

Telegraphy সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্যই এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রথম শিক্ষার্থীরা ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। সমালোচক।

স্বপ্ন-স্মৃতি

—০:০:০—

আজি, চন্দ্র কিরণে, ধীর সমীরণে,
মনে পড়ে তার ছবিটি,
আজো, হৃদয়ের পটে, আছে মোর ফুটে,
তাহার করুণ আঁখিটি।
আমি, স্বপন-মাঝারে, দেখেছিনু তারে,
নিমেষের তরে আবেশে,
সে যে, স্বপনের বেশে, জ্যোছনার দেশে,
ছিল বসে' তথা হরষে।
সেথা, নীলাকাশ-কোলে, স্বরগের ফুলে,
জ্যোছনা আছিল ছড়া'য়ে,
তথা, কুসুম-বালিকা, চামেলি-কলিকা,
দিতেছিল শোভা বাড়া'য়ে।
সেথা আরো কত ফুল, শোভায় অতুল
ফুটেছিল বন ভরিয়ে,
যেন, কেহ নানা বন করি বিচরণ,
এনেছিল শোভা হরিয়ে।
আমি বারেকের তরে, আবেশের ভরে
দেখেছিনু চারু শোভাটি,
সেথা চকিত-মাঝারে, দেখেছিনু ফিরে,
তাহার করুণ আঁখিটি।
তাই চন্দ্র-কিরণে, ধীর সমীরণে
পড়িতেছে স্মৃতি মনেতে,
আজি তাই দূর হ'তে, এ মধুর রাতে
পশে তারি গান কানেতে।

শ্রীহরিপদ দে।

প্রত্যাবর্ত্তন (৫)

বৃন্দাবনে কোনো পরিচিত ব্যক্তির সন্ধান জানিতে না পারায় 'লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ি' গিয়া উপস্থিত হইব, এইরূপ একটা সঙ্কল্প লইয়া চলিয়াছি। হাথরস জংশন হইতে পথেই সন্ধ্যা হইল, তখনো বৃন্দাবন, আরো দুই একটা ষ্টেশন পরে। আমি যে গাড়িতে ছিলাম তাহাতে আর অধিক লোক ছিল না, বোধ হয় দুই একজন মাত্র ছিল। অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে; একটি ভদ্র লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

"আমি বৃন্দাবন যাইব।"

ক্রমে আমাদের আরো কথাবার্ত্তা চলিল; তাহাতে জানিলাম তিনি মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনে আসেন। এবার কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন, আজ গোকুলে গিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে থাকেন, নাম গৌরাঙ্গচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গৌরাঙ্গ বাবু শিক্ষিত যুবক, অল্পক্ষণের মধ্যে এতটা পরিচয় করা—বিশেষত পিতার নাম পর্য্যন্ত বলার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কেন জানি না—আমারো ঠিক স্মরণ নাই, কি কথার সূত্রে তিনি পিতার নাম বলিলেন। আমার তখন মনে হইল, ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম প্রচারক-দল গঠনের সময়, যে অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছিলাম, ইনি কি সেই অন্নদা বাবু? জিজ্ঞাসা করায় গৌরাঙ্গ বাবু বলিলেন,—"তিনিই আমার পিতা—মুঙ্গেরে থাকেন।"

এখন গৌরাঙ্গ বাবু আমার পরিচিত ব্যক্তির মধ্যেই হইলেন। তার পরেও আমাদের আরো কিছু কথাবার্ত্তা হইল, কথার ভাবে বুঝিলাম তিনি ডাক্তারী পাশ করিয়াছেন, মুঙ্গেরে একটি ডিস্‌পেন্সরীও আছে। তিনি আজো বিবাহ করেন নাই,—অর্থাৎ তিনি একজন দস্তুরমত সংসারী লোক নহেন কিম্বা চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহেন। ধর্ম্ম কর্ম্মে আর সাধু সেবায় তাঁহার বেশী সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতাও এখন বিশেষ ধর্ম্মের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়াও উদার ভাবেই ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। অবশ্য তাঁহার বয়স এখন অধিক হইয়াছে।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমরা বৃন্দাবন ষ্টেসনে আসিয়া নামিলাম। গাড়িতে গৌরাঙ্গ বাবু জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি বৃন্দাবনে কোথায় যাইবেন?"

"আমার তো যাইবার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তবে 'লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ি' যাইব মনে করিতেছি।"

"আজ পর্য্যন্ত আমার একটা ঘর ভাড়া করা আছে, আগামী কল্য আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, আজ রাত্রে আপনি সেই ঘরে থাকিতে পারেন।"

আমি তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন,—"আমি রাত্রে আর কিছুই আহার করিব না, আপনার জন্য কিছু দোকানের খাবার লইব, অপনি কি লইতে চান লউন।"

কিছু পুরী ও তরকারি লওয়া হইল, আমার নিকট কিছু পয়সা ছিল দিতে গেলাম কিন্তু তিনি বাধা দিয়া নিজে পয়সা দিলেন। এই সকল ঘটনা এখন যেন আমার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে।

পরদিন প্রাতে গৌরাঙ্গ-বাবু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাকে লইয়া তাঁহার ভক্তিভাজন হরিচরণ বাবাজীর বাড়ি গিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়া গেলেন। রাত্রে গৌরাঙ্গ বাবু আমার নিকট হরিচরণ বাবাজী সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চভাব প্রকাশ করিয়া বলেন,—"তিনি শিক্ষিত বাঙালী, সংসারত্যাগী ভক্ত-সাধক।"

হরিচরণ বাবাজী অল্প কথায় আমার পরিচয় লইলেন। আমার এই ভ্রমণ সম্বন্ধে দুই এক কথার পর বলিলাম,—"ষোলো বৎসর পূর্ব্বে একবার আমরা তিন বন্ধুতে এখানে আসিয়াছিলাম, সে বারে আমি তেমন কিছু বুঝিতে পারি নাই, আমার এবারকার ভ্রমণ একপ্রকার স্বাধীনভাবের, তাই আর একবার এই স্থানটা দেখিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তবে বাহ্য ব্যাপার দর্শনে আমার অধিক আকাঙ্ক্ষা নাই, আপনার নিকট রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্ন খুব সরল সোজাসুজী রকমের, কেন না পুরাণ-বর্ণিত কোনো ভাবের দিক দিয়া কোনো কথা শোনা আমার উদ্দেশ্য নহে। উত্তর যদি খুব সরল ভাবে পাই তবেই আমার আনন্দ হইবে।

আমার ভাব দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সস্নেহভাবেই প্রথমে বলিলেন,—"তুমি এখানে কিছুদিন থাকো, ক্রমে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।"

"আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে, অতএব মূল তত্ত্ব-সম্বন্ধে আপনার নিকট কিছু শুনিলে বোধ হয় আমার আনন্দ হইবে।"

তাঁহার যত্নে মধ্যাহ্নে তাঁহার বাসায় আহার করিলাম। ইতিমধ্যে একবার বেড়াইয়া আসিলাম; হরিদ্বারে যে যুবকটির সহিত কথা ছিল যে, প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে

যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাই, (নাম ঠিকানা লেখা ছিল) মদনমোহনের বাড়িতে তাঁহার দেখা পাইলাম। পরে যমুনায় স্নান করিয়া আসিলাম।

আহারান্তে বিদায়ের পূর্ব্বে হরিচরণ বাবাজীর সহিত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা হয়,—আমার প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দেন, তাহা তখন তেমন সন্তোষ-জনক হয় নাই। আমি দেশে ফিরিয়া আসার পর আমার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ধর্ম্মবন্ধু জনার্দ্দন সরকারের সন্নিধানে, তাঁহার পরিচিত একটি বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় ; তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হরিচরণ বাবাজীর কথা হইতে পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট অথচ একই রকম ভাবের কথা, এজন্য আমার প্রশ্ন এবং উভয় উত্তরের সার কথা এখানে উল্লিখিত হইল ;—

প্রশ্ন ;—"উপনিষদে স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মা, পরমাত্মা ; পিতা, পুত্র ; প্রভু, দাস, সখা-সুহৃদ প্রভৃতি ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখা যায়। তারপর দেহধারী অবতার-ভাবে রাম-সীতার ভাব তখনো পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবেই ছিল ; কিন্তু তারপর রাধাকৃষ্ণ-ভাব অবতারণার কি আবশ্যক হইল ?— অবশ্য স্বাধীন প্রেমের মাধুর্য্য রক্ষার জন্যই বোধ হয় রাধা বিবাহিতা স্ত্রী না হইয়াও নায়িকা-রূপে পর-কীয়া মাধুর্য্য রসের লীলা দেখানো হইল, কিন্তু এই ভাবুকতার প্রাবল্যে জ্ঞানের যে উচ্চ আদর্শ, তাহা কি খর্ব্ব হইয়া গেল না ? ইহাতে ধর্ম্ম-জগতের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ কি অধিক হয় নাই ?"

দ্বিতীয় প্রশ্ন,— "রাধা কে ? কৃষ্ণই বা কে ? ইহারা কি প্রকৃত কোনো নর-নারী ছিলেন, কিম্বা কল্পিত ? অথবা পরমাত্মা (কূটস্থ চৈতন্য) এবং জীবাত্মা (হ্লাদিনী-শক্তি) ? যদি উঁহারা পরমাত্মা এবং আত্মার রূপকই হন তবে উপনিষদে আত্মা-পরমাত্মার এমন নিগূঢ়, বিশুদ্ধ অথচ 'প্রাণস্য প্রাণম্' 'মধুরম, মধুরম্' স্বরূপের প্রকাশ স্বত্ত্বেও—যে সাধনায় ঋষিরা উচ্চ ভাব এবং বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ করিয়া 'ব্রহ্মানন্দ' 'ভূমানন্দ' সম্ভোগ করিয়া গেলেন, সে আদর্শ ম্লান করিয়া এমন রূপক-সাধনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন তবে বড়ই উপকৃত হইব।"

উত্তর ;—(১) "উপনিষদোক্ত আত্মা-পরমাত্মা-ভাবের মধ্যে মাধুর্য্যরসের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। (২) রাম-সীতার ভাবেও মাধুর্য্যরস তেমন নাই, উহা করুণ-রসাত্মক এবং বিধি-বাদে বদ্ধ অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সীতা পরিত্যাগ করা হইল। (৩) রাধা-কৃষ্ণে মাধুর্য্যভাবের পূর্ণাদর্শ;—স্বকীয়া হইতে পরকীয়া রস

গাঢ় ; পরকীয়া কামগন্ধ-বর্জ্জিত হইলে মধুর রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝিবার উপায় হয়। পবিত্র ভাব না হইলে এ তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি।”

এই উত্তর দ্বারা আমার প্রশ্নের প্রকৃত আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ; তবে ইহার কাম-গন্ধ-শূন্য ভাবটি উচ্চ বটে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা বড়ই জটিলতা-পূর্ণ, সাধারণে তাহা কিরূপে বুঝিবে ? আর যাহা বুঝিয়াছে তাহাও সাধারণের ভাবেই প্রকাশ দেখা যাইতেছে।

২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা ৪ টার পর বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশ)

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি

—০:০:০—

পশ্চিমের পুণ্যস্নিগ্ধ মুক্ত স্বচ্ছধারা
মিলিল পূরবে আজি ; বল,—বল কা'রা
বাজাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা এ পুণ্য সঙ্গমে,
মহামন্ত্র উচ্চারিয়া মহৎ করমে
করি দিবে অগ্রসর ? নহে অশ্রু নহে।
মহাসিন্ধু-অম্বুরাশি যেই পথে বহে
সে' পথে মিলালো এই স্নিগ্ধ স্রোত আসি',
কি পুণ্য প্রয়াণ তব, কি মধুর হাসি,
কি শুভ জনম তব, কি অমৃত বাণী
কি কঠিন ত্যাগ তব, করুণ-পরাণী ;
কি দুঃখ-ক্রন্দন তব পর দেশ লাগি'
হে ভগিনী ভারতের ! নিত্য রহি' জাগি'
কি পন্থা দেখা'য়ে দিলে ভারত-ভ্রাতারে
কি শান্তি বরষি' গেলে ভারত-মাতারে !

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

একখানি পত্র

প্রিয় যোগীন্দ্রনাথ —

সাংসারিক বর্ত্তমান অবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে তুমি "কুশদহ" কাগজ যেরূপ কষ্ট করিয়া বাহির করিতেছ তাহা দেখিয়া আমি কষ্টানুভব করি।

স্থানীয় লোকে দেশের উপকারের জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর নয়। এখনও কাগজের উপকারিতা সাধারণ লোকে তেমন বুঝে নাই।

আমি ২৪।২৫ বৎসর হইবে, "কুশদহ" কাগজ প্রথম বাহির করিয়াছিলাম। তখন স্থানীয় অনেক লোক কাগজের মূল্য দিত না। যদিও মূল্য আদায়ের অভাবেও কয়েক বৎসর কাগজ চলিয়াছিল, লোকের অনুরাগের অভাবেই কাগজ বন্ধ করিতে হইল।

এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তুমিও সময়ের উপযোগী করিয়া কাগজ বাহির করিয়াছ, তথাপি লোকের তেমন অনুরাগ দেখা যায় না।

তুমি বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন খাঁটুরা-ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে একখানি যোগ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় সামান্যভাবে অবস্থিতি করত স্থানীয় লোকের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য পরিশ্রম করিতে, তখন তোমার মনের অবস্থা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতাম।

তুমি গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত এক ধনাঢ্য ব্যবসাদার পরিবারের সন্তান। পূর্ব্ব অবস্থার সুখ-সম্ভোগ বোধ হয়, তোমার ভাগ্যে বেশি দিন ঘটে নাই। তুমি তজ্জন্য যৌবন কাল হইতে কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছ।

এখন তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে কাগজ চালাইবার জন্য পরিশ্রম ও ব্যয় নির্ব্বাহের চিন্তা দেখিয়া আমাদের কষ্ট বোধ হয়। আমরা ভাল অবস্থায় যাহা করিতে পারি নাই, তুমি সকল প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া তাহা করিতেছ। এমন দুষ্কর কার্য্যে আশ্চর্য্য তোমার অধ্যবসায়।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত।

১২/২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৮।৭।১১

(ভূতপূর্ব্ব "কুশদহ" সম্পাদক ও খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক)

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্যামবাজার মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খাঁটুরা নিবাসী পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি :—

সরল-পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ। নীতি পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) নীতি পাঠ, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ (মধ্য বঙ্গ পাঠ্য) ব্যাকরণ প্রবেশিকা (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সার (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) বাঙ্গালা-ব্যাকরণ (ম্যাট্রিকুলেসান পাঠ্য)।

সমস্ত পুস্তকগুলিরই কাগজ, ও ছাপা সুন্দর।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত আশ্বিন মাসে পুঁড়া নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে কেবল পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়, তিনি এক জন নিষ্ঠাবান সাধকও ছিলেন। তাঁহার উপদেশপূর্ণ জীবনী বারান্তরে যাহাতে "কুশদহ"তে প্রকাশিত হয় আমরা তাহার চেষ্টা করিব।

দেশের দিন দিন হীনাবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে নিরাশার কথাই অধিক শোনা যায়। আমাদের মনে হয়, রোগীর জীবনের আশা যখন সংশয়াপন্ন হয় তখনো আত্মীয় স্বজন তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; তদ্রূপ দেশের দুর্দ্দিনেও কি আমাদের কোনো কর্ত্তব্য নাই ? তারপর আমরা, প্রত্যেকে কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা করিয়াছি বা করিতেছি ? তাহা যদি না পারি তবে ফলের আশা কিরূপে করিতে পারি ?

কুশদহ-সমাজে তাম্বুলী-শ্রেণী ঘৃত চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসাদ্বারা এক সময়ে একটি শ্রীমান্ ক্রিয়া-কর্ম্মশীল সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আজ

সেই চিনি ও ঘৃতের ব্যবসায়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শ্রেণীর ক্রমশ হীনাবস্থাই দেখা যাইতেছে, কিন্তু এখনো কি কোনো প্রতিকারের উপায় নাই? এখনো কি তাঁহাদের মধ্যে দশ পাঁচ জন, এমন অবস্থাপন্ন নাই যাঁহারা বর্ত্তমান সময়োপযোগী নূতন প্রণালীতে কল-কারখানার সাহায্যে ঐ গুড় চিনি উৎপন্ন করিয়া আবার সেই ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন? উপায় নিশ্চয়ই আছে, নাই কেবল শিক্ষা। শিক্ষার অভাবেই এত সংকীর্ণ ভাব, তাই এত অবনতি।

কলিকাতার বড়বাজারে চিনি-ব্যবসায়িগণের দ্বারা প্রতি বৎসর কালী পূজার সময় 'বারোয়ারি' হয়। তাহাতে প্রায় দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। তাহার অধিকাংশই নাচ গান যাত্রা ইত্যাদিতে খরচ হয়। কিছুদিন হইতে অধ্যক্ষগণ নিয়ম করিয়াছেন যে, বারোয়ারির তহবিল হইতে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত রাখিয়া গরীব দুঃখী ভদ্র-শ্রেণীর সাহায্য করা হইবে, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে ইহা অবগত আছি। তাঁহারা কয়েক বৎসর হইতে এরূপ কাজে অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন; ইহা অতিশয় প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আজ আমরা তাঁহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল উন্নতির মূল শিক্ষা; লেখা পড়া শিক্ষার দ্বার দিয়াই সকল প্রকার শিক্ষার ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই জন্য যাহাতে লেখা পড়া শিক্ষার উন্নতি হয় সমাজে তাহার ব্যবস্থাটি ভাল করা অথবা ভাল রাখা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। বিশেষত বর্ত্তমান সময়ে লেখাপড়া জানা ভিন্ন কোনো রকমেই উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। আর যদি কেবল পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট মনে করিয়া স্ত্রী জাতির শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা না হয়, তবে তাহাতেও ঠিক সমাজ উন্নত হইতে পারেনা। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে 'স্ত্রী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।'

কিছুদিন পূর্ব্বে খাঁটুরা গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় হইয়াছে, এই ইস্কুলটি যখন হয়, তাম্বুলী-সমাজ হইতে ইহার সাহায্য করা হইবে এমন কথা তখন শোনা গিয়াছিল; সে যাহা হউক এপর্য্যন্ত ইস্কুলটির অবস্থা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না, তাহার প্রধান কারণ অর্থাভাব। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, 'বারোয়ারির' টাকা প্রধানত তাম্বুলী-শ্রেণীর টাকা,—সেই শ্রেণীই অন্যান্য সাহায্যে মাদিক যথেষ্ট দান করিতেছেন কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়টির উন্নতি করা যে তাঁহা-

দেরই ঘরের কাজ,—প্রধান কাজ, এ কথা কেন ভাবিতেছেন না ? এই কাজে সর্ব্বাগ্রে ব্যয় করা উচিত—এমন কি একটি ইস্কুল ভালরূপে চালাইতে যে অর্থের আবশ্যক তাহা তাঁহাদেরই বহন করা কর্ত্তব্য।

"তাম্বুলী-সম্মিলন-সমাজের" কেন্দ্র-সভার অভ্যুদয় "কুশদহ-তাম্বুলী-সমাজ" হইতে। এই কেন্দ্র-সভা অন্যান্য স্থানে সভা করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, 'তাম্বুলী-সমাজ' মাসিক পত্রিকা খানিও এক রকম কেন্দ্র-সভা হইতেই পরিচালিত, ইহা বড়ই ভাল কথা,—বড়ই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের নিজের সমাজ যে দিন দিন কোথায় কি অবস্থায় চলিয়া যাইতেছে তাহার কি করিতেছ ? শিক্ষা বিস্তার এবং কুপ্রথা দূর করাই সামাজিক উন্নতির মূল, তাহার কি করিতেছ ? আগে নিজ সমাজের এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বালক বালিকাগণের শিক্ষা বিস্তারের উপায় করিয়া তারপর ব্রাহ্মণ-বালকের পৈতা দেওয়া এবং "কন্যাদায়" হইতে উদ্ধার করার জন্য অর্থদান করিলে ভাল হয় না ? কেন্দ্র-সভা অনুগ্রহ করিয়া এ কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'কুশদহ'র চাঁদা অগ্রিম দেয়, কিন্তু সাত মাস কাগজ পাইয়াও যাঁহারা চাঁদা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না, দয়া করিয়া সত্বর এই সামান্য চাঁদাটি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার না পাইলে পৌষের কাগজ ১লা ভিঃ পিতে পাঠাইব।

এখন যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে নমুনা-স্বরূপ এক সংখ্যা বা দুই সংখ্যা "কুশদহ" পাঠানো হইতেছে, তাঁহারা ঐ নমুনা প্রাপ্তির পর যদি কাগজ লইতে অনিচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাদিগকে একটু জানাইলে ভালো হয়, নচেৎ আমরা বড়ই সন্দেহের মধ্যে থাকি। যদি কোনো মতামতই না পাই তবে এখন হইতে বুঝিব যে, তাঁহাদের গ্রাহক হইতে অমত নাই, সুতরাং বৈশাখ হইতে গত সংখ্যা গুলি তাঁহাদের নামে ভিঃ পিতে পাঠাইব। কুশদহ -কার্য্যাধ্যক্ষ)

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press
35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from
28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাসযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

চিত্র পরিচয় : গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর দৃশ্য :

কুশদহ-কার্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। পৌষ, ১৩১৮ ৯ম সংখ্যা

গান

বাউলে সুর—খ্যামটা।

সহজ মানুষ সরল ভাবে সোজা পথে চলে।
সে সহজে বুঝে তত্ত্ব, সহজ কথায় বলে।
সহজে ধ্যান ধরে, হরিগুণ গান করে,
সহজে দেখে তাঁরে হৃদয়-কমলে;
সে সহজ ভক্তি রসে মজে' ভাসে নয়ন-জলে।
সহজে মন প্রাণ, জাতি কুল, ধন মান,
করে সব বলিদান হরি পদতলে;
সে সহজে প্রণয়ী হ'য়ে, সহজ প্রেমে গলে।
সহজে পায় ধরে, শত্রুকে ক্ষমা করে,
সহজে ভালবাসে মানব সকলে;
সে সহজে অদ্ভুত কীর্ত্তি করে দৈব-বলে।
প্রেমদাস পাটোয়ারি, সহজ প্রেমের ভিখারী,
সহজে চায় মিশিতে হরিভক্তদলে;
সে সহজে সর্ব্বদা যেন, হরি হরি বলে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

অন্তর্জগতে আনন্দময় ভগবান

বাইবেল শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের বিবিধ গ্রন্থে সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুর দশ অবতার, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলত সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থেই কোনো না কোনোরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বে সাধারণত স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু উন্নত জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া অনেক দার্শনিক পণ্ডিত স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, কেবল জ্ঞান-বিচারে অথবা কেবল সরল বিশ্বাসে এ তত্ত্বের যে ঠিক মীমাংসা হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। কেননা, এখানে জ্ঞানিগণ হয় নাস্তিকতাবাদ কিম্বা সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছেন, আর বিশ্বাসিগণ ভাবের দিক দিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

অধ্যাত্ম জগতে কোনো কোনো স্বাধীন চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান সাধক, সাধন করিতে করিতে যোগ-তত্ত্বের ভিতর দিয়া এমন আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন উপনিষদের কোনো কোনো ঋষি, প্রথমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি স্বীকার করিয়াও অন্তর্জগতের এমন এক স্থানে বা অবস্থায় গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, যেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, এ জগৎ সৃষ্ট বস্তু নয়, এখানে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, এ সকলই সেই আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ! "কি ভয়ানক কথা! এই জরা, মৃত্যু, দুঃখ, তাপ পূর্ণ জগৎ, ইহা আবার আনন্দময়ের প্রকাশ?" হাঁ, নিশ্চয়ই, তাই তাঁহারা বলিলেন,—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশই আনন্দ—অমৃতরূপ।

যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি একটা কথা আছে, তেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ আর একটা কথা আছে, কিন্তু অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বলিয়া দুইটা জগৎ নাই, একই জগতের দুই প্রকার ভাব মাত্র। জগতের বাহ্যভাবে নানা বস্তু ও বিষয় যাহার নানা প্রকার গুণ এবং ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, আর সমস্ত বহুত্বের মধ্যে একটি আন্তরিক ভাব, একত্ব ভাব; যেখানে সকলের মূলে এক শক্তির কার্য্য, তাহারই নাম অন্তর্জগৎ বা জ্ঞানময় জগৎ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান দৃষ্টি থাকে,—সাংসারিক বাসনার ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমি' 'তুমি', এইরূপ সকলই পৃথক্ পৃথক্ বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান এবং সাধনপুষ্ট ভাব গাঢ় হইলে তখন অন্তর্জগতের অভেদ ভাব দৃষ্ট হয়, তখন দেখা যায় দুইটা জগৎ বা বহির্জগৎ কিছুই নাই সকলই অন্তর্জগৎ বা জ্ঞানময় জগৎ। এই জগৎ সৃষ্ট পদার্থ নয়—এ সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ, সুতরাং জগৎ অনাদি এবং অনন্ত।

তবে কি জগৎ ব্রহ্ম? না তাহাও নয়, অনাদি অনন্ত দুই হয় না, ব্রহ্ম "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" জগৎ ব্রহ্ম-পদার্থ, ব্রহ্মীভূত, ব্রহ্ম এবং জগৎ স্বতন্ত্র নয়। "ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চিনাসীৎ!" পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না, তখন আর স্বতন্ত্র বস্তু কিরূপে কোথা হইতে আসিবে জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সুতরাং প্রকাশে অপূর্ণতা আছে, খণ্ডভাব আছে; পূর্ণ এবং অপূর্ণে একটি ভেদও আছে। অপূর্ণতা জন্যই আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে, সাধারণত তাহাকেই মৃত্যু বলা হয়। যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে, যাহা জন্মায়, তাহাই মরে। কিন্তু যাহার জন্ম নাই তাহার মৃত্যুও নাই। মূল পরমাণুর ক্ষয় নাই সকলই রূপান্তরিত হইতেছে মাত্র, সে কেবল উন্নততর বিকাশের জন্য।

যখন সাধকের এই তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—জ্ঞান স্থির হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' বলে, তখন আর কোনো দুঃখ তাপ থাকে না। 'সম্যক্ জ্ঞানে'ই দুঃখ বা মোহ অপসারিত হয়।

এইরূপে জগদ্দর্শন কি আনন্দ-দায়ক! যাঁহার এই অবস্থা লাভ হয় তিনিই বুঝিতে পারেন। জগতের সকলই যদি ভগবদ্বস্তু হইল,—সকলই যদি ভগবৎ লীলা হইল তবে আর ভয় ভাবনা কেন? দুঃখ তাপ কেন? এই অবস্থায় চিত্তে স্বতন্ত্র বাসনা থাকে না। আপনাকে স্বতন্ত্র একজন এবং আমার স্বতন্ত্র আর একটা সংসার, এই ধারণা ও সেই সংসারের ভোগ-বাসনা থাকিতে কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। কেননা সেটা ভ্রান্তির অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভ্রান্ত বস্তু লইয়া তৃপ্তি বা শান্তি কিরূপে হইবে? মানবাত্মা একটা মিথ্যা বস্তু নয় যে, সে মিথ্যা লইয়া তৃপ্ত হইবে। মানবাত্মা সত্য বস্তু, সে যতক্ষণ সত্য বস্তু না পায় ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। সমস্তই ভগবদ্বস্তু, এই জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হইলে, সংসার-জ্ঞান এবং মায়া মোহ চলিয়া যায়,

তখন সাধন-পথে সংসার বিঘ্ন না হইয়া বরং অনুকূল হয়। "সংসারে ভগবদ্দর্শন মেলে না," এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারাই সংসার ত্যাগ করেন কিন্তু দর্শনের পূর্ব্বাবস্থায় যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া সাধন করেন তাঁহাদের সংসার ত্যাগ করিতে হয় না,—তবে সাধনাবস্থায় পরীক্ষা সহ্য করিতে হয় কিন্তু যথা সময়ে "সর্ব্বং খ্বলিদং ব্রহ্ম," এই সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জগৎ আনন্দময়ের প্রকাশ, সকলই মঙ্গলময়,—সকলই আনন্দময়, ইহা একটি মহা সত্য বলিয়াই, যাঁহারা এই বিশ্বাস এবং জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সকল পরীক্ষা কাটাইয়া পরম বস্তুর দর্শন লাভ করেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া এই বক্তব্য শেষ করিব। আমরা যাহা চিন্তা করি, যাহা অনুভব করি এবং ক্রিয়া দ্বারা যাহা প্রকাশ করি তাহা কোথা হইতে আসিতেছে এবং পরক্ষণেই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে? কল্যকার চিন্তা,—দশ দিন পূর্ব্বের চিন্তা এমন কি, পর মুহূর্ত্তের চিন্তা আর আমার আয়ত্ত থাকে না, কোথায় চলিয়া যায়, আসিল কোথা হইতে আবার কোথায় চলিয়া গেল, সুতরাং বুঝিতে হইবে সকলই অনন্ত-জ্ঞান হইতে আসিতেছে। এবং অনন্ত-জ্ঞানেই চলিয়া যাইতেছে, আমার পশ্চাতে অনন্ত, সম্মুখে অনন্ত; আমি ক্ষুদ্র জ্ঞান টুকু—ক্ষুদ্র বোধ-শক্তি টুকু লইয়া চলিয়াছি। এ জগৎ বা এই সৌর জগতাতীত আর কোনো বিষয় যদি কিছু আমি বুঝিতে পারিয়া থাকি, তাহা আমার জ্ঞানের ভিতর দিয়াই প্রকাশ হইয়াছে। যে জগৎ আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে তাহা আমার জ্ঞানের ভিতরে। জগৎ যদি আমার জ্ঞানের ভিতরে হইল এবং আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান যদি অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্গত হইল তবে জগৎ, আমি এবং অনন্তজ্ঞান বস্তুত এক অখণ্ড—কেবল ক্ষুদ্র ভাবে, আংশিকভাবে জগৎ ও আমার প্রকাশ মাত্র।

এইরূপে আত্ম-স্বরূপেই জ্ঞানের প্রকাশ, জগৎ, জ্ঞানময়ের প্রকাশ; বহির্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, সকলই অন্তর্জগৎ; অন্তর্জগতে জ্ঞানময়-আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া যথার্থ শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা জগতের যেটুকু সেবা করা যায়, তাহা আত্মসেবা মাত্র; কিন্তু তাহা পরোপকার করা নহে। পরোপকার করা—এ কথা ধর্ম্মের নিম্ন সোপানের।

জগৎ সৃষ্ট বস্তু নয় কিন্তু আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ, ইহা গভীর বিশ্বাস, একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন সাধকের নিকটই প্রকাশ পায়। দাস—

দুর্য্যোধন চরিত

(কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত অবলম্বনে লিখিত)

আমরা শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি ও মহাভারতের প্রতি পৃষ্ঠায় পড়িতেছি—হীনমতি ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধনের উপর এই বিশেষণ গুলি প্রজোয্য কিনা তাহাই বিবেচ্য। সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে রাখা উচিত, মহাভারত আখ্যায়িকা রচনা হইয়াছিল—রাজা জন্মেজয়ের আদেশে ও অনুকম্পায়। রাজা জন্মেজয় পাণ্ডুবংশ সম্ভূত ও তখন তিনি ভারতের সম্রাট। কাজেই ভারতের ভাগ্য বিবর্ত্তনকারী কুরুক্ষেত্র সমরের প্রধান প্রতিপক্ষ নায়ক দুর্য্যোধন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা অতি সন্দেহ-চক্ষে দেখিতে হইবে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর আমরা পড়িয়া ছিলাম সিরাজ কদাচারী, নিশৃংস ও অন্ধকুপ হত্যার নায়ক ; কিন্তু সমদর্শী ঐতিহাসিকের নিকট আমরা সিরাজ চরিত্রের অন্যবিধ আভাষ পাইতেছি। কিন্তু দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কুরুক্ষেত্র অভিনয়ের যদি যথাযথ সত্য আবিষ্কার করা যায় তবে দুর্য্যোধনকে আমরা ভিন্ন চরিত্রে দেখিতে পাইব ! এখন দেখা যাউক কুরুক্ষেত্রের কারণ কি ? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরের রাজ্য দখল করিয়াছেন, তিনি বিনাযুদ্ধে খুল্লতাত পাণ্ডুরাজ-পুত্রদিগকে সূচ্যগ্র ভূমি দিবেন না। এই অজেয় প্রতিজ্ঞাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। এখন দেখা আবশ্যক হস্তিনাপুর রাজ্য কাহার। শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মরিয়া যান।

"মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে
শোকেতে আকুল হইল যত বধূগণ"

রাজার মৃত্যুর পর কুরুকুল অস্ত যায় দেখিয়া রাণী সত্যবতী নিয়োগ প্রথানুযায়ী সন্তান কামনায় ভীষ্মকে ধরিলেন। কিন্তু ভীষ্ম সে পাত্র নহেন,—

"যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব বামা সত্য নহে মম আন॥
দিনকর ত্যজে তেজ চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥"

ভীষ্মের অটল প্রতিজ্ঞার নিকট হার মানিয়া রাণী সত্যবতী, পুত্র ব্যাসের স্মরণ লইলেন। ব্যাস মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

"তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য-হিতে তব কুল করিব রক্ষণ ॥"

মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে রাণী অম্বালিকা দুই পুত্র প্রসব করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজ কিন্তু অন্ধ। দ্বিতীয় রাজা পাণ্ডু। ক্ষত্রিয়গণের ও পৃথিবীর সমস্ত রাজগণের এই একই নিয়ম—জ্যেষ্ঠ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য অবিভক্ত ভাবে প্রাপ্ত হন। কাজেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই হস্তিনা সাম্রাজ্যে একছত্র রাজা, কিন্তু তিনি অন্ধ বিধায় পাণ্ডুই রাজ কার্য্য চালাইতেন। মহাভারতকারও এ কথাটা বিশেষ জানিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে উল্লেখ করিতে তিনি মহারাজা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডু শুধু রাজা। পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া

"যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল।
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যত্ন করিয়া করিল বহুদান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।"

হস্তিনা রাজ্যের সেনাপতি রূপে রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া লুণ্ঠিত ধনরত্ন মহারাজে অর্পণ করিলেন এটা স্বাভাবিক। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্রাটই করিতে পারেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র করিয়াছিলেন; রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের আশা কখনও রাখেন নাই। রাজ্য চলিত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়, রাজা পাণ্ডু সেই আজ্ঞানুযায়ী রাজ্য চালাইতেন। কাজেই দেখা যাইতেছে হস্তিনারাজ্য পাণ্ডুর নয়- ইহা অন্ধ নরপতির।

"যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা ॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে ছিল অনুক্ষণ।"

এখন পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডু-পুত্রগণের এই রাজ্যে কোনো দাবী নাই। কাজেই দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি পাণ্ডু-পুত্রগণকে দিবেন না। স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিলে অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু রাজনীতি বহির্ভূত নহে। কুরু-

ক্ষেত্র সমর বা ক্ষত্র সাম্রাজ্য বিনাশ হেতু দুর্য্যোধনকে দোষ দেওয়া যায় না উহা পাণ্ডু-পুত্রগণের অন্যায় আবদারেরই ফল। তারপর যদি কেহ বিবেচনা করেন হস্তিনাপুর সাম্রাজ্য পাণ্ডু পাইয়াছিলেন উপযুক্ত বলিয়া। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই হিসাবে কে পাইতে পারেন। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক হইলেও বীর নহেন। তখন রাজাদিগের সৈন্য চালাইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে নামিতে হইত। যুধিষ্ঠিরের সে ক্ষমতা ছিল না। ভীম বীর হইলেও ক্রোধান্ধ, রাজোচিত গুণ তাঁহার ছিল না। অর্জ্জুন মহারথী বটে, কিন্তু রাজনীতি-জ্ঞান হীন। নকুল সহদেবের চরিত্র মহাভারতে পরিস্ফুট হয় নাই। আর দুর্য্যোধন—

"সসাগরা ধরা সাশিলাম বিদ্যমান
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।
মম বাহু খ্যাতি সর্ব্বলোকে করে পূজা"

যখন সমস্ত কুরুসৈন্য লয় হইয়াছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণ রণ প্রাঙ্গনে শায়িত হইয়াছেন একাকী দুর্য্যোধন বিষাদে ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্য পরিবৃত ভীমের সহিত কিরূপ গদাযুদ্ধ করিয়া ছিলেন শুনুন।

"দুর্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি।
হরিষে বর্ষণ করিলেন পুষ্প বৃষ্টি ॥"

তারপর দুর্য্যোধন গদাঘাতে মৃতপ্রায়। রাজা যুধিষ্ঠির কাঁদিতেছেন,

"রাজার লক্ষণ ভাই, আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে ॥
সমর-সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥"

মহাভারতকার দুর্য্যোধনের মহৎ অন্তঃকরণ, উদার হৃদয়ের পরিচয় অনেক স্থলে অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কুরুক্ষেত্র সমরের শেষ দৃশ্যটি দেখি। অন্যায় গদা প্রহারে রাজা মুমূর্ষপ্রায়—

"দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥"

রিপুনাশ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবের মুণ্ড স্বহস্তে ভাঙিতে চাহিলেন,

"শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেই ক্ষণে"

তখন রাজা দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙিয়া ফেলিলেন।

"তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল॥"

তখন রাজা বুঝিলেন ইহা পাণ্ডবের মুণ্ড নহে পাণ্ডব পুত্রগণের,

"এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি।
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ভাই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা"

দুর্য্যোধনের বিবাদ পাণ্ডবগণের সহিত, তাঁহাদের শিশু পুত্রগণ কুরু রাজের বৈরী নয়। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাদীপ্ত ইটালি মহাপ্রাণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

রাজার মহৎ হৃদয়ের আর একটি পরিচয় দিব। সপ্তম দিবসের যুদ্ধ অবসানের পর রাজা দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয়ে ভীষ্মের নিকট দুঃখ করিতেছেন,—

"সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥"

তখন ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, পর দিবস রণে পাণ্ডব নাশ করিবেন, অব্যর্থ বাণ পৃথক করিয়া রাখিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইহা গোপন রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন—রাজা দুর্য্যোধন সত্যবাদী। দুর্য্যোধন একদিন গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের সাহায্যে মুক্ত হয়েন,—

"তুষ্ট হয়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লও যাহা চায় মন॥

আজ শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রণায় অর্জ্জুন সত্যবদ্ধ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত।

"জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল॥"

এই বদান্য, এই সত্যশীল, এই মহাপ্রাণ রাজা দুর্য্যোধনকে কে বলিতে পারে

দুষ্ট মতি? জগতের ইতিহাসে এমন কয় জন আছেন? আর একটি কথা। কুরুক্ষেত্রের রণ সাঙ্গের পর রাজা দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।"

এই কথাটির আলোচনা করা যাউক। ক্ষত্রিয়গণের যে উদার, যে উন্নত যুদ্ধ-নীতি আছে তাহা অন্য জাতিতে নাই। ক্ষত্রিয় নিরস্ত্র শত্রুকে মারিতে জানে না।

"অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখন।
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
একা সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ-নীতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিব হীনে॥
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে॥"

ভীষ্ম প্রণোদিত এই উচ্চ আদর্শ হইতে রাজা দুর্য্যোধন একটিবার স্খলিত হইয়াছিলেন। সপ্ত রথীতে বেষ্টন করিয়া বালক অভিমন্যু বধের কলঙ্ক তিনি বহন করিতে বাধ্য। আর পাণ্ডবগণ কি করিলেন? ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথ বধে কি ছলনা—কি চাতুরী! ইহা প্রত্যেক মহাভারত পাঠক বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন, বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীবিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

রাজা শ্রীরামচন্দ্র খাঁ

দক্ষিণ রায় প্রবন্ধে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। এজন্য যথাস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু রাজা মুকুট রায়ের রাজ্য নাশের সহিত দক্ষিণ রায়ের বিবরণ যেরূপ জড়িত রাজা শ্রীরামচন্দ্রেরও সেইরূপ। রাজা শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম চন্দ্র খাঁ উপাধিধারী অনেক ভূম্যধিকারী ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে বেনাপোলের ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত রাজা রামচন্দ্র প্রধান ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে ছত্রভোগে যে রামচন্দ্র খাঁর উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ গৌড় বাদসাহগণের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাদ্রি-গমনের স্থবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের কোন কথা বলিবার নাই। বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্রের কথাও পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এ প্রবন্ধে আমরা যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলিতে চাহি, তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভূত। যশোহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বজ্রদ্বীপ (আধুনিক বাজেডীহি) নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হরিদেব স্বাধীন হিন্দু-রাজগণের অধীনে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সপ্তগ্রামের নিকট মুড়া-গাছা গ্রামে তাঁহাদের বসতি ছিল। হরিদেবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ পুরুষোত্তম দেব পাঠান রাজগণের অধীনে সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র মুড়াগাছায় বাস করা নিরাপদ জ্ঞান করেন নাই। ঐ সময়ে হিন্দু কর্ম্মচারী-গণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার ধূম পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ নগরের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজা শ্রীরামের পিতামহ ব্রাহ্মণ-নগরাধিপ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বজ্রদ্বীপ জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন,, এবং মুকুট রায়ের রাজ্যের উত্তরাংশ অর্থাৎ ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত রক্ষা ও শাসনের ভার পাইয়াছিলেন। রাজা মুকুট রায়ের সময়ে রাজা শ্রীরাম ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুকুট রায়ের রাজ্য রক্ষার জন্য রাজা শ্রীরাম ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

বজ্রদ্বীপে শ্রীরামচন্দ্রের বাটীর আর চিহ্ন মাত্র নাই। তবে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বাজদিয়াতে (বজ্রদ্বীপের অপভ্রংশ) এখনো শ্রীরামচন্দ্রের বাটীর চতুস্পার্শ্বস্থ গড় আছে। গ্রীষ্ম কালেও সেখানে প্রচুর জল থাকে। এবং নানা বর্ণের পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া স্থানটিকে অতি মনোহর ও সুন্দর দেখায়। একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ইহার নিকটে দেখা যায়। বহুদূর হইতে গ্রীষ্ম কালে লোকে সেই জলাশয়ের জল লইয়া যায়। এই স্থান হইতে অল্প পশ্চিমে বারবাজার নামক স্থানে অনেক বৃহৎ

পুষ্করিণী আছে সে গুলিও শ্রীরাম রাজার দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দারুণ অনাবৃষ্টির সময়ও সেগুলিতে প্রচুর জল থাকে। কোন কোনটিতে সান বাঁধা ঘাটের চিহ্ন দেখা যায়। প্রত্যেক পুষ্করিণীর উপর এক একটি শিব-মন্দির ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ এক শত আটটি পুষ্করিণী ও সেই সংখ্যক শিব-মন্দির ছিল বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। একটি মাত্র মন্দির আজো দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু তাহার চুড়াটি ১১৯৪ সালে পড়িয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। এ মন্দিরটিও পতনোন্মুখ। তবে ইহার মধ্যে এখনও কষ্টে যাওয়া যায়। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য কুড়ি হাত, প্রস্থও সেই পরিমাণে। উচ্চতা মাপিবার উপায় নাই। ইহার দেওয়ালের ভিত্তি আড়াই হাতেরও অধিক। মন্দিরটি দেখিয়াই মনে হয় যে, ইহা প্রাচীন হিন্দু-প্রণালীতে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দির নির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তবে এ বিষয়ের আলোচনা-কার্য্যে আমি অভিজ্ঞ নহি সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করিব না। এই মাত্র বলিতে পারি—এ-টি দেখিবার যোগ্য। এবং যশোহরের সর্ব্ব প্রাচীন মন্দির বলিয়া হাল আইন অনুসারে অবশ্য রক্ষণীয়। যাঁহারা একবার দেখিবেন তাঁহারা ইহার খিলানের গঠন দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিবেন। ইহার প্রাচীর-গাত্রে কয়েকটি প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। এরূপ প্রস্তর-স্তম্ভ যে কোথা হইতে এখানে আনীত হইয়াছে তাহাও বিচার্য্য। কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভ গুলি সম্ভবত শ্রীহট্ট বা চট্টগ্রাম হইতে আনীত হইয়াছে। কেননা নৌকা-পথে ভিন্ন ইহা আনিবার সুবিধা হইত না। ইহার অল্প দূরে নদী দেখা যায়। কাজেই নৌকায় লইয়া আসা সম্ভবপর বোধ হয়। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাননীয় ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব কৃত যশোহরের বিবরণের ১৫৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইয়াছে,—রাজা শ্রীরামচন্দ্র, রাজা মানসিংহের সাহায্য করিয়া ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র কমলনারায়ণ সর্ব্বস্ব হারাইয়া বোধখানায় যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নওপাড়ার কালীকান্ত বাবুর সংগৃহীত প্রবাদ হইতে যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু মুসলমান লেখকেরা বলেন যে, গোরাগাজী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ নগর ধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীরাম রাজার রাজ্য ধ্বংস করা হইয়াছিল। তাঁহাদের লিখন ভঙ্গীতে এরূপও বুঝিতে পারা যায় যে, যতদিন তাঁহারা বজ্রদ্বীপের শ্রীরাম রাজাকে নষ্ট

করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন ব্রাহ্মণ নগর ধ্বংস করা তাঁহাদের পক্ষে সুকর ও সহজসাধ্য হয় নাই। প্রবাদ দ্বারাও এই মত সমর্থিত হয়। আর এক কথা, বারবাজার প্রভৃতি স্থানে যাহারা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত অর্থাদি পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হুসেন সাহার সময়ের টাকা।

প্রবাদ-মতে রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পৌত্র ও পৌরজন বহু ক্লেশে বোধখানায় যাইয়া আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং কালীকান্ত বাবুর সংগৃহীত বিবরণে আস্থা স্থাপন করা যায় না। মুসলমান লেখকের উক্তির সহিত যখন প্রবাদের অনৈক্য নাই, তখন তাহাই গ্রাহ্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালীগঞ্জের নিকট মুসলমান সেনা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দক্ষিণ রায়, দক্ষিণ দেশস্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। সেই সময় পাঠান সেনাপতির গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাকে বাধা দেওয়ার জন্য রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজা শ্রীরাম অগ্রসর হইয়া পাঠান সেনাপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গোরাগাজী জলপথে বহু সৈন্য আনিয়া তাঁহার নগর আক্রমণ করিলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া রাজা রামচন্দ্রের পুত্র বজ্রদ্বীপ হইতে নিজ পরিজন ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বোধখানা নামক স্থানে পাঠাইলেন। পরে গোরাগাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র সংবাদ পাইয়া পুত্রের সাহায্যার্থ আসিলেন। কিন্তু পাঠান সেনাপতিও বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনিও এখন অবসর পাইয়া রামচন্দ্রের পশ্চাদ-নুসরণ করিলেন। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কাতরভাবে দক্ষিণ রায়ের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু দক্ষিণ রায় তখন রাজধাণী ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়াছিলেন। কাজেই মুকুট রায়ের জনৈক পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থ আসিলেন। যখন সাহায্য আসিল তাহার পূর্ব্ব দিবস ছয় দিন অনবরত যুদ্ধের পর শ্রীরাম ও তৎপুত্র বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণকারিগণ গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে, দেবমন্দির হইতে বিগ্রহ গুলি স্থানচ্যুত ও ভস্মীভূত করিয়াছে। হতাবশিষ্টগণের প্রতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা মৃত্যু স্বীকারের আদেশ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাজপুত্র ভৈরব নদের তীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গোরাগাজীও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। দক্ষিণ রায়ের অনুপস্থিতি রূপ সুযোগ পাইয়া সমবেত পাঠান সৈন্য ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিল। যাহা

ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। রাজা শ্রীরামচন্দ্র খাঁর বংশধরগণ এখনও গঙ্গানন্দপুর ও নওপাড়ায় আছেন। শোভাবাজার রাজবংশের সহিতও তাঁহারা জ্ঞাতি-সূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মায়ার বন্ধন

অন্তরে বাহিরে তীব্র পুতি গন্ধময়
পাপের উত্তাপে দেব, হয়েছি কাতর।
শৈশবে জননী-অঙ্ক করিয়ে আশ্রয়
ভাবিতাম স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহিক অন্তর।
শৈশব চলিয়ে গেল, দেহ দৃঢ়তর
হইতে লাগিল ক্রমে, স্বর্গ-লিপ্সু মন
ধরণীর পাপে তাপে হইয়ে জর্জ্জর
ভাবিতে লাগিল—ধরা সুখ-নিকেতন!
বার্দ্ধক্যে শিথিল দেহে জাগিল চেতনা,
মায়ার বন্ধন কিন্তু দেখি দৃঢ়তর!
হুতাশনে পতঙ্গের যেমন বাসনা,
তেমনি সংসার-লিপ্সা ছাইল অন্তর!
দাও দেব, কাটি' এই মায়ার বন্ধন,
চিরধাম—তব পদে করিগো গমন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

সরমা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে কবিরাজ আসিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, তাহাতে সকলেই বিষন্ন। সকলের প্রাণে একটা কালিমার গভীর রেখা পড়িয়া গেল। সকলেই শঙ্কিত। কবিরাজ যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা যথারীতি

চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগ আর ঔষধ মানিল না। দিন দিন শরীর জীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। সাহেব ডাক্তার আনা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পাড়ার সকলেই একে একে দেখিতে আসিল ও বিমর্ষভাবে ফিরিতে লাগিল। নবকৃষ্ণ আচার্য্য আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"আর না—এখনই গঙ্গা-যাত্রা করতে হবে।" রাত্রি দুইটার সময় তীরস্থ করা হইল। ভোর পাঁচটায় তিনি ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। দামোদরের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—একটা ভীষণ ক্রন্দনের রোল আসিয়া সকলকে তোলপাড় করিয়া দিল। হরিপদ শোকে একেবারে মুহ্যমাণ হইয়া পড়িল। শোক চিরস্থায়ী নয়। শোক যদি মানুষের হৃদয়ে সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে সংসার শ্মশান হইত। হাসি কান্না জগতের রীতি। এক আসিতেছে, আর এক যাইতেছে। পাঁচ ছয় দিবস পরেই হরিপদকে কোমর বাঁধিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যথা সময়ে প্রফুল্লের সাহায্যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে একটি দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গেল। মেনকা বারো ছাড়াইয়া তেরো বৎসরে পড়িয়াছে—আর রাখা যায় না। হরিপদ বিব্রত হইয়া পড়িল। সুপাত্র জুটিয়া উঠিতেছে না। অনেক চেষ্টার পর শ্যামবাজারের রসিকলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। পাত্রটি দু'টি পাশ করিয়াছিল, কাজেই রসিকবাবু দুই হাজার টাকা দর হাঁকিলেন। আজিকার দিনে উহা কিছু অসঙ্গত হয় নাই! তবে প্রফুল্লের পিতার অনেক অনুরোধে দেড় হাজারে নামিয়াছিল। রসিকবাবু নাকি বলিয়াছিলেন,—এত হীন অবস্থার লোকের কন্যা ঘরে আনিলে তত্ত্ব-তাবাসে সুখ হইবে না। সে যাহা হউক, এক শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

হরিপদর পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কতক শ্রাদ্ধাদিতে ও বাকী মেনকার বিবাহে ব্যয়িত হইয়া গেল—তাহাতেও বিবাহের সম্পূর্ণ খরচ সঙ্কুলন হইল না, কিঞ্চিৎ দেনাও করিতে হইল।

এক দিন আপিস হইতে বাহির হইয়াই হরিপদ দেখিল, একখানি "টেণ্ডম" লইয়া একটি ঘোড়া তীরবেগে ছুটিতেছে, উহার আরোহী একটি সাহেব ও একটি মেম। উহারা প্রাণ ভয়ে করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর।" উহা যেখানে গিয়া লাগিবে—ঘোড়াটি সেইখানে পড়িবে। গাড়িখানা চুরমার হইয়া যাইবে—আর সাহেব মেমের পরিণাম যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দর্শন মাত্রেই হরিপদ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া

গিয়া লাট সাহেবের বাটীর ফটকের নিকট গাড়ি খানিকে ধরিয়া ফেলিল। সাহেব ও মেম হরিপদকে শত ধন্যবাদ দিয়া তাহার নাম ও আপিসের ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন এগারোটার সময় উক্ত সাহেব ও মেম হরিপদর বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়া হরিপদকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিবার মত প্রকাশ করিলে, বড় সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিপদ আসিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সাহেব ও মেম পুলকবিহ্বলহৃদয়ে বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, এই লোকই কাল আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিল—বাঙালীর ভিতর এরূপ ভীম বলশালী সাহসী পুরুষ আছে, তাহা আমরা জান্‌তুম না। এই যুবক, বাঙালী জাতির গৌরব, তাতে সন্দেহ নাই।" বড় সাহেব হরিপদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ইঁহারা তোমাকে পারিতোষিকস্বরূপ কিছু দিচ্চেন, তুমি উহা গ্রহণ কর" বলিয়া এক খানি ৫০০ টাকার চেক টেবিলের উপর রাখিলেন।

হরিপদ নম্রভাবে বলিল,—"আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছি, পা..."

বড় সাহেব কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি বলচি, তুমি নাও—না নিলে উঁহাদের অপমান করা হবে, বুঝেছো।"

অগত্যা হরিপদ চেকখানি গ্রহণ করিয়া সাহেব ও মেমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপিসে আসিয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আপিসের বড় সাহেব হঠাৎ একদিন হরিপদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, হরিপদ, আমি তোমার কার্যতৎপরতা দেখে খুসী হয়েচি। তোমার বল বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পেয়েচি, আমার ইচ্ছা তোমাকে একটি ভাল চাকরীতে বাহাল করি; এখানে কেরাণীদের মাহিনা বড় কম। যদি তুমি বর্ম্মায় যেতে পার তা' হলে আমি তোমাকে একটি ১৫০ টাকা মাহিনার চাকরী দিতে পারি। তোমার মত কি?"

দেড় শত টাকা মাহিনার চাকরী শুনিয়া হরিপদর প্রাণটা এক নব আনন্দে ভরিয়া উঠিল—দেড়—শত টাকা—ইহা সে কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই,

কল্পনাতেও আনে নাই, সে উদ্বেলিতহৃদয়ে আবেগভরা প্রাণে বলিয়া উঠিল—"আমার বর্ম্মায় যেতে কোনো আপত্তি নাই।"

সাহেব সহাস্যমুখে বলিলেন—"এই তো আমি চাই। তবে আমি তোমাকে বাহাল করলুম বলে' সেখানে টেলিগ্রাফ করি ?" হরিপদ অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—করুণ।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তুমি জানো তোমায় কোথায় যেতে হবে, কি কাজ কর্‌তে হবে ?—একটু বিবেচনা করে স্থির হয়ে বল।" হরিপদ নম্রভাবে বলিল—"আমার বিবেচনা করবার কিছুই নেই আপনি যদি আমাকে বাঘের মুখে পাঠান তাতেও আমি রাজি আছি।" সাহেব হরিপদর চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত কাজেই বাহাল করচি—তোমাকে বর্ম্মার Executive Engineer Construation Branchএর Personal Assistant হয়ে থাক্‌তে হবে, পার্‌বে তো ?" "আজ্ঞে হাঁ—পারবো বৈকি!"

"বেশ—আমি তাঁর নিকট তোমার পরিচয় পত্রও পাঠিয়ে দেব; আজ থেকে তোমার ছুটী—পরশু তোমাকে রওন হ'তে হবে। কাল একবার আপিসে এসে তোমার এক মাসের অগ্রিম মাহিনা আর জাহাজ-ভাড়া নিয়ে যেয়ো।"

হরিপদ বড় সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চঞ্চলচরণে সোজাসুজি গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন স্তব্ধ—নীরব। বায়ুটা যেন আগুনের হল্কা মাখিয়া চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দুই একটি সাধা গলার বাঁধা সুর কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে—"ওগো বেলোয়ারি চুড়ি লেবে গো—ভালো ভালো খেলেনা চাই গো"—"জুতিয়ে শিলাই বুরুস বাবু"—"রিপু কর্ম্ম।" শেষোক্ত কথাটি ক্রমে এমন করুণ রাগিণীতে বাজিতে লাগিল যেন বোধ হইল, বেচারা প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেছে আর করুণস্বরে হাঁকিতেছে—"কি কু কর্ম্ম।"

মেজেতে মাদুর পাতিয়া মেনকা নিদ্রা যাইতেছে, ছেনু কখনো তাহার অঞ্চল লইয়া কখনো তাহার ক্ষুদ্র কর-পল্লব লইয়া কখনো বা তাহার আলুলায়িত কেশ গুচ্ছ লইয়া নানা ভঙ্গে সুদক্ষ বাজীকরের ন্যায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা দেখাইতেছে, কমলা তাহার শয়ন-কক্ষে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িতে পড়িতে

রোহিণীর জন্য শতমুখীর ব্যবস্থা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"আবাগী পোড়ার মুখী, রাক্ষসী তুই ম'লি না কেন? তা' হলে তো ভ্রমর গোবিন্দলালকে হারা'ত না।" এমন সময়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হরিপদ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এই অসময়ে হরিপদকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া কমলার প্রাণটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল, কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এমন সময় বাড়ি এলে যে? কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো।"

"না—মা কোথায়?"

"বাঁচলুম। মা ও-ঘরে ঘুমুচ্চেন ডাক্‌বো নাকি?"

"না ডাক্‌তে হবে না। আমি বুঝতে পার্‌চি না কমলা, এতক্ষণ কি আমি তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম—এখন হঠাৎ তুমি আমার একটি কথাতে প্রাণ পে'য়ে বেঁচে উঠ্‌লে—ধন্য তোমরা, এক কথায় মরো আর বাঁচো।"

"তোমার এখন ঠাট্টা পড়্‌লো—আমার ভয় হয়েছিল।"

"কিসের ভয় কমলা—কালথেকে যদি তুমি আমাকে আর দেখ্‌তে না পাও?"

কমলা মুখখানা ভার করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল;—"যাও যাও কেবল ঐ কথা, এখন কাপড় ছাড়ো, মুখে হাতে জল দাও"—বলিয়া কমলা হরিপদর ঘর্ম্মাক্ত কোটটি স্বহস্তে খুলিয়া লইল।

হরিপদ হাত মুখ ধুইয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিলে কমলা বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েচে বোল্‌বে না?"

"এমন কিছু নয়—তবে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি।"

"তোমার ও সব ঠাট্টা তামাসা আমার এখন ভালো লাগ্‌চেনা—কি হয়েচে স্পষ্ট করে বলো।"

"ঠাট্টা নয় কমলা—সত্যি সত্যি।"

"ঐ এক কথা—না বলো নাই বল্‌বে—আমি চলে যাই।"

হরিপদ মৃদু হাসিয়া করুণস্বরে বলিল—"যাও যাও, শুনিলে না—ব্যথিত বেদন—যাবে যাও, নাহি কিছু মোর।"

কমলা অধর-প্রান্তে একটু হাসি ফুটাইয়া কহিল,—"এই যে আবার কবি হ'লেন! আজ যে ভারি স্ফূর্ত্তি দেখ্‌চি হয়েচে কি বলোনা।"

"অম্‌নি কি বল্‌তে পারি?" বলিয়া হরিপদ সোহাগভরে কমলার হাস্যোজ্জ্বল

মুখের উপর একটি মধুর চুম্বন রাখিয়া দিল। কমলা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ একে একে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। কমলার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাহার কষিত কাঞ্চনের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখ খানা হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তাহার ভাসা ভাসা চোক দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—"না, যাওয়া তো হবে না—তিরিশ টাকায় আমাদের সংসার বেশ চল্‌বে।"

হরিপদ সে কথা কানে না তুলিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার মাতা দালানে মেনকার নিকট বসিয়া আছেন।

হরিপদর মাতা পুত্রকে অসময়ে বাটীতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েচে বাবা আজ আপিস থেকে——"

মাতার কথায় বাধা দিয়া হরিপদ বলিল,—"কিছু হয় নি মা, আমাকে মগের মুল্লুকে যেতে হবে। বড় সাহেব দয়া করে আমায় দেড় শো টাকা মাহিনার একটি চাকরি দিয়েচেন। আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নে'বার জন্যে সাহেব আমাকে ছুটী দিয়েচেন। কাল একবার আপিসে গিয়ে খরচ পত্র নিয়ে আস্‌বো পরশু ১০টার সময় রওনা হ'তে হবে।"

"থাম্ বাছা থাম্—মগের মুল্লক—সে কি হেথায়?—সেখানে তোমার চাকরি কর্‌তে যেতে হবে না।"

"সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে মা—এখন আর যাবো না বল্লে চল্‌বে না। আর এক শো পঞ্চাশ টাকা মাহিনা আমার মতন লোকের সম্ভব নয়। এ অদৃষ্টটা একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তে ক্ষতি কি আছে মা?"

"আমাদের কার কাছে রেখে যাবি বাবা! বুড়ো বয়সে আর দাগা দিস্‌নে। অন্ধের যষ্ঠি তোকে নিয়েই সংসার।"

"তুমি কিছু ভেবনা মা, আমি শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বো। আর প্রফুল্ল রইল--সেও যে, আমিও সে—দায়ে অদায়ে সে দেখ্‌বে— যখন তখন তোমাদের খবর নেবে।"

"যা ভালো বোঝো তাই কর বাপ্—আমি যেন তোমাদের রেখে মরতে পারি।"

হরিপদ আর সে কথার উত্তর না দিয়া একেবারে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। ভিতরে থাকিলে অনেক ব্যাঘাত। বেলা পাঁচটার সময় হরিপদ পাড়ার বন্ধু বান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া আসিল।

পরদিন যথাসময়ে হরিপদ বড় সাহেবের সহিত দেখা করিল, বড় সাহেব খাজাঞ্চিকে টাকা দিবার হুকুম দিলেন। হরিপদ প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া পাইয়া বড় সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একেবারে চাঁদনীতে আসিয়া দুই স্যুট কোট প্যাণ্ট টুপি মোজা—খান কয়েক ধুতি এক স্যুট বিছানা একটা বড় ট্রাঙ্ক এবং আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া বেলা তিনটার সময় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদ একটু বিশ্রাম করিয়া প্রফুল্লের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। প্রফুল্ল শুনিয়া বলিল,—"তা ভাই বিদেশে না গেলে উন্নতি হয় না। আর বর্ম্মায় তো আজকাল অনেকেই যাচ্ছে।"

হরিপদ প্রফুল্লের পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। পথে আসিতে আসিতে হরিপদ বলিল—"দেখ ভাই, আমি মা, মেনকা আর কমলাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্চি তুমি এদের দেখো, তুমি ছাড়া আর আমার আপনার কেউ নেই!" কথা কয়টি বলিবার সময় হরিপদর নয়ন-প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল হরিপদকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "ভাই আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমি আমার কর্ত্তব্য বুঝি। তুমি বৃথা চঞ্চল হয়ো না।"

এইরূপ কথায় কথায় প্রফুল্ল হরিপদর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে দেখিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—"মা করেন কি? কাঁদবেন না, হরিপদর অমঙ্গল হবে যে। আজকাল তো সকলেই বিদেশে চাকরি করতে যায়; আবার দু দিন পরে ফিরে আসবে। আর আমি তো রইলুম, আপনাদের কোনই অভাব হবে না। সর্ব্বদাই দেখে শুনে যাব।"

হরিপদর মা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"বোসো বাবা বোসো, আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে—আমি ভালো মন্দ কিছুই বুঝতে পারিনে। তা বাবা তুমি রইলে আমাদের একবার একবার দেখে যেয়ো। আমার হরিপদও যা তুমিও তাই।"

মেনকা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আসিয়া হরিপদর হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"দাদা তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে?"

হরিপদ সস্নেহে বলিল—"ছি মেনু কেঁদনা, আমি চাকরি করতে যাব; শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বো।"

মেনকা নতমুখে দাঁড়াইয়া আপনার বস্ত্রাঞ্চলটা অঙ্গুলীতে জড়াইতে লাগিল। কমলা এখনো দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তরল মুক্তার ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন-প্রান্তে আসিয়া দুলিতেছে—পড় পড় হইয়াও পড়িতেছে না।

কমলার প্রাণের ভিতর একটি সংগ্রাম চলিতেছে, প্রথমে সে স্থির করিয়া ছিল যে, কোনো রকমেই হরিপদকে যাইতে দিবে না। কিন্তু এখন সে ভাবিতে লাগিল—সে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কে? হরিপদ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—সে কেন তাহার পথের কণ্টক হইবে? যাহাতে হরিপদ এখন স্বচ্ছন্দমনে যাইতে পারে, তাহাই তাহার করা উচিত। কমলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ট্রাঙ্ক্‌টি টানিয়া লইল এবং একটি একটি করিয়া তাহাতে হরিপদর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় আসিবে বলিয়া হরিপদর মাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল।

নতমুখী মেনকার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া হরিপদ বলিল—"মেনু, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি নেবে এসো।" মেনকা হরিপদর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি দাদা।" হরিপদ একটা কাগজের বাক্সের মধ্য হইতে এক খানি পার্শিশাড়ী বাহির করিয়া মেনকার হস্তে দিল। মেনকা সাড়ীখানি এক-বার ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল,—"না দাদা এ আমি নেবোনা—এ বুঝি তুমি বৌদির জন্যে এনেচো।"

"না, ওখানি তোমার জন্যেই এনেচি—তার জন্যে আর এক খানি আছে।"

"কৈ দেখি।"

হরিপদ আর এক খানি দেখাইলে, মেনকা আনন্দে অধীর হইয়া উহা তাহার মাতাকে দেখাইতে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ আসিয়া তাহার মাতাকে বলিল—"মা, তোমাকে গঙ্গা-স্নান পূজা আহ্নিক কর্‌তে হয়, তুমি এই গরদের কাপড়খানা রেখো, আর এই সাড়ীখানা কৈলিসীকে দিয়ো।"

"কেন বাবা এখন এ সব কিন্‌তে গেলি কেন? চাকরি করে ফিরে এসে দিলে হত না?"

"মা, ফিরে এসে আবার দেবো—তত দিনে এ কাপড় ছিঁড়ে যাবে।"

কৈলিসী আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু, জায়গা হয়েচে খাবে এসো।"

হরিপদর মা কৈলিসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"এই নে কৈলিসী তোর দাদা-বাবু তোকে এই কাপড় দিয়েচে।"

কৈলিসী ভগবানের নিকট হরিপদর দীর্ঘ জীবন ও সোনার দোয়াত কলম কামনা করিয়া কাপড় খানি খুলিয়া দেখিল ছেঁড়া কাটা আছে কি না!

হরিপদ আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমলা আজ সাধ করিয়া বহুবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছে। "এ-টি খাও ও-টি খাও" বলিয়া একে একে সকল গুলি খাওয়াইতে লাগিল—হরিপদ দ্বিরুক্তি না করিয়া কমলার মনোরথ পূর্ণ করিল।

কমলা আজ একটু সকাল সকাল রান্নাঘর সারিয়া লইল। রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে নিজ গৃহে আসিয়া দেখা দিল। হরিপদ কমলার দিকে চাহিয়া বলিল—"ট্রাঙ্ক্‌টা বন্ধ যে—চাবি কোথায়?"

"চাবি—এই যে আমার কাছে, আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেচি।"

"খোলো তো দেখি—আমার মাথামুণ্ড কি করেছ।"

কমলা চাবি ফেলিয়া দিল। হরিপদ ট্রাঙ্ক্‌টি খুলিয়া দেখিল—যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেইটি পরিপাটীরূপে সাজানো রহিয়াছে।

"বা—বেশ হয়েচে" বলিয়া হরিপদ কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল—"আর কিছু রাখ্‌তে হবে কি?"

"না, আর কিছুই রাখ্‌তে হবে না, তবে সরা-চাপা এ হাঁড়িটাতে কি? এটা তো আমি এনেচি বলে বোধ হয় না।"

"ওতে গোটাকতক সন্দেশ আছে—জাহাজে তো জল খেতে হবে।"

কমলার দূরদর্শিতা দেখিয়া হরিপদ মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল এবং মুখে বলিল—"যদি দিয়েচ তবে থাক্ কাজে লাগ্‌বে বটে।"

হরিপদ ডাকিল—"কমলা!"

কমলার হৃদয়-তন্ত্রিতে সেই স্বরটা যেন বাজিয়া উঠিল। কমলা ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"কি।"

"আচ্ছা কমলা, আমি যাবো শুনে কাল তুমি কত কেঁদেছিলে—আর আজ আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কত উদ্‌যোগ আয়োজন করচো এর কারণ কি? তুমি আমাকে ভালোবাস না বুঝি?"

"তুমি আমাকে বাস ?"

"বাসি—হৃদয়টা যে দেখাবার নয়—নইলে দেখাতুম।"

"তা'হলে এমন অবস্থায় ফেলে চলে যেতে না।"

"কেন, মা রইলেন, মেনকা রইল—প্রফুল্ল যখন তখন এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাবে—সে আমার ছোট ভা'য়ের মত—আর কি চাও ?"

"না আর কিছু চাই নে—তবে পুরুষের প্রাণ বড় কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।"

"তারপর—আর কিছু আছে ?"

"তুমি সাহসী বীর—তুমি আজ আমাদের জন্যে—সংসারের উন্নতির জন্যে কোথাকার কোন অজানা দেশে চলেচ—আর আমি কিনা তোমার পথের কণ্টক হয়ে পথ আগ্‌লে পড়ে থাক্‌বো। ছি—তা তো পারবোনা—তাই আজ প্রাণটাকে পুরুষ অপেক্ষাও কঠিন ক'রছি—পাষাণে বেঁধেছি।"

"তোমার বক্তৃতা শুনে আমি খুসী হলুম বটে, কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-টা 'টাউন হল' নয় এখানে শ্রোতা কেউ নাই। এ-টা গরীবের কুটীর" বলিয়া হরিপদ কমলাকে আপনার হৃদয়ে টা নিয়া লইল।

অসহায় কমলা যেন মস্ত একটা সহায় পাইল। তরুলতা যেন শাল তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। গঙ্গা যেন সাগরে আসিয়া মিলিত হইল। মরুভূমে যেন ফল্‌গু নদী বহিয়া গেল! কমলা কাঁদিয়া ফেলিল কে যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দিল। প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল!

"কমলা, এ কি হ'ল—পাষাণের ভিতর এত জল ছিল" বলিয়া হরিপদ কমলার অশ্রুসিক্ত মুখের উপর সাদর চুম্বন করিয়া তাহার মস্তকটি আপন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। কমলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; সে হরিপদর আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

পরদিন সতাটার মধ্যে হরিপদর বাটী তাহার বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ হইয়া গেল। হরিপদ সকলকেই সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিল। নয়টার মধ্যে হরিপদ আহারাদি সারিয়া প্রফুল্ল ও অপর কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া জাহাজাভিমুখে যাত্রা করিল। হরিপদর মাতা চক্ষু মুছিতে মুছিতে রোরুদ্যমানা মেনকার হস্ত ধারণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং হরিপদর মঙ্গল কামনা করিয়া পূজা মানসিক করিলেন। কমলা ছাদের উপর থাকিয়া হরিপদর গাড়ির দিকে নির্ণিমেষ-

নয়নে চাহিয়া রহিল। গাড়িখানি যখন তাহার দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল এবং নিজ কক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া ভূমি-শয্যায় লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। প্রাণ ভরিয়া খানিকটা কাঁদিয়া লইল —সেই পূত সলিলে হৃদয়ের মলিনতা ধুইয়া গেল—হৃদয়টা একটু হাল্কা হইল। তখন কমলা উঠিয়া বসিল এবং যুক্তকরে ভগবানের নিকট কাতর প্রাণের কি ব্যথা জানাইল কে জানে! সে দিন বাড়িটা যেন নীরব নিস্তব্ধ শোকের ঘন ছায়ার ভিতর আত্মহারা! (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ-সংবাদ

"ভারতে ইংরাজ রাজত্ব, বিধাতার বিশেষ বিধান," তাহাতে আমাদের বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা আজ আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী যে এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ ভারতে আসিয়াছেন; আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনাগুলিকেও জনসাধারণের সংস্কার, (কুসংস্কার) কত দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিল——কি আশ্চর্য্য!! যে অভ্রান্ত নিয়মে জগৎ-কার্য্য চলিতেছে, ভূমিকম্পও কি সেই অভ্রান্ত নিয়মের ফল নহে? রাজা আসিতেছেন বলিয়াই কি ভূমিকম্প হইল? আর তাহাতেই বা কুলক্ষণ কি? হায়! কত শত বিজ্ঞানবিদ্‌ও যে এই পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার-বশবর্ত্তী! যাক্ সে কথা, তাই বলিতেছিলাম কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজা রাণী আসিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহার মুখে কোন্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণীটি শুনিবার জন্য আশা করিয়াছিলাম?——সম্রাটের আগমনে ভারতবাসী জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে একটি বিশেষ আনন্দলাভের প্রয়াসী হইয়াছিল। সে আনন্দ-সংবাদ কি? "বঙ্গভঙ্গ রহিত" তাই কি নিশ্চয় আশা ছিল? কত সন্দেহের মধ্যে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এ যে বিধাতার বিশেষ বিধান!! যাহা এতদিনে কিছুতেই হয় নাই, এমন কি মর্লি সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিয়া ছিলেন ইহা Settled fact (অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা) কিন্তু আজ ভারত সম্রাট ভারতে আসিয়া নিজ-মুখে বলিলেন—"বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল।"

বঙ্গ আর ছোট লাটের অধীন রহিল না, এখন সমগ্র বঙ্গ একজন সকৌন্সিল গভর্ণরের অধীন হইল। আর এতদিন যে বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলার পার্শ্বে পড়িয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে একজন পৃথক ছোটলাটের অধীন হইল। রাজধানী দিল্লী হইল। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতেছেন কলিকাতার —সুতরাং বাংলার ক্ষতি হইল; কিন্তু এ কথাটি আপাত দৃষ্টিতে কিছু সত্য হইলেও সেই কত কালের ঐতিহাসিক দিল্লীর (হস্তিনাপুর) পুনরুত্থান ভারতের অকল্যাণকর বলিয়া মনে হয় না।

স্থানীয় সংবাদ

আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকটি শোকের আঘাৎ পাইয়া এখন প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এই ঘটনা তাঁহার পক্ষে যে বড়ই ক্লেশকর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সংসারের কোনো অবস্থাতেই আমরা ভগবানের কৃপায় অভাব স্বীকার করিতে পারি না, তাঁহার পাদপদ্মের নিকটস্থ করিবার জন্য তিনি শোক তাপ প্রেরণ করেন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে জনমে মরণের মধ্যেও তাঁহার ইচ্ছার জয় হউক। ভগবান তাঁহার ক্রোড়স্থ কন্যার আত্মাকে শান্তি-ধামে স্থান দান করুন এবং পরিবারবর্গের মধ্যে এ সময় শান্তি বিধান করুন।

১২ই ডিসেম্বর রাজা রাণীর সম্মানার্থে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী হইতে আনন্দোৎসব হইয়াছে। হস্তী-পৃষ্ঠে রাজা রাণীর ছবি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, এবং কাঙালী ভোজন, আলোক-মালা দান প্রভৃতি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের 'কুশদহ'র প্রথম পৃষ্ঠায় 'প্রার্থনা' শীর্ষক যে কবিতাটি বাহির হইয়াছে, ভ্রমক্রমে উহার নীচে 'শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী' এই নামটি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উহা তাঁহার রচিত নহে।

তৃতীয় বর্ষ] মাঘ, ১৩১৮ । [১০ম সংখ্যা

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



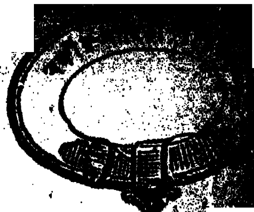
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত ।

(চিত্র-পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ-কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

৩য় বর্ষ। মাঘ, ১৩১৮ ১০ম সংখ্যা।

গান

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নয়রে কঠিন, কোন দিন, জননী আমার।
নিরাশ অন্তরে তবে কেন মন তুই কাঁদিস আর।
মা যদি সন্তানে মারে,
কে বল রাখিতে পারে?
কিন্তু মায়ের প্রহারে বিনাশে দোষ দুরাচার।
বনের পশু দুষ্ট ছেলে,
ভাল কি হয় মা'র না খেলে?
মেরে ধ'রে লবেন কোলে আদর করে মা আবার।

(ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন।)

দ্বৈতাদ্বৈত ভাব

পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যে বস্তুগত এক—জগৎ ও জীব যে সেই ভগবানেরই প্রকাশ এ কথা একপ্রকার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। যেমন এক "কুঁদা" মিছিরি আর এক "দানা" মিছিরি, সমুদ্রের সমগ্র জল আর তাহার এক বিন্দু জল, স্বাদে একই কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন, তেমন পরমাত্মা এবং জীবাত্মা স্বরূপগত এক, কেবল পরিমাণে ভিন্ন। পরমাত্মা অনন্ত, জীবাত্মা ক্ষুদ্র। পরমাত্মার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্যের শেষ নাই, কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্যের সীমা আছে। সুতরাং এইখানে একটি গভীর ভেদও আছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে ভেদ তাহা দুই প্রকার; একপ্রকার অজ্ঞানতা জনিত, আর এক প্রকার ভেদ মৌলিক। অজ্ঞানতার আমি—স্থূল আমি—শারীরিক আমি এবং সমুদয় স্থূল "আমি আমার" ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাধন-পথে আরোহণ করিলে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। আর মৌলিক আমি—আত্ম-বোধ, আপনাকে আপনি প্রতীতি করা, ইহাই জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য (Personality)। তাই শিক্ষা-সংস্কার-বিরহিত সদ্যজাত শিশু, ক্রন্দন করিয়া আত্ম-বোধ জ্ঞাপন করে। কিন্তু জড়, আপনাকে আপনি জানে না। মানবাত্মা চৈতন্য-পদার্থ, সে আপনাকে আপনি আত্ম-জ্ঞানে জানে। এই জ্ঞানই সকল বস্তু-বোধের মূল কারণ, সুতরাং জীবাত্মা এই আত্ম-বোধের দ্বারাই পরমাত্মার জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

এ দেশ-প্রচলিত অদ্বৈতবাদের কথা বলিলে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন। "সোঽহং" কিম্বা "শিবোঽহং" এই ভ্রান্ত মতের ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু মানুষ কখনই ভগবান্ হয় না,—কোনো মানুষই ভগবান নহে; যতবড় সাধু মহাপুরুষ হউন, কেহই পূর্ণ ভগবান নহেন, একথা সকলে বোঝেন না, কেহ কেহ বোঝেন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী সাধক, তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলেও বুঝিবেন যে, অত্যন্ত উচ্চাবস্থাতেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দৃষ্ট হয়। আবার অনেকে মনে করেন —"যত দিন 'পূর্ণ সমাধি' 'নির্ব্বাণ মুক্তি' না হয়, তত দিনই এই ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তিতে আর ভেদ থাকে না।" এ কথাও সত্য নহে। দুই না হইলে যোগ হয় না। যদি বলি, "পূর্ণ যোগে আত্ম-বোধ তো থাকে না"; হাঁ, এ কথা

সত্য বটে ; তখন কেবল মগ্নাবস্থা—আনন্দে আনন্দাবস্থা ; কিন্তু এই খানেও সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে হইবে, এক পূর্ণানন্দ সত্বায় ডুবিয়া আর এক সত্বা আনন্দিত হইতেছে। এক সত্বা স্বয়ং আনন্দময় হইতে পারেন, কিন্তু এককে দেখিয়া আর এক আনন্দিত হইতে হইলে দুই সত্বার প্রয়োজন। মূলে এই দুই সত্বা যদি স্বরূপগত এক না হইত, তবে যেমন এক আর এককে কথনই বুঝিতে পারিত না, তেমন মূলে দুই সত্বা পৃথক না হইলে, এক আর এককে ভোগ করিতে—উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারিত না।

তারপর আর একটি গুরুতর কথা এই যে, "নির্ব্বাণ মুক্তি" অর্থে "আমি আমার" ইত্যাকার জ্ঞানের বা স্থূল আমিত্বের নির্ব্বাণ হইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু কোনো কালে দুই সত্বার যোগ বা সম্ভোগের শেষ হইতে পারে না। অনন্ত-কাল এই যোগ এবং ক্রমোন্নতি চলিবে। কেন না, আজ যাহা আছে, আর কোনো কালেও যদি তাহা না থাকে, তবে তাহা নিত্যবস্তু হইতে পারে না। জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিত্য, জীবাত্মা পরমাত্মা সাপেক্ষ নিত্যবস্তু, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মা অনন্ত কাল থাকিবে। সুতরাং জীবাত্মাও নিত্য। আর জগৎ ও জীবাত্মা, এ উভয়ই ভগবানের প্রকাশ, কিন্তু জগৎ ও জীবাত্মায় একটি ভেদ আছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার স্বরূপগত জ্ঞান-বস্তু, আর জগৎ, আত্ম-বোধ রহিত, সুতরাং জড় বস্তু। জড় বস্তুর প্রাণ আছে, শক্তি আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই—আত্ম-বোধ নাই। জীবাত্মা, পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রকাশ, আর জগতের তাবৎ জড় বস্তুর মধ্যে, পরমাত্মার জ্ঞান-কৌশল, শক্তি, সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশ পাইতেছে।

এখন দেখিতে হইবে এই যে—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ, ইহা কি ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে।

প্রথমে জ্ঞান যোগ, এবং ধ্যান সাধন ; যাহা উপনিষদ্-যুগে সাধিত হইয়াছিল। তখন পরমাত্মার নিষ্ক্রিয় শান্ত ভাব উপলব্ধি করা, স্বরূপ সাধন করা এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ করাই উদ্দেশ্য ছিল। "আনন্দ রূপমমৃতং" "রসো বৈ সঃ" আত্মাতে পরমাত্মার আনন্দ-স্বরূপ—রস-স্বরূপ উপলব্ধি করাই তখনকার প্রধান সাধন ছিল। যখন এই আন্তরিক সাধনার ভাব প্রবল ছিল, তখন-বহির্জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন ভাব স্বভাবত আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্যাগের পথই একমাত্র প্রশস্ত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় ত্যাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু যখন এই সাধনার ভাব পুষ্ট হইল, তখন এই জগতের সমস্ত তত্ত্ব সেই জ্ঞানের

আবেষ্টনে লইবার আয়োজন হইল। অন্তর্জগতের দৃষ্টি ধীরে ধীরে বহির্লীলায় প্রকট হইতে লাগিল। কিন্তু তখনো দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া সাধন চলিল।

তত্ত্বজ্ঞ সাধক দেখিলেন, শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে মাতৃক্রোড়ে, মাতৃ-স্নেহ পাইয়াই বর্দ্ধিত হয়। তারপর পিতার প্রেম এবং ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজনের প্রীতির মধ্যে—সমগ্র মানব সমাজের প্রীতির মধ্যে সে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হয়। সাধক দার্শনিক-চক্ষে দেখিলেন এই প্রেমের মূল কোথায়? যে আত্ম-বোধের মূল অনন্ত জ্ঞান, এই খণ্ড খণ্ড প্রেমের মূলও সেই অনন্ত প্রেম। তিনি যেমন জ্ঞানময়, তেমনই প্রেমময়। সেই একই প্রেম বহুরূপে লীলা করিতেছে মাত্র। সুতরাং এ সকল কেবল মায়া নহে। এই সংসার পরিত্যাজ্য স্থানও নহে, এ যে মহা সাধন-ক্ষেত্র। তখন সমস্ত ভাবগুলিকে ভগবৎ প্রেমের মধ্যেই দর্শন করিবার যুগ আসিল—ভক্তি-ধর্ম্ম সাধনের দিন আসিল। উপনিষদ-যুগে প্রধানত শান্তভাব সাধনের পর, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব সাধন চলিল। সুতরাং এক একটি সম্বন্ধ বাচক ভাবের ভিতর দিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন্ সূত্রে সেই অখণ্ড ব্রহ্ম-জ্ঞান, খণ্ডভাব ধারণ করিয়া ভারতের ধর্ম্মে এত ভেদ-নীতি, প্রবেশ করিল তাহার আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। দাস—

শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থান

পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্য ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কি অলৌকিক কৌশলে মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর। যে দুই বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে আমার সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সেই রূপ দুই বস্তুর সংমিশ্রণে কত রথী মহারথীর উৎপত্তি হইতেছে। সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তির কি মহা প্রভাবে জীবের জন্ম-মরণ রূপ প্রবাহ কত যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তুমি আমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, কি বুঝিব?

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানানুসারে শিশু, জননী-জঠরে নয় মাস দশ দিন অবস্থান করিয়া যথা সময়ে ভুমিষ্ঠ হইয়া থাকে। আমরা কতকগুলি বাহ্য লক্ষণা-

বলী দেখিয়া গর্ভধান-কাল নির্ণয় করি। গর্ভাধান হইতে প্রসব-কাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীর অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগিনী হইতে হয়; যেহেতু এই সময়ে তাঁহারই স্বাস্থ্যের উপর শিশুর জীবন-মরণ নির্ভর করে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় স্নান, আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, গৃহকর্ম্মাদি করণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মিতাচারিণী হইয়া কালযাপন করাই সুব্যবস্থা। গর্ভিণী তাঁহার অভ্যাসমত স্নান করিবেন। স্নানান্তে সিক্ত বসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সত্বর সমস্ত গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন। পুরাতন চাউলের অন্ন, সহজপাচ্য ব্যঞ্জন, টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ প্রভৃতি লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণমত আহার করিবেন। গুরু ভোজন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আমাদের দেশের প্রাচীনারা কিন্তু এই মতের পরিপন্থিনী। তাঁহারা বলেন সহজ অবস্থায় যে আহার করা যায়, গর্ভাবস্থায় তদপেক্ষা আহার বৃদ্ধি না করিলে গর্ভস্থ-শিশুর কি উপায়ে পরিপোষণ হইবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত। পরিমিত আহার দ্বারা গর্ভিণী সুস্থ ও সবল থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির অভাব হয় না। অপর পক্ষে সন্তানের দোহাই দিয়া আহারের মাত্রাটি দ্বিগুণ করিয়া তুলিলে, অথবা গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় উদরাময়, আমাশা, পেটকামড়ানি প্রভৃতি পীড়া, হওয়া ভাল নহে। এই সকল রোগ হইতে গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব যে গর্ভিণী নিজের ও সন্তানের মঙ্গলকামিনী, তিনি যাহাতে গর্ভাবস্থায় পরিপাক-বিকার না জন্মে তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক পূর্ণগর্ভা হইলে তাহাকে "সাধ" দিবার একটি প্রথা আছে। "সাধভক্ষণ" করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে গর্ভিণীকে ইচ্ছামত পায়স পিষ্টকাদি রসনাতৃপ্তিকর নানাবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়া হয়। একে এই সময়ে গর্ভিণীর শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভাল থাকে না, তাহার উপর হঠাৎ এক দিন গুরুভোজন করিয়া কখন কখন "সাধে" বিষাদ ঘটিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন করা ভাল বটে কিন্তু হঠাৎ এক দিন এরূপ গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় ব্রত নিয়মাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে গিয়া অভুক্ত থাকা ভাল নহে। গর্ভিণীর ক্ষুৎপিপাসা উপস্থিত হইলে অবিলম্বে তাহা নিবারণ করা উচিত।

আহারান্তে গর্ভিণী কিছুকাল বিশ্রাম করিবেন। ইহাতে পরিপাক-ক্রিয়া সমুন্নত হয়। দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ সকলের পক্ষেই অহিতকর। দিবা-নিদ্রায় শরীরের স্বচ্ছন্দতা তিরোহিত হয় এবং নৈশনিদ্রার প্রতিবন্ধকতা ঘটে। বিনিদ্রনয়নে রাত্রি যাপন করিলে নানাবিধ পীড়া হয়। গর্ভিণীর কোষ্ঠশুদ্ধি থাকা আবশ্যক। দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অকালপ্রসব অথবা কষ্টকর প্রসব হইতে পারে। সুপথ্যের দ্বারা গর্ভিণীর কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ করাই ভাল। ডুমুর, পেঁপে প্রভৃতি তরকারি এবং সুপক্ক ফলের রস খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে রোগিনীকে 'ক্যাষ্টর অয়েলে'র জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় অন্য কোন উগ্র বিরেচক জোলাপ-ঔষধ দিতে নাই। অত্যধিক ভেদে গর্ভস্রাব হওয়া অসম্ভব নহে। অনেকের সংস্কার আছে যে, গর্ভাবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এই সংস্কার নিতান্ত ভিত্তিহীন। যে সমস্ত ঔষধ সাক্ষাৎ বা পরম্পরিত ভাবে গর্ভাশয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তৎসমুদয় বর্জ্জনীয় বটে, কিন্তু অপরাপর নির্দ্দোষ ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বাধা নাই।

গর্ভিণীর প্রাতর্বমন অতি কষ্টকর ব্যাধি। যে সকল স্থলে বমিত পদার্থের সহিত পিত্তের অংশ না থাকে অথবা বমন না হইয়া কেবলমাত্র বমনেচ্ছা থাকে, সে সকল স্থানে পরিপাক-যন্ত্রের অবস্থান্তর ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। পাকস্থলীর উত্তেজনা বশত ঐ রূপ বমন বা বমনেচ্ছা হয়। কিন্তু যে সকল স্থলে পিত্তসংযুক্ত বমন হয়, শিরঃপীড়া ও সমল জিহ্বা থাকে, তথায় গর্ভিণীর পাক-যন্ত্রের বিকার উপস্থিত হইয়াছে বুঝিবেন। প্রথম প্রকারের প্রাতর্বমনে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই এক পেয়ালা উষ্ণ দুগ্ধ অথবা তদভাবে উষ্ণজল পান করিলে উপকার হয়। দ্বিতীয় প্রকারের পীড়ায় কোষ্ঠশুদ্ধি করিবেন। তদ্দ্বারা উপকার না দর্শিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় পরিধেয় বসনাদি সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখিবেন। ভ্রূণের বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর উদর ও স্তনদ্বয় স্থূল হইতে থাকে। সুতরাং অন্তঃসত্ত্বা নারী এমতভাবে বেশভূষা পরিধান করিবেন যাহাতে ঐ সকল স্থানে চাপ না পড়ে। ধনবানদিগের গৃহে প্রায়ই দেখা যায় গর্ভিণী দাস-দাসী-পরিসেবিতা হইয়া নিয়ত অলসভাবে বসিয়া থাকেন। এ নিয়ম ভাল নহে। গর্ভাবস্থায় নিয়মিত পরিশ্রম করা উচিত। ইহাতে প্রসব-ক্লেশ কম হয়। বঙ্গের সাধারণ দরিদ্র রমণীগণের প্রসব-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা

উপলব্ধি হইবে। অতিরিক্ত শ্রমও গর্ভিণীর পক্ষে হিতকর নহে। গর্ভাধান কাল হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। এই সময়ে অনেক গর্ভ নষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন, কষ্টকর যানারোহণ, স্পর্শাক্রামক রোগীর নিকট গমন প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গর্ভিণী সুপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, মনোহর বাক্যশ্রবণ ও নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শন করিয়া কালযাপন করিবেন। যাহাতে মনোমধ্যে কোনক্রমে ভয়, শোকাদি উপস্থিত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকিবেন।

সাধারণত চতুর্থ মাস হইতে পঞ্চম মাসের মধ্যে গর্ভিণী উদরে শিশুর সঞ্চলন অনুভব করেন। এই সময়ে তাঁহার পেটের উপরে কান পাতিয়া শুনিলে শিশু-হৃদয়ের টিক্ টিক্ শব্দ কর্ণগোচর হয়। সচরাচর নাভীর কিছু নিম্নে বামদিকে এই শব্দ হইয়া থাকে। এই স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। গর্ভে যমজ সন্তান থাকিলে দুইটি শিশু-হৃদয়ের শব্দই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গর্ভ লক্ষণাবলীর মধ্যে এই দুইটি-ই নিশ্চিত লক্ষণ। গুল্ম বায়ু প্রভৃতি রোগে স্ত্রীলোকের অধিকাংশ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে: এমন কি গর্ভস্থ বায়ুর ইতস্তত গতিবিধিতে রোগিণী শিশু নড়িতেছে বলিয়া ভ্রম করেন। গর্ভিণী যে সময়ে শিশুর সঞ্চলন অনুভব করেন, সেই সময়ে তাঁহার গর্ভোপরি কান পাতিয়া যদি শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনা না যায় তাহা হইলে ঐ গর্ভ মিথ্যা। উঁহা নিশ্চয় পীড়া বিশেষ বলিয়া ধারণা করিবেন। প্রসবের এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে গর্ভিণী উপর-পেট কিছু হাল্‌কা বোধ করেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুনঃ পুনঃ মলমূত্রত্যাগেচ্ছা হইয়া থাকে। এই লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিবেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। প্রসব-কাল নির্ণয় করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। এই উপায় সকল স্ত্রীলোকেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। যে তারিখে গর্ভিণী শেষ ঋতুস্নাতা হইয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখিবেন; কারণ তদ্দিবস হইতে নয় মাস দশ দিন গণনা করিলেই প্রসব-দিন অবগত হওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই চারি দিন অগ্রে বা পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে।

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীদিগের কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কখন কখন এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। গৃহস্থ হঠাৎ এই বেদনাকে প্রসব-বেদনা বলিয়া মনে করেন উভয় বেদনার প্রভেদ-লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রকৃত বেদনা।	অপ্রকৃত বেদনা।
১। বেদনা কটি দেশের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে আসে। পরে তথা হইতে উরুদেশে চলিয়া যায়।	১। বেদনা কটি দেশের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া পশ্চাতে চলিয়া যায়।
২। বেদনা ক্রমে ঘন ঘন ও অধিক হইতে থাকে।	২। বেদনা কখন অল্প, কখন বা অধিক অনুভূত হয়।
৩। কিছুতেই বেদনার উপশম হয় না।	৩। পিচ্‌কারী দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ দূর করিলে বেদনা থাকে না।
৪। গর্ভাশয় হইতে আঁটাবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে।	৪। আঁটাবৎ পদার্থ নির্গত হয় না।

জ্বর, উদরাময়, আমাশা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ হইলে কখন কখন প্রসব-বেদনার ন্যায় এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। অতি হর্ষ, ভয়, শোক, দুঃখাদি হইলেও ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। গর্ভস্রাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র গর্ভিণীকে শয্যা গ্রহণ করিতে বলিবেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত মলমূত্রত্যাগের জন্যও কখন শয্যা হইতে উঠিতে দিবেন না। তাঁহার শয়ন-গৃহটি যেন যথোচিত ঠাণ্ডা হয়। দুগ্ধ, দুগ্ধ-সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য শীতল অবস্থায় রোগিনীকে খাইতে দিবেন। উষ্ণ খাদ্য-পানীয় এ সময়ে দিতে নাই। শীতল জল ও বরফ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইলে অল্পমাত্রায় "ক্যাষ্টর অয়েল" খাওয়াইয়া অন্ত্র পরিস্কৃত করিবেন। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু এ অবস্থায় গর্ভস্রাব এক প্রকার দুর্নিবার্য্য।

কোন কোন গুর্ব্বিণী রমণীর বারম্বার একই সময়ে গর্ভনষ্ট হয়। আবার কেহ কেহ মৃতবৎসা হইয়া থাকেন। এতদুভয়ই রোগ বিশেষ। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ রোগিনী এই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত বিফল চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহাতে সুদীর্ঘকাল গর্ভাধান না হয় এবং মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলে এই রোগের শান্তি হইয়া তিনি সুপুত্র-জননী হইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সরমা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল যথাসময়ে বি-এল পাশ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে যথেষ্ট পসার জমাইয়াছে, তাহার এখন বেশ দশ টাকা উপায়ও হইতেছে। সকলেই তাহার বাক্‌পটুতায় মুগ্ধ। বিশেষ যখন সে বিচারপতির নিকট অঙ্গসঞ্চালনপূর্ব্বক ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা (Plead) করিতে থাকে তখন অপরিচিত লোকমাত্রেই তাহাকে হাইকোর্টের বড় কাউন্‌সলী (Bar-at-law) মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কাজেই প্রফুল্লের পশার বাড়িতে বিলম্ব হইল না।

যথারীতি হরিপদর পত্র আসিতে লাগিল। সকলের আশঙ্কা দূর হইল। প্রতি মাসে হরিপদ ত্রিশ টাকা করিয়া সংসার খরচের জন্য প্রফুল্লের নামে পাঠাইতে লাগিল। এখন আর প্রফুল্লকে অন্দরে আসিবার সময় মেনু মেনু বলিয়া ডাকিতে হয় না। কমলা আর প্রফুল্লকে দেখিয়া দরজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায় না। তবে মাথার কাপড়টা কিঞ্চিৎ টানিয়া দেয় মাত্র। মেনকা আর তাহাকে এখন ফুলবাবু বলিয়া ডাকে না। পিফুদাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকে। প্রফুল্ল এখন ঘরের ছেলের মত সর্ব্বদাই হরিপদর বাটীতে আসা যাওয়া করিয়া থাকে। এখন সে নিজ হস্তে এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে চালাইতেছে। কি আছে, কি নাই, নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকল অভাব দূর করিবার কষ্টটুকু অবাধে সহ্য করিতেছে। ইহাতে তাহার নির্ম্মল চিত্ত একটা স্বভাবিক আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিত। সে যাহাকিছু করিত তাহা সে কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিত। প্রফুল্ল ইতিমধ্যে হরিপদর পুরাতন ঘর গুলির জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া দিল। মেনকা প্রফুল্লকে পাইয়া বসিল, তাহার বালিকাসুলভ ছোটো ছোটো আব্‌দারগুলি রক্ষা করিতে প্রফুল্লের অনেক কার্য্যের ক্ষতি হইত। কিন্তু সে মেনকাকে আপনার ছোটো ভগিনীটি ভাবিয়া তাহার শত আব্‌দার মাথায় করিয়া লইত এবং সহ্য করিত। ছুটী-ছাটা থাকিলেই মেনকার আব্‌দারমত প্রফুল্লকে আসিতে হইত এবং তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি দেখাইয়া আনিতে হইত। এমনিভাবে তাহাদের সংসারটি প্রফুল্লের

যত্নে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। অভাব অনাটনের মর্ম্মভেদী হাহাকার দূরে সরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত খরচ পত্র হরিপদর ত্রিশ টাকায় কুলাইত না। প্রফুল্ল যেমন উপায় করিত, তেমনি ব্যয় করিতে ভালোবাসিত। সঞ্চয়ের লালসা তাহার আদৌ ছিল না।

একদিন অপরাহ্ণে প্রফুল্ল আসিয়া হরিপদর মাতাকে বলিল—"মা, আজ মেনুর চুড়ী এনেচি।"

হরিপদর মাতা মালা জপিতে জপিতে বলিলেন—"আঃ বাঁচালে বাবা! মেনুর শ্বশুর সে দিন পর্য্যন্ত লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েচে যে, 'চুড়ী দেওয়া হবে কিনা, বিয়ের সময় দেবার কথা ছিল এখনো হল না! সব জুয়াচুরি নাকি?' বাবা! মিন্সের কী মন! টাকার হাণ্ডিল নিয়ে বসে আছে—তবু আমাদের এই একরত্তি সোনার জন্যে যেন হাঁ করে রয়েচে, লোকের উপর লোক আসচে, আর কত খোঁটা!"

"টাকা থাক্‌লে কি হয়, মা, লোকটার মন বড় নীচ।"

মেনকা কোথায় ছিল কে জানে, চুড়ীর কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দেখি, পিফুদা কেমন চুড়ী হয়েচে?" প্রফুল্ল গম্ভীরভাবে বলিল—"কৈ চুড়ী কোথা?" "আমি যে শুনলুম চুড়ী এনেচ" বলিয়া মেনকা প্রফুল্লের পকেট অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হরিপদর মাতা মেনকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"অত ঝাঁপাই ঝুড়চিস কেন, একটু থির হ' না; এনে থাকে তো পাবি এখন।" মেনকা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল।

প্রফুল্ল তাহার সার্টের পকেট হইতে সবুজ কাগজে মোড়া এক জোড়া চুড়ী বাহির করিয়া হরিপদর মাতার হস্তে দিয়া মেকনার দিকে চাহিল—মেনকার মৌন ম্লান মুখখানা তখন বালিকাসুলভ সরল সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার মাতার নিকট বসিল এবং চুড়ী জোড়াটির কারুকার্য্যের পারিপাট্য দেখিতে লাগিল।

প্রফুল্ল পকেট হইতে আর এক জোড়া চুড়ী বাহির করিয়া বলিল—"মা, এই জোড়াটা বৌদির জন্যে এনেচি—বৌদির হাতে কাচের চুড়ী দেখ্‌লে মনে বড় কষ্ট হয়।"

হরিপদর মাতা বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এ চুড়ী কি করে হ'ল বাবা, হরিপদ তো কেবল মেনুর চুড়ীর জন্যেই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছিলো—তবে?"

"সংসার খরচ হয়ে যে টাকা বাঁচতো তা'তেই হয়েচে।"—"তাও কি হয়? এ চুড়ী জোড়াটা ক' ভরি?"—"বারো ভরি।"

"বারো—ভ–রি! এর দামতো সামান্য নয় বাবা, তুমি নিশ্চয়ই নিজেই টাকা দিয়েএনেচ; কেমন?"

"তাই যদি হয় মা,—আমার টাকা কি আপনার টাকা নয়? আপনি কি আমাকে পর ভাবেন—আমি শৈশবে মাতৃহীন হয়ে মা বলে' ডাক্‌তে পাইনি – এখন আপনাকে পেয়ে আমার সে অভাব দূর হয়েচে"—প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। হরিপদর মাতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"তা নয়, বাবা সংসারে বিপদ আপদ আছে আমাদের জন্যে সব টাকা খরচ ————"

প্রফুল্ল কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে সব বিপদ আপদ কেটে যাবে।"

মাতার আদেশে মেনকা চুড়ী লইয়া কমলাকে দেখাইতে গেল। কমলা দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল—তখনো তাহার নয়নদুটি অশ্রুপূর্ণ—স্থির—অচঞ্চল! সে ভাবিতেছিল—প্রফুল্ল মানব—না দেবতা!

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহাকে পাইয়া তিনি আর হরিপদর অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না। এক দিন প্রফুল্ল না আসিলে পরদিন কৈলিসীকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দোকান খানি ক্রেতায় ভরিয়া গেলে ব্যবসায়ীর প্রাণে যেমন একটা আনন্দের লহরী খেলিয়া বেড়ায়—উকিলের আপিস-গৃহটি প্রাতঃসন্ধ্যায় মক্কেলপূর্ণ থাকিলে তাহার হৃদয়েও তেমনি একটা আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠে, মেজাজটাও ভালো থাকে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে প্রফুল্ল সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কাজেই তাহার প্রাণের মধ্যে কোনো গোলমাল ছিল না—পরিষ্কার ঝরঝরে শিশুর ন্যায় সরল—পবিত্র!

সেদিন সকাল বেলা প্রফুল্ল তাহার আপিস-গৃহে বসিয়া মক্কেলদের সহিত মোকদ্দমা-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময়ে ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। খামের উপর হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, উহা হরিপদর

নিকট হইতে আসিয়াছে। পড়িবার জন্য তাহার বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। কারণ উহা সাধারণ চিঠির মত নয়। উহার গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমনি ডাকমাশুলও অতিরিক্ত লাগিয়াছিল। প্রফুল্ল আজ একটু সত্বর মক্কেলদের বিদায় করিয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিল ঃ—

সোদরপ্রতিম,

ভাই, তুমি আমাকে প্রায়ই লিখিয়া থাকো যে, আমার কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে, কি দেখিতেছি, কি শিখিতেছি ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে তোমাকে জানাইতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিশেষ বিবরণ তোমাকে জানাইতে পারি নাই, আজ একটু অবকাশ পাইয়া লিখিতেছি।

তুমি জানো, আমি এখন রেঙ্গুন হইতে ম্যাণ্ডেলে আসিয়াছি—এখানে আমাদের হেডকোয়ার্টার। আমার নূতন সাহেব আমাকে বেশ পছন্দ করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত ও শীকারপ্রিয়। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আর তিন মাসের মধ্যেই আমাদিগকে কার্য্যে বহির্গত হতে হবে। এই সময়ের ভিতর তোমাকে ঘোড়ায় চড়া, টেলিগ্রাফ্ সিগ্ন্যালিং ও মগদিগের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিখ্‌তে হবে।" ঘোড়ায় চড়া ও টেলিগ্রাফ সিগ্ন্যালিং শেখা আমার পক্ষে একটা বিশেষ শক্ত কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু মগ্‌দিগের দুরূহ ভাষা শিখিতে হইবে শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল! কিন্তু করি কি? আমার আপিসের একটি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ মগের নিকট মগের বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিগ্ন্যালিং ও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াফেলিলাম। তিন মাসকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া মগের তিন চারি খানি পুস্তক শেষ করিলাম।

বড় সাহেব নিজে আমাকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। আমার নাম গেজেটে বাহির হইল। ইহার তিন চারি দিবস পরেই সাহেব আমাকে বলিলেন,—"তুমি প্রস্তুত হও – কাল আমাদিগকে কার্য্যে বাহির হতে হবে। বর্ষার পূর্ব্বে আমাদিগকে ২৫০ মাইল পথে টেলিগ্রাম বসাতে হবে। তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে হবে, যা কিছু দরকার দেখেশুনে গুছিয়ে লও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আপিসে আসিয়া অগ্রে হিসাবের খাতা পত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্যাক করাইয়া, নিজের কাছে তাহার একটি লিষ্ট রাখিয়া দিলাম।

পর দিন প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। আমাদের যাত্রা বড় সহজ যাত্রা নহে, একটি ছোটোখাটো যুদ্ধ-যাত্রা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতাধিক কুলী মজুর খালাসী, বহুসংখ্যক অশ্বতর আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ডায়মান। সঙ্গে দেশীয় হাঁসপাতাল। কুলীদিগের আহার যোগাইবার জন্য কণ্ট্রাক্টরেরা যেন একটি প্রকাণ্ড বাজার লইয়া চলিয়াছে। গো-শকটগুলি টেলিগ্রাফের অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাঁবু ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত পরিচালনা করিয়া যাইতে হইবে দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল। সাহেব ঘোড়ায় চড়িলেন আমিও ঘোড়ায় চড়িলাম। আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। ক্রমে আমরা লোকালয় ছাড়াইয়া একটা জঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। চারি দিকে ছোটো বড় পাহাড় ঘেরা। স্থানটি বেশ রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। সন্মুখে ইরাবতী নদী কলতানে বহিয়া যাইতেছে। স্থানটি সাহেবেরও ভালো লাগিল। তাঁহার আদেশে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই ইরাবতী নদীর তীরে একটা সমতল ক্ষেত্রে আমাদের তাঁবু ফেলা হইল। ইহার প্রায় দুইশত গজ তফাতে কুলীদের আড্ডা হইল। আমার ও সাহেবের তাঁবু পাশাপাশি পড়িল। আমার তাঁবুতে একজন হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ স্থান পাইল। সাহেবের তাঁবুর পশ্চাতে তাঁহার আর্দালী ও খানসামার ছাউনী হইল। আমরা এখান হইতে সন্মুখে বারো মাইল ও পশ্চাতে বারো মাইল পথ টেলিগ্রাফ বসাইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য যে আমরা জরিপকারীদিগের সাংকেতিক চিহ্ন ও নক্সা দেখিয়া আমাদের পথ নির্ণয় করিতে লাগিলাম। ইহা ব্যতীত পথ প্রদর্শকও ছিল। আমি প্রত্যহ সকালে চা-পান করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধানে বহির্গত হই। তার লইয়া যাইবার জন্য কোনো স্থানে ডিনামাইট্-সাহায্যে পাহাড় উড়াইয়া ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ফেলিয়া দিতে হয়। আমার সহিত সর্ব্বদাই একটি গুলিভরা রিভল্‌ভার ও একটি বন্দুক থাকে, কারণ এই সকল স্থান হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ।

আমি প্রত্যহ বেলা ১১টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসি এবং সাহেবকে কার্য্যের রিপোর্ট দিয়া স্নানাহারে প্রবৃত্ত হই। কোনো কোনো দিন আমরা উভয়ে এক সঙ্গেই বহির্গত হই এবং একত্রেই ফিরিয়া আসি। বেলা ১টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই সকল লোকের হিসাব কিতাব প্রভৃতি আপিসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। বৈকালে সাহেবের সহিত খোস গল্প করি। সাহেব এখন

আমাকে তাঁহার তাঁবেদার মনে করেন না, বন্ধুভাবে দেখেন ও সেইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা বলেন।

একদিন সাহেবের তাঁবুর সম্মুখে দুইজনে দুইখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছি, সাহেব কথায় কথায় বলিলেন,—"দেখ আমাদের মুর্গিগুলোর সঙ্গে কেমন একদল বুনো মুর্গি এসে মিশেছে।" আমি বলিলাম,—"ও গুলোকে মারতে হবে?" সাহেব সেই ঝাঁকের ভিতর একটি মুর্গিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মারো দেখি ঐ মুর্গিটাকে—তোমার কেমন লক্ষ্য স্থির হয়েচে দেখি।" "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি" বলিয়া আমার বন্দুক আনিবার জন্য উঠিলাম। সাহেব বলিলেন—"না না, আমার বন্দুক নিয়েই মারো।" আমি সাহেবের বন্দুকে একটি মাত্র গুলি দিয়া ঝাঁকের মধ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট মুর্গিটির পায়ে মারিলাম। সাহেব আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এখন তুমি শীকারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েচ।"

আমাদের তাঁবু উঠিল। আমরা গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ এই নিবিড় অরণ্য-মধ্যে বন্য জাতির বসবাস দেখিলাম। আমাদের আগমনে তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল, আমাদের লোকেরা তাহাদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহা করিতে দি নাই। তাহাদের বাড়ী খানা তল্লাসী করিয়া দেখিলাম—গোটাকতক বড় বড় তীর, ধনুক ও বল্লম ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই। দেখিলাম দুই চারিটি শিশুসন্তান ভূমিতে পড়িয়া আকুলস্বরে কাঁদিতেছে; ইহাদের পিতামাতা আমাদের অভিযান দেখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে; সন্তানগুলিকে লইয়া যাইবার অবকাশ পায় নাই। এ দৃশ্য প্রাণের ভিতর একটা গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলিল। আমরা সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সাহেবের ইচ্ছা ছিল ইহাদের দুই এক জনকে ধরিয়া তাহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। একটিকেও ধরিতে পারিলেন না—আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যায়, কোন্ গভীর বনে লুকাইয়া থাকে তাহাদের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। যে স্থানে আমাদের তাঁবু ছিল তথা হইতে আঠারো মাইল দূরে আমাদের শিবির-সন্নিবেশ হইল। ইহাও ইরাবতী নদীর তীরে, কিন্তু নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সাহেব বলিলেন—"ইহাই প্রকৃত শিকারের স্থান।"

আমাদের কার্য্য পূর্ব্বমতই চলিতে লাগিল। একদিন আমি কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় রোল উঠিল—মিংসাউকে (একটা মগকুলী) বাঘে ধরিয়াছে, সে ইরাবতীতে জল শৌচ করিতে আসিয়াছিল, কোথা হইতে হঠাৎ একটা বাঘ আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। আমি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া নিমেষ-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলাম—বাঘটা এখনো তাহাকে মারে নাই, সে বালুকার উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে আর বাঘটা তাহার বুকের উপর বসিয়া মহানন্দে লাঙ্গুল নাড়িতেছে। আমি দূর হইতে তাহার কর্ণমূলে গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইল, আমি নির্ভীকহৃদয়ে আর একটা গুলি করিলাম, উহাতেই তাহার পতন হইল। শেষ গুলিটা তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তারপর কুলীরা আসিয়া লাঠি মারিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিল। সংজ্ঞাহীন কুলীটার মুখে চোখে জল সেচন করাতে সে চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

কুলীরা বাঘটাকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। সাহেব খুসী হইয়া আমাকে অপেক্ষাকৃত একটি ভালো বন্দুক উপহার দিলেন।

আমার বাঘ শীকার দেখিয়া সাহেবেরও বাঘ শীকার করিবার ঝোঁক চাপিয়া গেল। তিনি এই অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে একটা ৩০ ফুট উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করাইলেন। আমরা জ্যোৎস্নারাত্রে বাঘের প্রতীক্ষায় এই মঞ্চের উপর বসিয়া থাকি, কিন্তু বাঘ আমাদের ত্রিসীমায় আসে না। একদিন সাহেব বুদ্ধি করিয়া একটা ছাগল আনিয়া বাঁধিয়া দিলেন। ছাগলটার কাতর ক্রন্দনে একটা বাঘ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল; আমরা উভয়ে এক সঙ্গে উহাকে গুলি করিলাম। আহত ব্যাঘ্র বিকট গর্জ্জনে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিল—আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সে বার বার লাফাইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস সাহেবের গুলির আঘাতে ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার প্রকাণ্ড দেহটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—স্থানটা রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল। তারপর কত নিশি জাগিয়া কাটাইয়াছি, বাঘ আর সে দিকেও আসে নাই। এইবার সাহেবের হরিণ-শীকার করিবার ইচ্ছা হইল। ইরাবতীর বালুকাময় তটভূমিতে কম্বল মুড়ি দিয়া আমাদের সারারাত কাটাইতে হয়। যখন হরিণের পাল জল পান করিতে আসে, তখন এক সঙ্গে উভয়ে দুই চারিটাকে গুলি করি; উহারা গুলি খাইয়া ছুটিতে ছুটিতে অনেক তফাতে যাইয়া পড়ে। পর দিন কুলীরা খুঁজিয়া আনে; দুই একটাকে বাঘেও লইয়া যায়।

একদিন নদী-তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম—এক স্থানে ছোটো ছোটো মৎস্য সকল লাফাইয়া উঠিতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড জীব ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি সাহেবের নিকট তিনটা ডিনামাইট্ চাহিয়া পাঠাইলাম। সাহেব ডিনামাইট্ হস্তে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া যে স্থানে ঐ জীবটি ভাসিয়াছিল তাহার তিন দিকে তিনটি ডিনামাইট্ অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন। উহারা "বড়্ বড়্" শব্দে ডুবিয়া গেল এবং এক মিনিট্ পরেই প্রায় কাঠাখানেক জমির মাটি ও জলকে গভীর গর্জ্জনে অন্যূন বিশ ফুট উর্দ্ধে তুলিয়া দিল। সেই স্থানের সমস্ত মৎস্য ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জীবটিও দেখা দিল। সাহেব তাহার মস্তকে গুলি করিলেন। কুলীরা উহাকে জল হইতে উঠাইয়া আনিল। উহা একটি মৎস্য-বিশেষ, ওজনে পাঁচ মন ত্রিশ সের। কুলীরা উহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া উদর পূর্ণ করিল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম দিনে

সে দিন বসন্তবায়ু বহেছিল হেথা
পিকের ঝঙ্কার
প্রকৃতির কম শোভা আলোকিত পূর্ণ
শোভার ভাণ্ডার
নন্দনের পারিজাত ভুলে ফেলে দিয়ে
বিভুর আদেশে
রমা-সম ফুটেছিলি এ দীন আলয়ে
ফুল্ল হাসি হেসে।
কম প্রাণ রক্ষাতরে বিভু-আজ্ঞাক্রমে
বায়ু এল ছুটে,
মাতৃ বক্ষে রক্ত-ধারা প্রেমে দুগ্ধ হয়ে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে।

আলোকে বাতাসে স্নেহে কি উজ্জ্বল লেখা
ফুটে ব্রহ্মবাণী,
ধরিত্রী শ্যামল বক্ষে চির প্রেমভরে
তোরে নিল টানি' !
জননী জনম-ভূমি স্বর্ণ শস্য-ছলে
শ্যামাঞ্চল পাতি'
তোমারে বরিয়া নিল স্নিগ্ধ শয্যা রচি'
প্রেমভরে অতি ।
জগত-জননী স্নেহে তোরে আমন্ত্রিল
দিয়ে সব দান;
ত্রিভুবনে পড়েগেল ক্ষুদ্র শিশু-তরে
সেবার বিধান ।
শিশু হ'তে কৈশোরেতে যে বিভু তোমারে
এত দিন ধরে'
শত ঝঞ্ঝা ঝড় হ'তে রক্ষা করে তোমা
ভীষণ আঁধারে ।
ধাত্রী-ক্রোড়ে দিয়ে যিনি মাতৃপ্রেমে ভরে
তব সঙ্গে আছে,
সুখে দুঃখে সুপথেতে হাতখানি ধরে'
সঙ্গে ফিরিতেছে ।
সামান্য সে দিন নয় যেই দিনে ভবে
বিভু-কৃপা পে'লে,
যাঁর প্রেম আজীবন সুখে দুঃখে ফেরে
ঢাকে স্নেহাঞ্চলে,
তাই আজ শুভ দিনে তাঁর সেবা-তরে
বল ভিক্ষা চাও;
জন্ম যেন ধন্য হয় প্রিয় কার্য্য করে'
চিহ্ন রেখে যাও ।

শ্রীলীলাবতী মিত্র ।

প্রত্যাবর্ত্তন (৬)

বৃন্দাবন হইতে মথুরার ভাড়া এক আনা মাত্র। যখন মথুরায় আসিলাম তখন বেলা বোধ হয় পাঁচটা। আমি যেরূপ অল্পে অল্পে চলিয়াছি তাহাতে এখানেও অন্তত একবেলা থাকিয়া এ স্থানটা দেখিয়া যাওয়াই উচিত মনে হয়, কিন্তু কেন জানি না, কেমন একটা আন্তরিক অনিচ্ছার ভাব আসিল। মথুরা হইতে যেখানেই যাইব রাত্রি হইবে, সম্মুখে এমন কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান জানা ছিল না যেখানে গেলে রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় পাইব। ইহা জানা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ ভয় ভাবনা হইল না; যাহা হউক এই আন্তরিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সন্ধ্যার পর আগ্রার টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। বোধ হয় ট্রেণ খানি শ্লো-প্যাসেঞ্জার ছিল। রাত্রি ১০টার সময় আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। তখন মনে হইল কোথায় যাই। অধিকন্তু বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আজ শরীরটা ভালো ছিল না—পেটেরও কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; যাহা হউক বাহিরে আসিয়া একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এখানে সাধারণ 'সরাই' আছে, সেখানে একআনা ভাড়া দিলে রাত্রি যাপন করিতে পারা যাইবে। ক্ষীণালোকে পথ খুজিতে খুজিতে সরাইয়ে আসিয়া সহজে আশ্রয় পাইলাম। যদিও ঘরের অবস্থা ভালো না, কিন্তু তখন ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। রাত্রে শরীর অনেকটা ভালো হইল। বোধ হয় দুই আনার কেনা খাবারে রাত্রি গুজরাণ হইল। খুর্জ্জায় ভ্রাতা বসন্তকুমার-প্রদত্ত দুই টাকার বোধ হয় তখনও দুই এক আনা অবশিষ্ট ছিল।

২২শে অগ্রহায়ণ প্রাতে আগ্রা সহরে চলিয়া আসিলাম। এখানেও তেমন নির্দ্দিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি কেহই ছিলেন না, কেবল দিল্লীতে নেহালচাঁদ বাবু বলিয়াছিলেন যে "আগ্রায় বাবু নিলমণি ধর (Law lecturer.) এবং প্রফেসার নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এই দুইটি ব্রাহ্ম পরিবার আছেন।" সুতরাং আমার গন্তব্য পথের এই শব্দ টুকুই অবলম্বন মাত্র। কিন্তু লাহোরে যেমন সারদা বাবুর উদ্দেশে গিয়া বাবু হরলালের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলাম, এখানেও প্রায় তদ্রূপ এক ঘটনা উপস্থিত হইল।

নিলমণি বাবুর ঠিকানা, এক ভদ্রলোকের বৈটকখানায় গিয়া জিজ্ঞাসা [illegible] আমাকে বসিতে বলিয়া আমার সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা

করিয়া বলিলেন, 'নিলমণি বাবু এখন কলেজে যাইবেন, তা ছাড়া তাঁর একটি পুত্র অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় আছেন। ইচ্ছা করিলে আপনি আজ এখানেই থাকিতে পারেন'; পরে জানিলাম, তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ দে মল্লিক। এই বাড়ি তাঁহার। আমি তাঁহার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে রহিলাম। তারপর এখানে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, তাঁহার নাম পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে অসবর্ণ-বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্ত্রী মারা গিয়াছেন; তিনটি ছোটো ছোটো কন্যা আছে, তাহাদিগকে নিলমণি বাবুর স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। পরেশ বাবুকে দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হইল, কেননা যাঁহারা কেবল সমাজের জন্য সমাজ সংস্কার করেন, তাঁহারা পরীক্ষার সময় মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না।

পরেশ বাবুর সঙ্গে নিলমণি বাবুর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন কলেজে যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ হইল। দেখিলাম তাঁহার একটি বয়স্ক পুত্র অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় আছেন। তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে একটু বসিলাম। নিলমণি বাবু আমাকে বলিলেন, "আপনি আগামী কল্য প্রাতে রবিবারে উপাসনায় আমার এখানে আসিবেন এবং এখানেই আহার করিবেন।"

যতীন বাবু কাজে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার একটি দশ এগার বৎসরের কুমারী ভগিনী আমাকে বাড়ির ভিতর উপর বারণ্ডায় লইয়া গিয়া স্নানের আয়োজন দেখাইয়া দিল। তৎপরে সেইখানে বসিয়া আহারাদিও করিলাম। যতীন বাবুর বাড়িতে তাঁহার বিধবা মাতা, বিবাহিতা ভগিনী আর ছোটো ভগিনীটিকে দেখিলাম। তাঁহাদের ব্যবহার এবং ভাব দেখিয়া আমার প্রাণে অতিশয় সদ্ভাবের উদয় হইল। যেন ঘরের মত বোধ হইল। ঐ দিনের ডায়রীতে এইটুকু লেখা ছিল;—"ও! আর পারিনা 'তাঁর' করুণার কথা লিখিতে!"—"তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর।" মেয়েটি কিছুক্ষণ আমার কাছে আসা যাওয়া করিয়া এবং গল্প শুনিয়া আরো গাঘেঁশা হইয়া পড়িল। যতীন বাবুর মা অপরাহ্লে আমার মুখে ভগবানের নাম গান ২।৩টি শুনিলেন।

পূর্ব্বে যে বারে তিন বন্ধুতে ভ্রমণে আসিয়া ছিলাম, সে বারেও "তাজমহল" দেখিয়াছিলাম; এ বারেও দেখিয়া আসিলাম, পূর্ব্বাপেক্ষা যেন এবার উদ্যানের পারিপার্ট্য আরো ভালো হইয়াছে মনে হইল।

রাত্রে পরেশ বাবুর উদ্‌যোগে একটি ভদ্র লোকের বৈটকখানায় ১০।১৫ জন শিক্ষিত বাঙালী সমবেত হইলেন, আমার গান হইল। গান মোটামুটি এক প্রকার হইল বটে কিন্তু আমার যেন তেমন তৃপ্তি বোধ হইল না। বোধ হইল যেন গান জমে নাই। পরদিন রবিবার প্রাতে নিলমণি বাবুর বাড়ি উপাসনায় যোগ দিলাম। তারপর নগেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। তিনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জামাতা। তখন তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় হাজারিবাগে ছিলেন। নগেন্দ্র বাবু আমার প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার পাথেয় অভাবের কথা বলিলাম। তিনি তজ্জন্য আমাকে দুই টাকা সাহায্য করিলেন।

নিলমণি বাবুর বাড়ী আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণে ৪-১০ মিনিটের ট্রেণে ফাফুণ্ড ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। কানপুরের কয়েক ষ্টেশন উপরে এটি একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন, সকল ট্রেণ এখানে থামে না। ষ্টেশনে থাকিবার কোনো রূপ সুবিধা না পাইয়া বাহিরে এক সরাইয়ে রাত্রি যাপন করিলাম। ফাফুণ্ড ষ্টেশনে নামিবার কারণ আগামী বারে বলিব। (ক্রমশ)

স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পূঁড়াগ্রামে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্ম হইয়াছিল। পূঁড়া অতি প্রাচীন স্থান। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। এ গ্রামের বঙ্গজ কায়স্থ বাবুরা সমাজমধ্যে বিশেষ মান্য গণ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের জন্যই পূঁড়া বিখ্যাত। এক সময়ে পূঁড়ার "ছোটনবদ্বীপ" নাম হইয়াছিল।— তাহা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের জন্য। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরলোকগমনে পূঁড়া পণ্ডিতশূন্য হইল।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পূঁড়ানিবাসী হইলেও আমাদের কুশদহের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি প্রথম বয়সে কুশদহের অন্তর্গত খাঁটুরায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অনেক দিন তিনি কুশদহে ছিলেন। কুশদহের সহিত তাঁহার সংস্রব বরাবরই ছিল। তাঁহাদের বংশের অনেক পুত্রকন্যার কুশদহে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কুশদহে আসিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে ৺হরদেব শিরোমণি একজন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্ডিতবংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে অনেকে বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা গোবিন্দ চন্দ্র তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। দশকর্ম্মে তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রায়বাবুদের পৌরহিত্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় উদার, সরল, অল্পে সন্তুষ্ট বিপ্র আজ কাল দেখা যায় না। শাস্ত্রে গভীর দৃষ্টি না থাকিলেও চরিত্র ও ভগবৎভক্তিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথোচিত ভাগ দিতেন না বলিয়া তিনি কোন দিন বিরক্ত হন নাই। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবননির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পিতার অনুরূপ পুত্র। তিনি যেরূপ সরল, অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, এক স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভিন্ন সেরূপ অল্পই দেখিয়াছি। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদাই হাসি দেখা যাইত। তাঁহার যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত, সমস্ত দিন প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল লিখিতেছেন, অথবা প্রুফ দেখিতেছেন, হয়ত শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়াছেন, সে সময়ও দেখিয়াছি যে সকল ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সহিত হাসিমুখে তিনি কথা কহিতেছেন।

খাঁটুরা গ্রামে ৺ রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে থাকিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি শিক্ষা করেন। পরে কাশীধামে স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট যাইয়া ১২ বৎসর কাল দর্শন ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দেশে প্রত্যাগত হন। প্রথমে শ্রীরামপুরে আসিয়া মহাভারত ও পঞ্চদশী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকালেখক হইয়াছিলেন। তদনন্তর বহরমপুরের স্বনামখ্যাত ৺ ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং রামদাস বাবুর কলিকাতাস্থ বৃহৎ ভবনে অবস্থিতি করিতে থাকেন। উদারহৃদয় রামদাস বাবু বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। গুণী গুণের আদর জানেন। রামদাস বাবুর সংস্রবে আসিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে রামদাস বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামদাস বাবুর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ যে আন্তরিক দুঃখ পাইয়াছিলেন

তা। তিনি সামলাইতে পারেন নাই। তাহার অল্পদিন পরেই রাণী আরনা কালীর টোলে বেদান্তাধ্যাপক হইয়া বহরমপুর গমন করেন এবং সেখান হইতেই তাঁহার হাঁপানি রোগের সূত্রপাত হয়। তিনিও পদত্যাগ করিয়া বাটীতে থাকিতে বাধ্য হন।

মহর্ষি পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালেও তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বৃত্তি পাইতেন। সেই জন্য শেষজীবনে নিতান্ত অর্থকষ্ট পান নাই। বাঙ্গালায় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করার পথ প্রদর্শক না হইলেও সাংখ্যদর্শন সহজবোধ্য করিয়া সাধারণের বোধগম্য করার চেষ্টা তিনিই করিয়াছেন। পরে পাতঞ্জল বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের অনুবাদ করেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লেখার রীতি একটু নূতন রকমের ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হইত। তিনি নানাবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে লিখিতেন। অনেক মাসিকপত্রের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। তাঁহার প্রবন্ধে নাম না থাকিলেও সহজে বলা যাইত কোনটি তাঁহার রচনা। তিনিও আমাকে এরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। নটকুল চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। কবিরাজ বিজয়রত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বেদান্তবাগীশ পীড়িত হইলে তিনি বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। দুইজনে এতটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল বলয়াই উভয়ে এক সঙ্গে দিব্যধামে গমন করিলেন। বেদান্ত বাগীশ মহাশয় দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও কোন দিন গঙ্গাস্নান বা নিত্যানুষ্ঠের কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। ঝড়বৃষ্টিতেও তাঁহার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইত না। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। কোন দিন অশান্তিতে পড়িয়াও ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, চরিত্রবান, পরম ভাগবত পণ্ডিত বিরল। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল পুঁড়া কেন সমগ্র কুশদহ পণ্ডিত শূণ্য হইল। বঙ্গদেশের সাহিত্য গগন হইতেও একটি উজ্জ্বল তারকা অন্তর্হিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

সম্রাট দম্পতীর দর্শনে কলিকাতায় বোধ হয় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। অবশ্য কুশদহবাসী বহু লোকও আসিয়া ছিলেন। দর্শনের উদ্দেশ্য সকলের এক নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা একজন মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু তিনি বিশেষ মনুষ্য। তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষা এবং ধর্ম্মাদি লইয়া একটি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের পরিচালক নিয়ম। বিধাতা নিয়ন্তা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক। পৃথিবীর যে রাজ-নিয়ম-বিধি তাহা মানবীয় হস্তের ভিতর দিয়া কাজ করে। সুতরাং তাহা ত্রুটি মিশ্র; কিন্তু সে বিধি সাম্রাজ্যেরই জন্য,-সে বিধির মধ্যেও বিধাতার বিধান স্বীকার করিতে হইবে। বিধানে শ্রদ্ধা, বিধির প্রতিনিধি রাজাকে সম্মান করিতে আমরা ধর্ম্মত দায়ী। আন্তরিক সেই ভাবে যদি আমরা রাজ-দর্শন না করিয়া, কেবল ব্যাহ্যিক ব্যাপার দেখিয়া অর্থনষ্ট এবং শারীরিক কষ্ট করিয়া থাকি, তবে অপরাধ হইয়াছে মনে করি।

গত ২২শে পৌষ স্বর্গীয় ভুতনাথ পালের বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাম্বুলী সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সামাজিক উন্নতি বিষয়ক অনেক কথার অবতারণা হইয়াছিল। এমন কি "ইংলণ্ড, আমেরিকা গমনে জাতি যায়না, "অসবর্ণ বিবাহ এবং বাল-বিধবা বিবাহ অবিধি নহে," এ সকল কথাও উঠিয়া ছিল। সভা সমিতিতে দশজনে একত্র হইলে তখন মানুষের প্রাণে একটা স্বাভাবিক সদ্ভাব ও আনন্দের উদয় হয়; তখন ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। যাহা প্রাণের স্বাভাবিক কথা তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু সর্ব্বদা সাংসরিক গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে আর সে ভাব থাকে না।

পৌষ মাসের তাম্বুলী সমাজ মাসিক পত্রে "পুরাকালের স্ত্রী শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, স্ত্রী লোকের শিক্ষার জন্য বর্ণ-পরিচয় হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। মুখে মুখে সৎ শিক্ষাই যথেষ্ট। প্রবন্ধের একস্থানে

বলিতেছেন, "আমরা মহিলাদিগকে আদর্শ শিক্ষা দিতে পারি, দিয়াও থাকি কিন্তু অক্ষর পরিচয় কিছুতেই দিব না, যাহারা তাহা দিবে, তাহারা আপন ফাঁস গলায় পরিবে।" এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাই তাম্বুলী সমাজের মত না কি? যদি তাহা না হয়, তবে উহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

গোবরডাঙ্গা হইতে পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

'৬।৭ বৎসর যাবৎ আমি এক প্রকার পেটের বেদনায় যারপর নাই ক্লেশ পাইতেছিলাম। সায়ংকালে প্রায়ই বেদনার সূত্রপাত হইত। ক্রমে উহা অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাক্তারি, কবিরাজী, হোমিয়োপ্যাথিক সর্ব্বপ্রকার ঔষধই নিস্ফল হইল, অবশেষে নিরুপায় হইয়া দিবাভাগের আহার পরিত্যাগ করিলাম, তথাপি অব্যাহতি পাইলাম না, ফলত রোগ বা ঔষধের নির্ণয়ই হইল না। অবশেষে মৃত্যুই একমাত্র প্রার্থনার বিষয় হইল। এই দারুণ শোচনীয় অবস্থায় গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত হয়দাদপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষের সহিত আমার হঠাৎ সাক্ষাৎকার হইল, এই চেষ্টা যত্ন বিরহিত সুতরাং পুরুষকার পরিশূন্য সাক্ষাৎকারে মূলে অবশ্য কোন শক্তি কার্য্য করিয়াছিল। ভ্রান্ত মানব এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই পুরুষকারের বৃথা গর্ব্বকরে। যাহা হউক ডাক্তার আমার দুর্দ্দশার পরিচয় পাইয়া ব্যথিতভাবে বলিলেন 'যে কারণই পেটে বেদনা ধরুক আমার ঔষধে আপনি নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবেন' বস্তুত তাহাই হইল। সাত দিন মাত্র ঔষধ সেবন করিয়া আমি নিরাময় হইলাম!!

কত লোক হয়তো আমারই মত বিপদে দিশে হারা হইয়া কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া আমি সাধারণের গোচরার্থ 'কুশদহ" পত্রে নিজের আরোগ্য সমাচার প্রকাশের প্রত্যাশায় পাঠাইলাম।'

সংশোধন—গত অগ্রহায়ণ মাসের 'কুশদহতে প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতার নীচে নাম শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক হইবে।

তৃতীয় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৮। [১১শ সংখ্যা

কুশদহ

স্থানীয় মাসিক পত্র



দাসযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

(চিত্র-পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ-কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৲ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তবচরণ।"

৩য় বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩১৮ ১১শ সংখ্যা

ব্রহ্মস্তোত্রম্

(অষ্টোত্তরশতনাম)

নমোঽকিঞ্চন নাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্য্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষয়ায় তে॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিল কারণ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধো অধমতারণ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
করুণা নিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে নমঃ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রম্যায় দুর্লভায় চ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমোনমঃ।

দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ ॥
নমস্তভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন ।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন ॥
নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে ।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবন প্রীতে নমঃ পতিত পাবন ।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণ প্রাণধনায় চ ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর ।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো ।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন ।
ভুমন্ ভবাব্ধিকাণ্ডারিন ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব ।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকার শুদ্ধ চ ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ ।
সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বমূলাধারায়াস্তু মনোনমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্ব্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্ব্বসাক্ষিণে ।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখ স্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্টে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমোনমঃ ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্ব্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমোনমঃ ।
নামান্যেতানি গৃহ্নস্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥

(ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন)

বিধি পালন

জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে স্বরূপগত এক কিন্তু ব্যক্তিত্বে ভিন্ন এবং শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধবাচক কোনো না কোনো ভাবের ভিতর দিয়াই সম্বোধিত হইয়া থাকেন তাহা গত মাসে "দ্বৈতাদ্বৈত ভাব" প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্গে সাধকের বিবিধ সম্বন্ধ যোগে ভাব-রসলীলা সম্বন্ধে পৌরাণিক যুগে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সকল ভাব গুলির সঙ্গে সঙ্গে মধুর ভাবটি অত্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভারেব সঙ্গে জ্ঞানের ভেদ ঘটিয়া ক্রমশ এমন ব্যভিচার দোষ ঘটিল যাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক এক্ষণে অদ্বৈতভাব, দ্বৈতভাব এবং সম্বন্ধবাচক ভাবের মীমাংসা করিয়াও ভগবানের সঙ্গে যে আমাদের যোগ তাহা কি রূপে আমরা বাস্তবিক লাভ করিতে পারি তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পিতা পুত্রে বস্তুগত অভেদ, কিন্তু ব্যক্তিত্বে ভেদ; সম্বন্ধগুলি ভাব প্রকাশক, কিন্তু এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট নয়; যদি পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন না করে, তবে পিতার সঙ্গে পুত্রের যে যোগ তাহা সত্য হয় না। আজ্ঞা পালনও কেবল বাহিরের একটা হুকুম মানা নহে। পিতার ইচ্ছা বুঝিয়া চলাই ইচ্ছা পালনের মূল কথা। এখানে ভাবের ভাবুক হইতে হয়—অনুগত হইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাসই এ পথে একমাত্র সহায় কিন্তু তাহাতে স্বাধীনতার খর্ব্ব হয় না, কেন না, শুভ ইচ্ছার অধীনতাই স্বেচ্ছাচারনাশক এবং মঙ্গলদায়ক। ভগবানের ইচ্ছা পালন না করিলে কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের ইচ্ছা বুঝা যাইবে কি রূপে? উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার উপায় তিনি নিজেই করিয়াছেন নচেৎ আমরা কোনো দিন তাহা বুঝিতে পারিতাম না। প্রত্যেকের অন্তরে তিনি বিবেক বলিয়া একটি উচ্চ বৃত্তি দিয়াছেন। এই বিবেক দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছা বুঝা যায়। যদি বল, বিবেক সকলের তো সমান নহে? একথা আপাতত সত্য বলিয়া বোধ হইলেও দেশ কাল শিক্ষাদি ভেদে বিবেকের কতকগুলি বাহ্য সংস্কারের ভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে ভেদ নাই; এমন কি অতি অসভ্য মানবের মধ্যেও আচারব্যবহার এবং সংস্কারগত অনেক কুসংস্কার সত্ত্বেও বিবেকের প্রকাশ দেখা যায়। বিবেক প্রকাশের আর একটি লক্ষণ এই যে,

যেমন বারিধারা পতিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ মেঘের সঞ্চার, তেমন পাপাসক্ত হৃদয়ে পাপবোধ এবং অনুতাপের উদয় হইলেই ভক্তি-ধারা এবং বিবেকচন্দ্রের উদয় হয়। কিন্তু সর্ব্বথা সহজ জ্ঞানেই সদসৎ জ্ঞানের আভাস লক্ষিত হয়। এবং ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষতার সঙ্গেই বিবেকেরও উচ্চ প্রকাশ হইয়া থাকে।

তৎপরে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যে সকল বিধি নিবদ্ধ আছে—যাহা সাধারণত লোকে মানিয়া চলিতে বাধ্য তাহার মধ্যেও কত ভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং মানুষ কেবল শাস্ত্র পড়িয়াই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা; তাহা অপেক্ষা অন্তরের বিবেক শ্রেষ্ঠ। নচেৎ বিধি পালন করিয়াও তেমন কোনো সার্থকতা নাই। মানুষ যত দিন অন্ধভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে ততদিন জ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রার্থ যখন বিবেকের সঙ্গে ঐক্য হয় তখনই তাহা কল্যাণদায়ক হয়।

তারপর আর একটি গুরুতর কথা এই যে, প্রত্যাদিষ্ট মহাজনগণের দ্বারাও কোনো কোনো অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে যে সকল বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে,--যাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—একটি জ্ঞান কাণ্ড বা আধ্যাত্মিকতা, অপর কর্ম্মকাণ্ড বা কর্ত্তব্যপালন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনো কোনো সত্য অপরিবর্ত্তনীয়, আর দেশ কালের ভিতর দিয়া যে সকল সত্যের আংশিক ভাবে প্রকাশ হয় তাহা ক্রমোন্নতির নিয়মে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিবদ্ধ হয় তাহাও কালের নিয়মে কতক কতক অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সকল বিধির আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নূতন বিধি প্রকট হইলে পুরাতন বিধি তাহার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন বিধিই গ্রহণীয় হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ নূতন বিধিতে বিশ্বাস করিব কি রূপে? অতএব এখানেও একটি গুরুতর চিন্তা করিবার কথা আছে।

মানুষ স্বভাবত পুরাতনে অধিক শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী। "যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া হঠাৎ নূতনে বিশ্বাস করিব কি করিয়া" এই হইতেছে সাধারণ লোকের কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, পুরাতনই বা আমি বুঝিব কি প্রকারে, যদি বর্ত্তমানে কিছু না বুঝিয়া থাকি। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের যে সকল চরিত্র, যে সকল বিধিনিষেধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে কত অস্বাভাবিক আখ্যায়িকা জড়িত হইয়াছে, যদি আমি বর্ত্তমানে কোনো বিশেষ চরিত্র না দেখি তবে সেই পুরাতন শাস্ত্রের নষ্টকুষ্ঠী উদ্ধার করিতে কখনই পারিব না। তারপর বর্ত্তমানের অন্য চরিত্র বুঝিবার পূর্ব্বে আমারও অন্তত কিছু

সেইরূপ ভাব, সেইরূপ দৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। কেবল ভূতকালের বর্ণনা শুনিয়া প্রকৃত সত্য বুঝা যায় না। যখন নিজ জীবনের সঙ্গে, বর্ত্তমান আদর্শের এবং ভূতকালের শাস্ত্রের সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারি, তখনই প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে পারি। অতএব প্রাচীন বিধি যখন বর্ত্তমান বিধির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়, তখন ভূত কালের বিধিও বর্ত্তমান কালের উপযোগী হয়, তখনই তাহা আমাদের সহজবোধ্য এবং মঙ্গলদায়ক হয়।

সকল বিধিই বিবেকের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে,—অন্তরে সায় পাইতে হইবে, তবেই বিধি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধনার পথ প্রাপ্ত হইব।

সাধনের একটি মূল সূত্র বিধিপালন। সাধন ভিন্ন কোনো বস্তু লাভ হয় না। বিদ্যা, ধন এবং ধর্ম্ম সকলই সাধন সাপেক্ষ। অতএব সাধন সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরে করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে ইহাই সত্য যে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। নচেৎ কেবল মুখের কথায়, মত বা শুষ্ক-জ্ঞান দ্বারা কখনো ভগবচ্চরিত্র লাভ করা যায় না।

দাস—

শিশুর খাদ্য

আহারের দোষে শিশুদিগের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন প্রসূতিগণ একথা বুঝিয়াও বুঝেন না। বৃথা নাটক নভেল পড়িয়া সময় ক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা যদি এই সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়—শত শত সহস্র সহস্র শিশুর জীবন রক্ষা হয়।

মাতৃস্তন্যই নবজাত শিশুর প্রধান খাদ্য। ইহার আপেক্ষিক ভার ১০৩০ এবং ইহার প্রতি শতভাগে ৩-৪২ অংশ পনির, ৩-৩৩ অংশ তৈলপদার্থ, ৪০৫৫ অংশ শর্করা, ৫-২১ অংশ লবণ এবং ৮৮-৯০ অংশ জল বর্ত্তমান থাকে। সুস্থ মাতৃস্তন্যের আকার পাতলা, ঈষন্নীলাভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মিষ্টাস্বাদ বিশিষ্ট এবং এক স্থানে অধিকক্ষণ রাখিলে অসংখ্য নবনীত-কণিকা সকল পৃথক হইয়া পড়ে। ইহা স্নিগ্ধকারক এবং পোষক। ইহা ব্যতীত ইহার মৃদুবিরেচণ গুণ আছে। শিশুর উদরের সঞ্চিত মল স্তন্য পানে নির্গত হয়।

আমাদের দেশের প্রস্থতিগণ শিশু কাঁদিলেই তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা সুনিয়ম নহে। ক্ষুধা না পাইলেও অন্য কারণে শিশু কাঁদিতে পারে। অনেক সময় অনিয়মিত দুগ্ধ পানহেতু শিশুর পেট কামড়ায় ও তজ্জন্য সে কাঁদিতে থাকে। ক্ষুধার কান্নায় শিশু-স্বভাবের নিয়মানুসারে নিজের হাত দুই খানি মুখে দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পেট কামড়াইলে উহারা প্রায়ই কান্নার সময় পদদ্বয় পেটের দিকে গুটাইয়া আনিয়া ছুড়িতে আরম্ভ করে। জন্মাবধিই শিশুকে একটি নিয়মপূর্ব্বক স্তন্যদান অভ্যাস করানই ভাল। প্রথম হইতে তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দেওয়া আবশ্যক। ভোর ৪ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত এইরূপ ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করাইয়া অবশিষ্ট রাত্রি শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবেন। প্রথম হইতে শিশু এই নিয়মে অভ্যস্থ হইলে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়া প্রস্থতির নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। চতুর্থ সপ্তাহ হইতে বিরাম কাল আরো বৃদ্ধি করিবেন। তখন ২॥ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দান করাই উচিত। এইরূপ নিয়ম দ্বিতীয় মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া তৃতীয় মাস হইতে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দানের ব্যবস্থা করিবেন। ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাম কাল একটু একটু বাড়াইতে থাকিবেন। নিয়মপূর্ব্বক স্তন্যদানে প্রস্থতি ও শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কসের ৪ টি দাঁত বাদে যত দিন অপর দাঁত গুলি না উঠিবে তত দিন শিশুকে স্তন্যত্যাগ করান ভাল নহে। মাড়ীর সমস্ত দাঁত উঠিলে আর তাহাকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া অনুচিত।

মাতৃস্তন্যই শিশুর ঈশ্বরদত্ত খাদ্য হইলেও অনেক সময় কেবলমাত্র উহার উপর নির্ভর করিয়া শিশুকে রাখা যায় না। মাতার স্তনে দুগ্ধের অল্পতা, মাতার শারীরিক পীড়া বশত স্তন-দুগ্ধের বিকৃতাবস্থা, অথবা মাতার মৃত্যু ঘটিলে কাজে কাজেই শিশুকে অন্য দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এমত ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ধনবানেরা দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং মধ্যবিত্ত বা গরীব লোকেরা শিশুকে গোদুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর বয়সের সহিত ধাত্রীর নিজ শিশুর বয়সের অধিক পার্থক্য থাকা ভাল নহে; উভয়ের বয়স তুল্য হইলেই ভাল হয়। ধাত্রীর নিজের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া চাই। উপদংশ, যক্ষা, কাস, অতিসার বা উদরাময়াদি পীড়াগ্রস্তার স্তন্য পানে শিশুর ঐ সকল রোগ জন্মাইতে পারে। পেট রোগা মাতার সন্তান প্রায়ই পেটরোগা হইয়া থাকে, ইহা

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। ধাত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ও নানাবিধ পুষ্টিকর অথচ লঘুপথ্য খাইতে দিবেন। স্তন্যদাত্রীর আহারের দোষগুণে অনেক সময় শিশুর রোগ জন্মে, অথবা শিশু নিরাময় হয়। অতিরিক্ত অন্ন খাইয়া শিশুকে স্তন্য পান করাইলে শিশুর পেট কামড়ায়। অপরপক্ষে মৌরী খাইয়া স্তন্যপান করাইলে শিশুর পরিপাকবিকার ও কাসি আরোগ্য হয়। স্তন্যদাত্রীর মনের সহিত স্তনদুগ্ধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোন কারণে ক্রোধ, শোক, দুঃখ বা ভয় উপস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্তনদুগ্ধও দূষিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সকল স্থলে উক্ত দুগ্ধ শিশুকে তখন পান করিতে না দেওয়াই বিধেয়। এতদ্দেশের প্রসূতিগণ এক দিকে ঝগড়া করিতেছেন, অপর দিকে শিশুকে স্তন্য পান করাইতে-ছেন, এ ঘটনা বিরল নহে। এইরূপ অজ্ঞতার ফলে যে কত শিশু অকালে জীবন ত্যাগ করে বা জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের তিন চারিটি শিশু সন্তান একই বয়সে আমাতিসার রোগে মারা পড়ে। উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী অত্যন্ত কলহরতা ছিলেন। আমার এখনও বিশ্বাস আছে যে, উক্ত কলহরতা স্ত্রীর দূষিত স্তন্যই শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর অবধারিত কারণ।

গোদুগ্ধ মাতৃস্তন্য অপেক্ষা গুরুপাক। শিশুকে খাঁটি গোদুগ্ধ পান করানো কোন ক্রমে উচিত নহে। শিশুর পাকস্থলীতে উহা কখনই সহ্য হয় না।

শিশু জন্মাইবার পর দশ দিনের মধ্যে তাহাকে গোদুগ্ধ দিতে হইলে এক ভাগ দুগ্ধে দুই ভাগ গরম জল ও অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবেন। ঐ দশ দিনের পর ৫ মাস পর্য্যন্ত সম পরিমাণ দুগ্ধ ও গরম জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়ানই ব্যবস্থা। গোদুগ্ধে মাতৃস্তন্য অপেক্ষা পনিরাংশ কিছু অধিক থাকে কিন্তু আবার শর্করার অংশ কিছু কম থাকে, এজন্য যখনই শিশুকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াই-বেন তখনই উহাতে অল্প চিনি যোগ করিতে ভুলিবেন না। আমাদের দেশী চিনি না দিয়া সুগার অব্ মিল্ক বা দুগ্ধ শর্করা ব্যবহার করাই ভাল। শিশুর বয়স ৬ মাস হইলে উহাকে খাঁটী দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে বলা নিতান্ত প্রয়োজন যে যখনই শিশুকে জলমিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইবেন, তখনই উহা অল্প গরম করিয়া লইবেন। অতিরিক্ত জ্বাল দিবার আবশ্যক নাই। যে সকল শিশুর পেটের দোষ থাকে তাহাদের দুগ্ধে জলের পরিবর্ত্তে তরল বার্লির জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উত্তম। বাসি বা ঠাণ্ডা দুগ্ধ শিশুকে কখনো খাইতে দিবেন না। ইহাতে শিশুর উদরাময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের জিহ্বার উপর এক প্রকার পুরু শ্বেতবর্ণ ছাতা পড়ে। কখন কখন ঐ ছাতা উঠিয়া গিয়া ক্ষত বাহির হয়। প্রতিবার দুগ্ধ খাওয়াইবার পর এক চামচ শীতল জল খাওয়াইলে আর ঐরূপ ছাতা জন্মাইতে পারে না। দুগ্ধ পান শেষ হইলে শিশুকে অল্পক্ষণ বসাইয়া রাখা ভাল। ইহাতে শিশুর উদরে যে অস্বাভাবিক বায়ু থাকে তাহা উদ্গারের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। ঐ বায়ু বাহির না হইলে কখন কখন শিশুর পেট কামড়ায় ও পেট ফাঁপিয়া উঠে। প্রতিবারে কোন্ বয়সের শিশুর পক্ষে কি পরিমাণ দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে তাহার মাত্রা ঠিক করিয়া দেওয়া অসম্ভব। প্রসূতি শিশুর শক্তি অনুসারে তাহা স্থির করিয়া লইবেন। অধিক খাওয়া হইলেই শিশুর পাকস্থলী তৎক্ষণাৎ প্রসূতিকে উহা জানাইয়া দেয়; শিশু তখন দুধ তুলিয়া ফেলে। পীড়াগ্রস্তা মাতার স্তন্য পানে যেমন শিশুর রোগ জন্মে পীড়িতা গাভীর দুগ্ধ পানেও সেইরূপ শিশুর নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যে গাভীর দুগ্ধ শিশু পান করিবে তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তদ্বিষয়ে গৃহস্থ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। কলিকাতা বা অপরাপর বড় বড় সহরে যে দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহার দোষবহুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহরে যকৃত পীড়ায় শিশুর মৃত্যুর হার যে এত বাড়িতেছে, দূষিত দুগ্ধ পানই তাহার প্রধান কারণ। আজ কাল অনেক বাড়ীতে শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য ফিডিং বোতল (Feeding bottle) ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রতিবার ব্যবহারের পর ঐ বোতলের ভিতরের সমস্ত অংশ উত্তম রূপে ধৌত করা উচিত। নতুবা উহার মধ্যে বাসি দুগ্ধ পচিয়া থাকে। ঐ পচা দুগ্ধের অংশ কোন প্রকারে শিশুর উদরস্থ হইলে মারাত্মক উদরাময়াদি পীড়া জন্মাইতে পারে। শিশুকে দুগ্ধ খাইবার জন্য যে সকল বাসন ব্যবহৃত হইবে উহা পরিষ্কৃত হওয়া চাই। গামছা বা অন্য কোন ময়লা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উহা মুছিবেন না। মোট কথা যাহাতে কোন ক্রমে শিশুর খাদ্য দূষিত না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

এক বৎসর বয়স হইলেই শিশুকে ভাত খাইতে দিবেন। শিশু ভাত খাইতে শিখিলে তাহার নখ যাহাতে সর্ব্বদা ছোট থাকে এবং সে যাহাতে হাত ধুইয়া আহার করে তদ্বিষয়ে মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর নখ বড় থাকিলে উহার মধ্যে নানা প্রকার ময়লা মাটি প্রবেশ করে এবং ঐ ময়লা মাটি খাদ্য দ্রব্যের সহিত শিশুর উদরস্থ হইয়া সমূহ বিপদ ঘটাইতে পারে।

ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। (গোবরডাঙ্গা)

সরমা



একদিন মধ্যাহ্নে আমি, সাহেব ও একজন মগ, এই তিন জনে মিলিয়া শীকারে বহির্গত হইলাম। আমরা অরণ্যের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিলাম। সকলের নিকট এক একটি (Buglo) ভেরি রহিল। যদি কেহ বন-মধ্যে হারাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা বাজাইয়া সঙ্কেত করিবে।

আমরা সেই শান্ত নীরব ছায়াবহুল অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড মহিষ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে। সাহেব বলিলেন—"উহাকে শীকার করিতে হইবে।" উহাকে শীকার করা আমার বড় সহজ বোধ হইল না। অত বড় মহিষ আমি কখনো দেখি নাই। উহা একটা প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায়।

মহিষটা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সাহেব পশ্চাৎ হইতে গুলি করিলেন, সম্মুখে আমি ও পার্শ্বে মিকাউ (মগশিকারী)। আহত মহিষটা পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া, কান খাড়া করিয়া একটা ভয়ানক রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে ছিল, দেহ হইতে রুধির গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি দুইটা গুলি মারিলাম, মিকাউ একটি মারিল। আর পারিলাম না। মহিষটা নিকটে আসিয়া পড়িল। আমি প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিলাম। ঘোড়াটাও বিপদ বুঝিয়া প্রাণের দায়ে ছুটিতে লাগিল। সাহেব ও মিকাউ কোথায় পড়িয়া রহিল। আমি প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম, যে খানে যাইয়া ঘোড়াটি আটক পড়িবে, সেই খানেই আমাদের উভয়ের যে কি দশা হইবে তাহা একবার চকিতে ভাবিয়া লইলাম; প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অন্য উপায় না দেখিয়া ঘোড়াটাকে কশাঘাত করিলাম। সে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। অদূরে একটা ছোট পাহাড় দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম পাহাড়টা আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃত্যুর কালো ছায়া সম্মুখে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। মৃত্যু স্থির নিশ্চয়, তবে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" আমি ঘোড়াটাকে আবার কশাঘাত করিলাম—বেচারা বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

তাহার মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ চারিদিকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়াটা পাহাড়ের নিকটে অন্ধকার দেখিল। সে তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি পাহাড়ের গায়ে ঢালিয়া দিল। আমি নিরুপায়! পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি-ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ মহিষটা তাহার প্রকাণ্ড শৃঙ্গ দুটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভীমবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার ঘন নিশ্বাসের শব্দগুলি আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমাদের ব্যবধান ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল—আমি ঘোড়াটিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু হায়! সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ঘোড়াটা এক পদও অগ্রসর হইল না, ক্রমান্বয়ে হাঁপাইতে লাগিল। দেখিলাম মহিষটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে—ব্যবধান সামান্য কয়েক গজ মাত্র। বুঝিলাম মরণের দুত জীবনের দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছে। আমি সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লইলাম। অনুমানে বুঝিলাম, মহিষটা আমার নিকটে আসিয়াছে; আর এক মুহূর্ত্ত! কিন্তু সে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই একটা বিকট চিৎকার করিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল। চাহিয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড বল্লম তাহার মস্তক ভেদ করিয়া মাটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। মহিষটা যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, স্থানটা রক্তে প্লাবিত হইতেছে।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এদিক ওদিক চারিদিক দেখিতে লাগিলাম—আমার এ দয়াময় দীনবন্ধু কে?

পৃষ্ঠদেশে বল্লম বাঁধা, হস্তে ধনুর্ব্বাণশোভিতা এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। দেখিলাম সেই দেবী দক্ষিণ পদ মহিষমুণ্ডে রাখিয়া সবলে বল্লমটি তুলিয়া লইতেছেন। বোধ হইল—বোধ হইল কি স্পষ্ট দেখিলাম যেন মা আমার মহিষমর্দ্দিনীরূপে দণ্ডায়মান। তাঁহার পদভরে যেন ধরণী টলটলায়মান।

এই জনহীন বিজন অরণ্য-প্রান্তরে—কে এ দেবী—কোথা হইতে আজ আমার প্রাণ রক্ষা করিতে আসিলেন! কৃতজ্ঞতায় সমস্ত হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিল—দুটি নয়ন হইতে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল!

আমি অনতিবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই দয়াময়ী দেবীর

সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অসুরদলনী ইত্যাদি বলিয়া দুর্গার স্তব পাঠ করিলাম।

দেবী আমায় অভয় দিয়া, হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া লইলেন—তাঁহার মোহন স্পর্শে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল; যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আমার দেহের ভিতর সঞ্চারিত হইল! আমি পুলকবিহ্বল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম—কী তেজপূর্ণ সে নয়নের জ্যোতি! কী সরল সুন্দর স্নেহসিক্ত মুখ খানি তাঁহার! তিনি আমাকে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি এই বিজন বনে—একা আসিয়াছ কেন?" আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে বলিলাম,—"আমি ইংরাজের দাস—আমি অর্থের লোভে, পেটের দায়ে এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি আমার প্রভুকে খুসী করিবার জন্য আমার জীবন পর্য্যন্ত দিতে বসিয়াছিলাম—আপনি না থাকিলে এই মহিষ-শৃঙ্গে আমি ও আমার ঘোড়াটির প্রাণান্ত হইত। আপনি আমার প্রাণদাত্রী আমার মাতৃস্বরূপা আপনার দয়া আমি কখনো ভুলিব না।"

দেবী আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"ভয় নাই বৎস—তুমি আমার পুত্র স্থানীয়; আমি তোমায় অসহায় অবস্থায় দেখিয়া মহিষটাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি প্রাণে বাঁচিয়াছ। তুমি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ আমিও তোমাকে সন্তান ভাবিয়া এই কয়টি প্রস্তর দিতেছি, ইহা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাও, ইহাতেই তোমার জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে।" এই বলিয়া সেই দেবী আমার হস্তে সাত খানি বহুমূল্য প্রস্তর দিলেন—আমি উহা যত্নের সহিত কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলাম।

অদূরে ঘন ঘন ভেরী ধ্বনি হইতে লাগিল—বুঝিলাম সাহেব ও মিকাউ আমাকে খুঁজিতেছে, আমার হস্তের ভেরী হস্তেই রহিল বাজাইতে ইচ্ছা হইল না—ইচ্ছা হইল সেই দয়াময়ী মায়ের নিকট থাকিয়া দিন কতক তাঁহার পদ-সেবা করি। কিন্তু হায়, আমার সে আশা সফল হইল না।

সাহেব ও মিকাউ ভেরী বাজাইতে বাজাইতে যে স্থানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম উহার কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব তফাৎ হইতে মহিষটার মৃতদেহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া টুপিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে "হিপ্ হিপ্ হুররে" শব্দে বনভূমি কাঁপাইতে লাগিলেন। পরক্ষণেই সাহেব ধনুর্ব্বাণ বল্লম শোভিতা এক বন্য রমণীর নিকট আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ধরিলেন। রমণীও সাহেবের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া বল্লম উঠাইলেন। আমি বেগতিক

দেখিয়া চকিতে উহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বন্দুক নামাইলেন রমণীও বল্লমটি যথাস্থলে রাখিয়া দিলেন।

সাহেব আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"ব্যাপার কি ?" আমি সংক্ষেপে সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। সাহেব বলিলেন—"আমি ভাবিয়া ছিলাম তুমিই মহিষটা মারিয়াছ আর এই বন্য রমণী তোমাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে—সেই জন্য আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহাই পাইয়াছি! ঐ রমণীকে ধরিতে হইবে।"

আমি করুণস্বরে বলিলাম—"আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি উঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছি।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে অকর্ম্মণ্য ভীরু বাঙালী বলিয়া তিরস্কার করিয়া নিজে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু রমণীকে ধরিতে পারিলেন না—তিনি নিমেষ মধ্যে তাঁহার চির পরিচিত বন-পথে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিলেন।

সাহেব রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে বলিলেন—"আজ উহাদের আড্ডা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সাহেব মিকাউকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন—আমি ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চাতে চলিলাম। প্রায় এক মাইল আসিয়া সাহেব পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি কুটীর দেখিয়া দূর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। সহসা কতকগুলি বন্য স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। সাহেব গতিক ভালো নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ব্যথিতমনে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় কিন্তু মৃত মহিষের মুণ্ডটা কাটিয়া আনিতে ভুলিলেন না।

প্রতিশোধ লইবার মানসে পরদিন বেলা দশটার সময় সাহেব ৫০।৬০ জন কুলি মজুর ডিনামাইট্, বন্দুক ইত্যাদি লইয়া সদর্পে সেই নিরীহ বন্য জাতির উচ্ছেদ সাধন করিতে বহির্গত হইলেন—আমি সাহেবের চাকর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে বাধ্য হইলাম।

বন্য জাতির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাহেব দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলেন পাহাড়ের উপর কয়েক জন লোক বিচরণ করিতেছে। সাহেব উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন, এবং কুলিদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ

পরেই দুই চারিটি তীর আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, সাহেবের আদেশে আমরা সকলেই পাহাড়ের যে দিক হইতে তীর আসিতেছিল সেই দিকে গুলি ছুঁড়িতে লাগিলাম। ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দিকে তীর আসিতে লাগিল। কুলিরা প্রমাদ গণিল—ভয় পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। তিন চারিটি কুলি বাণবিদ্ধ হইয়া আমাদের সম্মুখে ধরাশায়ী হইল। সাহেব বেগতিক দেখিয়া বীরের ন্যায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। কাজেই আমরাও তাঁহার পথানুসরণ করিয়া সুখী হইলাম। তাঁবুতে আসিয়া আমরা এই যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেখিলাম চারিটি কুলি হত ও দুইটি আহত হইয়াছে। সাহেব তৎক্ষণাৎ হেড্ কোয়ার্টারে এই যুদ্ধের বিবরণ টেলিগ্রাম করিলেন যথা—

"আজ এক দল বন্য জাতি অস্ত্র সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আমাদের রসদ লুট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁবু আক্রমণ করিয়াছিল। উহাদের সহিত তিন ঘণ্টা কাল আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই যুদ্ধে আমাদের চারিজন হত ও দুই জন আহত হইয়াছে। শত্রু পক্ষে বহুতর হতাহত হইয়াছে, অবশিষ্ট লোক পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমাদের অপর কিছু ক্ষতি হয় নাই। আমাদের কাজ বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে। আমরা আজ এখান হইতে তাঁবু উঠাইলাম।"

আর অধিক কি লিখিব, এখন এইভাবে আমার কাজ কর্ম্ম চলিতেছে। ম্যান্ডেলে হইতে কখনো কখনো উপযুক্ত প্রহরীবেষ্টিত হইয়া ডাক আসে ও যায়; আমি সেই ডাকে এই চিঠি পাঠাইলাম। তুমি আর আমাকে এখন পত্রাদি লিখিয়ো না, কারণ উহা যথাসময়ে পাইব না। তবে টেলিগ্রাম করিলে তৎক্ষণাৎ পাইব—কারণ ম্যান্ডেলে হইতে প্রত্যহ আমাদের সঙ্গে তারে খবর আদান প্রদান চলিতেছে। মাকে আমার প্রণাম জানাইয়ো ইতি।

তোমার

পুঃ হরিপদ।

বাটীর কাহাকেও আমার এ চিঠি দেখাইয়ো না বা পড়িয়া শুনাইয়োনা, কারণ তাহাহইলে তাহারা আমার জন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন হইবে।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাব

অধুনা মানবসমাজের কল্যাণার্থে যত প্রকার উন্নতিকর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারই প্রধান। শিক্ষাকে প্রধান সহায় করিয়া আজ যে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে উন্নতির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে কতশত বর্ষের সঞ্চিত কুসংস্কার-আবর্জ্জনা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্ঞানের যে প্রখর আলোক দিন দিন দিঙমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, তাহাতে বহুদিনের অজ্ঞানতা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছে। একমাত্র সুশিক্ষার প্রভাবেই যে মানবের সর্ব্ববিধ সুখশান্তি হয়, একথা এখন আর অনেকের অবিদিত নহে। এই শিক্ষা কেবল পুরুষের নহে—শিক্ষা কেবল এক বিষয়ে নহে; সমুদয় বিশ্বের সকল নরনারীকেই বিবিধ বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে।

জীবন ধারণ এবং সংসার পালনের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে মানুষ সংসারে সুখশান্তি লাভ করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তিই যে, সকল বিষয়ে সম্যকরূপে পারদর্শী বা পণ্ডিত হইবেন, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু পণ্ডিত না হইলেও প্রত্যেককেই বহুবিধ বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিতেই হইবে—ইহাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি লক্ষ্য এই যে, স্ত্রীলোকেও পুরুষের ন্যায় নানাবিধবিষয়ের শিক্ষালাভ করিবেন। স্ত্রীপুরুষেয় সম্মিলনে যখন গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তখন স্ত্রীলোককে সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ মনে করা অসঙ্গত নহে। স্ত্রীলোক যখন সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ হইলেন, তখন তাঁহাকে যে বিষয়ে যতটুকু অজ্ঞ ও হীন করিয়া রাখিবে, সমাজও তদ্বিষয়ে সেই পরিমানে হীন হইয়া থাকিবে,—ইহা অতি সত্য, স্বতঃসিদ্ধ কথা। স্ত্রীলোককে বর্জ্জন করিলে যেমন সমাজ থাকিতে পারে না, তেমনই স্ত্রীলোককে শিক্ষা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে সমাজ কখনই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। ইহা বিধাতার অভিশাপ নহে, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফল। অতএব, দেখা যায়, যে সমাজ স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে যতখানি অধিকার দিয়াছে, সেই সমাজ তত অধিক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

আমেরিকা ও ইয়ুরোপ এক্ষণে বহুবিধ বিষয়ে অনেকের আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে; তথাকার স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিষয়ে কিরূপ শিক্ষা ও অধিকার লাভ

করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মহিলারা পুরুষের সমকক্ষভাবে সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করিতেছেন। বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা ব্রতী আছেনই, এক্ষণে আবার ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রণক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এদিকে জাপানও এক্ষণে স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিষয়ে অল্প মনোযোগী নহে। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা পদ্ধতির গুণে তথাকার প্রত্যেক বালিকাকেও ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে যাইতেই হইবে। স্ত্রীশিক্ষার এতাদৃশ সমাদর যে, জাপানের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কারণ একথা কে অস্বীকার করিবে? জাপানে এখন স্ত্রীশিক্ষার এতদূর প্রসার যে, কেবলমহিলা-দিগের জন্যই সেখানে একটিস্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহামনীষী অধ্যাপক জিন-যো-নারুসি জাপানে সর্ব্বপ্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষিতসমাজে চিরস্মরনীয় হইয়াছেন। আর আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবাসী ব্রহ্মদেশের কথা বলি। যদিও ব্রহ্মদেশ আমাদের আদর্শ নহে; তথাপি স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও অধিকার বিষয়ে ব্রহ্মদেশ আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক উদার! ব্রহ্মদেশেরও প্রত্যেক বালিকা শিক্ষার্থে গুরুর নিকট গমন করে। ব্রহ্মদেশের দরিদ্র কৃষককন্যাও লিখিতে পড়িতে ও দ্রব্যাদির মূল্য অঙ্কদ্বারা নিরূপণ করিতে পারে। আর আমাদের জ্ঞানধর্ম্ম সমুন্নত অতীত-গৌরব বিভূষিতা দেশের অনেক মহিলা এক্ষণে কালদোষে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিতা হইয়া সংসার ও সমাজের নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিতা হইয়া অতি দীন ও হীনভাবে জীবন কাটাইতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল তাহাতে হয় ত অনেকের মনে হইতে পারে যে, এ সকল ত বিদেশের কথা। এরূপ বিদেশীয়ভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা ও অধিকার দান এদেশে কখনও ছিল না; এখন আমাদের সমাজের মহিলাগণের এরূপ শিক্ষাদীক্ষায় সংসারে কোনওরূপ সুখশান্তি না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে।

স্ত্রীজাতির শিক্ষার সম্বন্ধে ভারতের কি প্রকার ব্যবস্থা ছিল এখন তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি। সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক যুগে ভারতে অনেক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। মুনি ঋষিগণ যেমন সাংসারিক বহুবিধ কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রপ্রণয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের বিদুষী পত্নীগণও সেইরূপ রন্ধনাদি নানাবিধ

গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়াও স্বামীর সহযোগিনী হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে যেমন স্ত্রীজাতি অনেক প্রকার অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, বৈদিক যুগের মহিলাদিগের এরূপ অনেক বিষয়ে অনধিকার ছিল না। এক্ষণে যে বেদপাঠ শ্রবণেও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, সেই বেদ-শাস্ত্রের অনেক মন্ত্র তৎকালে কোনও কোনও স্ত্রীলোকের দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থাদি পাঠে জানা, যায় যে, জগতের অনেক আধুনিক উন্নত দেশ যখন অশিক্ষা ও অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে হীন অবস্থায় পতিত ছিল, সেই আদিকালেও অনেক ভারতমহিলা জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে ভারত ভূমিউজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। এখনকার ন্যায় সে সময়ের লোকের অন্তরে আত্মযশঃ প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই জীবনের কথা আমরা জানিতে পারি না। তবে যেসকল বিদুষী মহিলা জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিশেষরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এস্থলে আমরা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিতেছি ইনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম পত্নী। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহার উভয় পত্নীকে বিভাগ করিয়া দিতে চাহিলে, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণা বিদুষী মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই সকল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া কি আমি অমর হইতে পারিব?" ইহার উত্তরে যখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "না তাহা হইবে না।" তখন আত্মদর্শিনী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন "যাহা লইয়া আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?' বেদের শিরোভাগ উপনিষদের যে মহাভাব এবং শ্রেষ্ঠশিক্ষা এখনকার পণ্ডিতগণেরও দূরায়ত্ত সেই সার মন্ত্র "যেনাহং নানৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" সর্ব্বপ্রথমে ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। জগতে এমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীব্যক্তি কয়জন আছেন যিনি জ্ঞানবতী মৈত্রেয়ীর ন্যায় দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন"যেনাহং নানৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" আজি যে ভারতে শত শত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক পুরুষ ভক্তিভরে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করেন "অসতো মা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" অর্থাৎ 'অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা

আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাও সর্ব্বপ্রথমে সাধ্বী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল। বিদুষী মৈত্রেয়ীর উচ্চারিত বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া এক্ষণে কত কত পণ্ডিত নিজের উপাস্য দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। কি সার্ব্বজনীন প্রার্থনা মৈত্রেয়ীর হৃদয় হইতে প্রথম উত্থিত হইয়াছিল যাহা কত শত বৎসর ধরিয়া বিশ্বের কত শত সহস্র নরনারী আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সহায় জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইহাকেই বলে যথার্থ বেদমন্ত্র।

বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগেও স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার অপ্রতিহত ছিল। পরে চৈতন্যদেবের সময়েও এই গতি একেবারে রুদ্ধ হয় নাই। গার্গী, দেবহুতী, খনা, লীলাবতী, মীরাবাই, জেবুন্নেসা, রামমণি, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি বিদুষিগণের নাম স্মরণ করিয়া আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, বৈদিক যুগ হইতে বৈষ্ণব যুগ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার একটি অবাধ গতি আমাদের দেশে প্রবাহিত ছিল। পরে নানারূপ সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া এই গতি একেবারে রুদ্ধপ্রায় হয় এবং তদবধি স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও অধিকার বিষয়ে এবম্বিধ সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রীকালাচাঁদ দালাল।

প্রত্যাবর্ত্তন (৭)

বোধ হয় আমি পূর্ব্বেও কোনো স্থানে বলিয়াছি যে, অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে অন্যায় বা নিষিদ্ধ নহে,কিন্তু বিধাতা আমাকে বিষয়-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটি বিশেষ কার্য্য-ভার দিয়াছেন। তাঁহার কথা বলা এবং তাঁহার দিকে মানুষকে ডাকা এইটিই আমার বিশেষ কার্য্য। সমগ্র মন প্রাণ দিয়া এই কার্য্য-সাধন করাই আমার পক্ষে তাঁহার আদেশ। এ কথা আমি জীবনের পরিবর্ত্তনের প্রাক্‌কালে বুঝিয়াও, মধ্যে জীবন-সংগ্রামে স্থির থাকিতে না পারিয়া ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে কিছুকাল কলিকাতায় নন্দরাম সেনের গলিতে থাকিয়া আর একটি বন্ধুর সহযোগে কিছু ব্যবসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই অবস্থায় ১৩০২ এবং ১৩০৩ সালে পশ্চিম অঞ্চলের ওরেয়াঁ নামক স্থানে ঘৃত খরিদ-উপলক্ষে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তখনো জীবনের সেই স্বভাবসিদ্ধ কাজ ভুলিতে

পারি নাই। এখানেও ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া ২।৪টি স্থানীয় লোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা জন্মে। তন্মধ্যে ঈশ্বরীপ্রসাদ নামক একটি যুবকের সহিত আমার অত্যন্ত ভালোবাসা হইয়াছিল। সেই স্থান ত্যাগের পর এই দীর্ঘ কালেও আমি তাহাকে ভুলি নাই। সুতরাং এই চলতি পথে একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে অবশ্য উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হইব এবং ইহা আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি ফাফুণ্ড ষ্টেশনে নামিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাকের এক্কা গাড়িতে ওরেয়াঁ মোকামে গিয়া ঈশ্বরীকে পাইলাম। কিন্তু সাংসারিক নানাবিধ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়িয়া তাহার শরীর মন ভাঙিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। ঈশ্বরীপ্রসাদ আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল এবং যথাসাধ্য আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিল। আমি সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় অযোধ্যাপ্রসাদ নামক আর একটি মহাজন বন্ধু—যিনি আমার কাজের আড়দ্দার ছিলেন, আমাকে পাথেয়স্বরূপ একটি টাকা প্রদান করেন। রাত্রে আমি তাঁহারই নিকটে ছিলাম। ওরেয়াঁ হইতে ফাফুণ্ড ষ্টেশন ৭ মাইল ব্যবধান। টাইম্ টেবল্ ও ঘড়ী দেখিয়া চলিয়া আসিয়াও ৯-৩০ টার ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না। এখন কি করি ভাবিতেছি, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত অতর্কিতভাবে আলাপে প্রকাশ পাইল, তিনি কাণপুরের বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের আত্মীয়। আমি কাণপুর মহেন্দ্র বাবুর বাসায় যাইতে ট্রেণ ফেল করিলাম শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "সেই রাত্রি ৪টা ভিন্ন আপনি এখান হইতে আর কোনো ট্রেণ পাইবেন না,—আপনি আজ আমার বাসায় আহারাদি করিবেন।"

আমি এখানে এতটা সময় যেন স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। অতঃপর রাত্রি ৪ টার সময় ট্রেণে উঠিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ প্রাতে কাণপুর পৌঁছিলাম। এখানে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার সিবিল মিলিটারী হোটেলের অংশীদার, আমি তাঁহার বাসায় সমস্ত দিন থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় একত্রে উপাসনাদি করিলাম। তিনি আমাকে লইয়া আরো কয়েকটি ভদ্র লোকের বাসায় বেড়াইয়া আসিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক গুঢ় কথা বলিলেন। এখানে অনেক কল কারখানা আছে, বাহির হইতে তাহার ২।১টা দেখিলাম মাত্র। এই দিন রাত্রি ১ টার ট্রেণে উঠিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় মহেন্দ্র বাবু ট্রেণ ভাড়ার জন্য আমাকে একটি টাকা প্রদান করেন।

২৭ শে অগ্রহায়ণ প্রাতে এলাহাবাদ আসিয়া প্রথমেই প্রয়াগ-ঘাট চলিয়া গেলাম—যেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল। গঙ্গার উচ্চ তটভূমি হইতে সম্মুখে মুক্ত স্থানের দৃশ্যটি বেশ বোধ হইল। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারার কথা পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে গঙ্গার সাদা জল এবং যমুনার কালো জল,এই দুই ধারাই দেখা গেল। যাহাহউক এখানে স্নানাদি করিয়া এক ছত্রে আহারান্তে একটি ঘাটের উপর আসিয়া বসিলাম। জনৈক পরমহংসের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বলেন,—"আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা করা হইতেছে— কি উপায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু শান্তদিগকে সমবেতভাবে জনহিতকর কাজে নিয়োগ করানো যায়।"

তৎপরে অপরাহ্নে এলাহাবাদ সহরে আসিয়া বাবু রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের বাসায় উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ইন্দুবাবুর সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি বলিলেন,—"সমাজে দুই দিন উৎসব আছে আপনি থাকিয়া যান।" আমি এই কথায় সম্মত হইয়া রামানন্দ বাবুর বাড়িতেই রহিলাম। উৎসবের মধ্যে গান গাহিবার কতকটা ভার আমাকে দেওয়া হইল, কিন্তু প্রথম দিনের আমার প্রথম গানের কোনো একটা শব্দ, কাহারো কাহারো মতে আপত্তিজনক হওয়ায় আর আমার তেমন করিয়া গান গাওয়া হইল না।

তারপর এখানে যে ২।৩ দিন রহিলাম তাহাতে চিত্তের অবস্থা ভালো রহিল না। এখান হইতে আর একবার কাশী হইয়া যাওয়াই আমার ইচ্ছা। ট্রেণ ভাড়া প্রায় সমস্তেরই অভাব, এখানে কাহারো নিকট অভাব জানাইবার একেবারে বাধা বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং এখান হইতে কিরূপে যাইব—এইরূপ একটা ভাবনা আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কাজেই যে দুই দিন এখানে রহিলাম তাহা কষ্টে স্পষ্টেই কাটিল। অনেক চেষ্টা করিয়া অপর ২।৩ জনের নিকট অতি অল্পই সংগৃহীত হইল। তখন হঠাৎ মনে কেমন একটা ভাব আসিল,—একেবারে যাত্রা করিয়া সহর ছাড়িয়া ষ্টেশনে চলিয়া আসিলাম। তখনো ট্রেণ ছাড়িবার এক ঘণ্টার বেশী সময় আছে।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া আমার মনে কেমন একটা ভাব আসিল,—তাঁহাকে বলিলাম,—"আমি কাশী পর্য্যন্ত যাইতে চাই,আমার ॥৵১৫ ভাড়ার অকুলান আছে।" ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিলেন। আমি এই ঘটনায় আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমার আর একটা নূতন বল আসিল।

কাশীতে যখন আসিলাম, তখন রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গিয়াছে। পুনরায় কাশী পর্য্যন্ত আসার প্রথম কারণ—ইহার অধিক ট্রেণ-ভাড়ার অভাব ; দ্বিতীয় কারণ কৃষ্ণবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া।

ইতিপূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতায় বন্ধুবর প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট যাতায়াত করিতাম, তখন তথায় কৃষ্ণবন্ধু নামক একটি যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ; কৃষ্ণবন্ধু সংসারত্যাগী হইয়া কাশীতে বাবু ক্ষেত্রনাথ মল্লিকের অন্নপূর্ণা-মন্দিরে থাকেন। কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিলাম—"তিনি আজো কলিকাতা হইতে আসেন নাই।" যাহা হউক আমি সে রাত্রে অন্নপূর্ণা-মন্দিরেই রহিলাম ;

পরদিন শিবানী দেবীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আবার আমার গান শুনিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,—"যোগীন্দ্র, আমার ইচ্ছা ছিল, অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া তোমাকে খাওয়াই কিন্তু আজ আমার জ্বর বোধ হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "আপনি আর আমার জন্য কষ্ট করিবেন না।" তিনি আমাকে একটি টাকা প্রদান করিয়া তাহা গ্রহন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

৫ই পৌষ বেনারস হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর গাজীপুর শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু নৃত্যগোপাল রায় উকিল বাবুর বাড়ি আসিলাম। (ক্রমশ)

উদ্বোধন

মায়ের গৌরব হয়
যাত্রিগণ সব মহানন্দে ছুটে
মন্দির উৎসবময়।

কেহ আজ ঘরে থেকোনাকো দূরে
মহা নিমন্ত্রণ-বার্ত্তা ল'য়ে দ্বারে
বসন্তের বায়ু বয়।

জগত-জননী ডাকেন সন্তানে,
এস এস সবে মাতৃ-নিমন্ত্রণে,
পাপ তাপ সব দূরে তেয়াগিয়ে
মাতৃ-ক্রোড়ে এস সুনির্ম্মল হ'য়ে ;
এস গো শান্তির ছায়।

ভব পান্থ-বাসে বিভুরে ভুলিয়ে,
মোহের আঁধারে পথ হারাইয়ে,
রিপু-পরতন্ত্রে আত্মহারা হ'য়ে,
শোক যাতনায় বিদগ্ধহৃদয়ে
শান্তি কোথারে হায় !

এস ভাই এস অন্ধ খঞ্জ জন,
দৈন্য-পীড়িত ব্যথিত-জীবন,
পাপ-ভারাক্রান্ত যে জন পতিত,
অনুতাপানলে যে জন পবিত,
পরিত্রাণ এই খানে।

নাহি তো এখানে ভেদাভেদ-জ্ঞান ;
নাহি তো এখানে জাতি-অভিমান ;
ধনী ও দরিদ্র সকলই সমান ;
দূরে ফেলে এস আমিত্বের মান,
এস হেথা বিভু গানে।

এস জগতের সাধক জীবন,
এস বিভুভক্ত সেবক সুজন,
এস কর্ম্মবীর এস ধর্ম্মশূর,
শিল্পী গুণী জ্ঞানী থেকোনাকো দূর,
বিষয়ী তোমারে বরি।

সর্ব্ব শেষে ডাকি তোমারে সন্ন্যাসী,
এস মাতৃভক্ত কারাগারবাসী,
দলিত লাঞ্ছিত ; অপমানরাশি
যতই বর্ষিবে তত মুখে হাসি
জগত-জননী স্মরি।

অন্যায় বন্ধনে আছ যোগাসনে,
আসিতে নারিলে মহা সম্মিলনে,
ভক্তদের সনে প্রেমোন্মত্ত গানে
পূজিতে নারিলে মাতৃ-আরাধনে ;
খেদে অশ্রু পড়ে ঝরি।

কিন্তু কারা হ'তে সুগম্ভীর স্বনে
মর্ম্মভেদী বাণী উঠিছে সঘনে ;—
"দেহ মোর বটে রয়েছে বন্ধনে,
আত্মা মোর আছে ভক্তদের সনে
মায়ের গৌরবে ভরি।"

সপ্ত স্বর্গ হ'তে এস মহাজন,
ব্রহ্ম-সেবক ঋষি রামমোহন,
শ্রীকেশবচন্দ্র, মহর্ষি সুজন,
বিভুভক্ত ঋষি রাজনারায়ণ,
এনেছ নামের তরী।

তোমাদের পুণ্য কাজে বঙ্গময়
নব যুগ আনে নবোৎসাহ হয় ;
এক জাতি বর্ণ এক ভগবান,
জাতীয় তরণী তুলেছে নিশান
সুপ্রভাতে সবে বরি।

খোল খোল দ্বার ওগো পূর্ব্বাসার,
পিককুল সবে দিতেছে ঝঙ্কার,
ত্রিভুবন আজ উৎসবময়,
স্বর্গের উৎসব ধরাতে উদয়
কি সুন্দর আহা মরি!

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

চারঘাটে কি দেখিলাম?

গোবরডাঙ্গার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রায় ৪ মাইল দূরে চারঘাট গ্রাম অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ঠাকুরবার সাহেব ও হরিসাহা" সংক্রান্ত ঘটনার স্থল। ঐ সম্বন্ধে বিচিত্র জনশ্রুতি আছে। তাহার কিছু কিছু সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। এখনো উহার অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু সে বিষয় কিছু বলা আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে।

এ প্রদেশ সমুদ্র-গর্ভ হইতে বনভূমিতে পরিণত হইয়া কালক্রমে যে বাগভূমি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কুশদ্বীপে'সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ—বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর বসবাস। এ প্রদেশের ব্রহ্মোত্তর ভূমি সকল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও চারঘাটে ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ, ১০।১৫ ঘর কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণীর বাস ছিল। এক্ষণে ১০।১২ ঘর ব্রাহ্মণ, ১ ঘরঃ কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বাস আছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি আমি এক দিন চারঘাটে গিয়া শ্রদ্ধেয় সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার বাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আনন্দে দিনযাপন করিয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসি। তথায় উপস্থিত হইয়াই আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল—মনশ্চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ এখানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার দুইটি দিক আছে;—একটি বাহিরের দিক, অপর ভিতরের দিক। বাহ্যভাবে সকলেই দেখিয়া থাকেন—ডাক্তার সতীনাথ একজন চিকিৎসক—পল্লীগ্রামের ভিতর জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসা-কার্য্য করেন। এ অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট পসার; ডাকিলে আসিয়া রোগী দেখেন—ভিজিট লন—কোথাও বা বিনা ভিজিটে দেখেন। নিজগ্রামে ভিজিট লন না। গরীবদিগকে বিনামূল্যে যথেষ্ট ঔষধাদি প্রদান করেন। অনেক লোক তাঁহার বাধ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমি ভিতরের দিক দিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম,—ভগবান্ তাঁহাকে এই পল্লীগ্রামের মধ্যে শত সহস্র লোকের জীবনের দায়ীত্ব দিয়া—তাহাদের সেবা করিবার জন্য তাঁহাকে পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকেই পাঠাইলেন কেন? এ কি তাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় নয়? এমন সেবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বিধাতা তাঁহাকে পুত্র কন্যা দেন নাই—যেন তিনি নিজের ২।১টি ক্ষুদ্র স্নেহাধারে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণমনা—স্বার্থপর না হন, কিন্তু উদার প্রেমে শত সহস্র লোকের পুত্র কন্যাকেই নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় ভালোবাসেন ও অকাতরে সেবা করেন। এটি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ;—হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার প্রভুত্ব,—এ প্রভুত্ব কিসের জন্য? জন সাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য। তাই বলি, আহা! এখানে কি দেখিলাম! ভাষায় কি তাহার বর্ণনা হয়?

গ্রামের রাস্তা ঘাট ভালো না—অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত। গোবরডাঙ্গা পোষ্টাপিস হইতে প্রতিদিন ডাক-পীয়ন যায় আসে। একটিমাত্র পাঠশালা আছে। এখানে সাধারণের শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় হওয়া উচিত। দাস—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

"কুশদহ" তে কতকগুলি মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বিধাতার বিধানে কুশদহ-বাসী, যাঁহাদের সহিত আমরা সুখ দুঃখে জড়িত তাঁহাদের শোকের দিনে নীরব থাকা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাই আমরা মধ্যে মধ্যে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য—এবারে উপর্য্যুপরি কয়েকটি মৃত্যু-সংবাদে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়াছে।

খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দত্ত গত ১১ ই মাঘ কয়েক দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে অসমাপ্ত বিষয় কর্ম্ম এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সন্ততিদিগকে ফেলিয়া তিনি সহসা চলিয়া গেলেন। অনেক সময় বিধাতার এরূপ লীলা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু না বুঝিয়াও অন্য উপায় নাই।

অনেকে হয় তো অবগত নহেন যে, আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের জননী অদ্যাপি জীবিত ছিলেন; তিনিও গত ১৯ শে মাঘ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবত তাঁহার বয়স অশীতিপর হইয়াছিল। ইহাও বিধাতার এক বিচিত্র লীলা মনে হয়।

তৎপরে আর একটি বড়ই শোকাবহ বার্ত্তা প্রকাশ করিতে আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি,—বেড়গুম্ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথের গত অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয়। ২০শে পৌষ শুক্রবার রাজা দেখিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ি যান, ২৪শে মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় জ্বর হয়, রাত্রি ১১ টায় সমস্ত শেষ, এ কী ঘটনা! এ অবস্থায় হৃদিস্থিত ভগবান্ ভিন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কে আর প্রবোধ দিবে?

অবশেষে আর একটি সংবাদ দিয়া এই শোক-কাহিনী শেষ করিতে চাই;—ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয়বন্ধু বাবু যোগেন্দ্রনাথ দত্তের একটি শিশু দৌহিত্রী

(শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ পালের কন্যা) হঠাৎ প্রবল জ্বররোগে দেহত্যাগ করে; তাহাতে ব্যথিত হইয়া যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার অগ্রজ পরম শ্রদ্ধেয় ভগবদ্ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়কে এক পত্র লেখেন। তিনি তদুত্তরে যে কয়েকটি সারগর্ভ অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি —এই জন্য যে, শোকে দুঃখে জ্ঞানীজনের বাক্য কেমন মধুর এবং প্রাণপ্রদ।

"মৃত্যুতে হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, কোনো উচ্চ বিশ্বাস আশ্রয় করিতে না পারিলে চিত্ত বড় অস্থির ও ব্যাকুল হয়। পরীক্ষাতে বুঝিয়াছি, মৃত্যুতে যে কষ্ট তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই কষ্টের পর ভগবানের আশ্চর্য্য বিধি দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁ'র সকল রহস্যের ভিতরে গূঢ় মঙ্গল ভাব নিহিত আছে, যে শোকার্ত্ত হইয়া সেই মঙ্গল ব্যবস্থা বুঝিতে পারে সে দুঃখ পাইয়া আবার সুখী হয়। * * *—সংসারে দুঃখ সহ্য করিতে করিতে তাঁ'র শরণাপন্ন হইতে ও ক্রমে বিশ্বাসী হইতে পারিলেই তাঁ'র দুঃখ দেওয়ার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা লাভ করিয়া মনুষ্য, জীবনের সার বস্তু প্রাপ্ত হয়।"

রাণাঘাট—হবিবপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাধারমণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্য-শরণ সিংহ সাড়ে চারি বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া কৃষি-বিদ্যায় যোগ্যতার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বর-কৃপায় গত ৩ রা ফেব্রুয়ারি (২০ শে মাঘ) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকাতেই উচ্চ পদের চাকরী পাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশের কাজে আপনাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান তাঁহার সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

ইতিপূর্ব্বে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ঘৃতে সাপের চর্ব্বি পর্য্যন্ত মিশ্রিত হয়। এই সংবাদ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং অসম্ভাব্য বিবেচনায়, হাটখোলার প্রধান ঘৃত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং হুগলি কোর্টে এবং অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, এই সংবাদ ভিত্তিশূন্য ভ্রমাত্মক। —আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে,—"কলিকাতার ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতি" শীঘ্র ভেজাল ঘৃতের প্রকৃত তথ্য সাধারণে প্রচার করিয়া ঘৃতের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, কার্য্যটি মহৎ কিন্তু ইহাতে একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন।

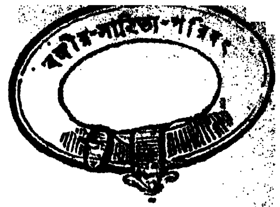


(চিত্র-পরিচয় ;—গোবরডাঙ্গা—জমিদার বাটীর সম্মুখ)

কুশদহ-কার্য্যালয়,

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ২ মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা।



কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

৩য় বর্ষ। চৈত্র, ১৩১৮ ১২শ সংখ্যা

বর্ষ-শেষ

বর্ষ গেল কি পেয়েছি করুণা-নিধান,
তোমার মঙ্গল কার্য্যে কি করেছি দান ?
পেরেছি কি দুঃখে শোকে শান্তি-বারি দিতে,
অনাথার অশ্রুজল পেরেছি মুছা'তে ?
তব প্রেমে হৃদি কি গো হয়েছে বিহ্বল,
পারি নাই—পারি নাই, অক্ষম দুর্ব্বল।
দুঃখী-মুখে হেরেছি কি তোমার বয়ান,
শোকীর ক্রন্দন-মাঝে তোমার আহ্বান ?
শোক-মাঝে দেখেছি কি স্বর্গের আভাষ,
মিলনের মাঝে কি গো তোমার আশ্বাস ?
পেরেছি কি তব কার্য্যে দিতে নিজ প্রাণ,
কঠোর কর্ত্তব্য-মাঝে আত্ম বলিদান ?
পারি নাই—পারি নাই, করুণা-নিধান !
আগামী নবীন বর্ষে কর বল দান।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

ধর্ম্ম লাভের উপায় কি ?

ধর্ম্মলাভের উপায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য ও সমাধি বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল বড় বড় কথা লইয়া আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; আমি ধর্ম্মের তিনটি সহজ কথা লইয়াই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই ঈশ্বর আছেন এই জ্ঞান উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কঠোপনিষদে একটি উৎকৃষ্ট শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই :—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

অর্থ—ইহাকে (ব্রহ্মকে) বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং চক্ষুর দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; যিনি বলেন যে "তিনি আছেন" তাহা ভিন্ন অন্যের নিকট তিনি কিরূপে প্রকাশিত হন ?

একটি কবিতায় আছে :—

"আলোক পাইয়া সবে বুঝিবে সত্যই ভবে
তুমি আছ—ধর্ম্ম আছে তব !"

ঈশ্বর আছেন ইহাই ধর্ম্মের প্রথম কথা। অন্তরে এই বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন, তিনি কিরূপে আছেন ? তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? এ সম্বন্ধেও উজ্জ্বল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সমুদ্র যেমন আপনারই অনন্ত বারিরাশি হইতে কোটী কোটী তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে ; তেমনি জগৎকারণ আপনারই অনন্ত শক্তি হইতে কোটী কোটী প্রাণীকে উৎপন্ন করিতেছেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, তেমনি আমরা সেই অনন্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছি। তিনিই আমাদের প্রাণ, আমরা লক্ষ লক্ষ প্রাণী ; এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের জীবনের ক্রিয়া অনুভব করিতেছি, এই জীবনের মধ্যেই সেই জীবনের জীবন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাত্রিকালে আমরা নিদ্রায় মগ্ন থাকি ; কিন্তু চিরজাগ্রত পুরুষ আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করেন ;

প্রভাতকালে তাঁহারই মায়াস্পর্শে জাগ্রত হই এবং তিনিই আবার আমাদের স্মৃতিকে দিয়া আমাদিগকে ভূষিত করিয়া দেন। তাঁহার সঙ্গেই আমাদের আশ্রয় আশ্রিতের, পিতা পুত্রের ও প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক। এই যে পৃথিবীর স্নেহের বন্ধন,—এই বন্ধন-সূত্র একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাহা অনন্ত কাল থাকিবে। আমরা তাঁহারই স্নেহ-ক্রোড়ে অনন্ত কাল বাস করিব এবং তাঁহারই জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ঈশ্বর ও তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে হৃদয়কে নির্ম্মল ও সংসারের বিকার হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন। আমরা নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-চিন্তা করিলে অন্তরের মধ্যে কি দেখিতে পাই? দেখি মোহ, বিকার, হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং আরো কত রকম জাল জঞ্জাল এই হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। হৃদয় হইতে এই সকল দূর করিতে না পারিলে কেমন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব? অগ্রে যে ঈশ্বর ও তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা বলিলাম ;—সে বিশ্বাসই বা লাভ করা যায় কিরূপে? মোহ বিকার হইতে বিমুক্ত যে নির্ম্মল অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণেই ঈশ্বরের নব নব ভাবের স্ফুরণ হয় ; তখন বিশ্বাসও উজ্জ্বল হয়। সুতরাং হৃদয়কে পবিত্র ও মোহ বিকার হইতে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হইলেও কার্য্যটি বড় কঠিন। হায়, মোহ, বিকার ও পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য, কত স্থানে যে কত ধর্ম্মলাভার্থী ব্যক্তি চোখের জল ফেলিতেছে, সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কত যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত দুর্ব্বল ব্যক্তি মোহ বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া উঠিতেছে - "এ জগতে কোথায় কে এমন গুরু আছে যে, আমাকে মোহ বিকারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারে?"

আমি তো ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার একটিমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়াছি। সে উপায় অন্তরে ঐশী শক্তির প্রকাশ। যখনই মোহ, বিকার ও পাপচিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে চাহিবে, তখনই কাতরস্বরে করুণাময় ঈশ্বরকেই ডাকিতে হইবে,তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিতে হইবে। তিনি প্রকাশিত হইয়া অন্তরে তাঁহার ঐশী শক্তির সঞ্চার করিলেই আমরা সবল হইব এবং মোহ ও পাপের হস্ত হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে পারিব। তখন চিত্ত স্ফটিকের ন্যায়

স্বচ্ছ হইবে এবং সেই স্বচ্ছ হৃদয়ে ঐশ্বরিক ভাবেরও স্ফূরণ হইবে ; সেই সময় অতি স্বাভাবিক রূপেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস লাভ করিতে পারিব।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ঈশ্বরকে প্রভু মনে করিয়া তাঁহারই হস্তে জীবনের ভারার্পণ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলে এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই মঙ্গল বিধাতাই এই জীবনের পরিচালক ; তবে আর তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধা কি ? বাধা যখন কিছুই নাই, তখন নিরন্তর তাঁহার দিকেই কান পাতিয়া থাকিতে হইবে। বিবেক-কর্ণে তিনি যে বাণী প্রকাশ করিবেন, সেই বাণী শুনিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ইহাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ। আমরা ধার্ম্মিক নই ; সেই জন্য ঈশ্বরের হস্তে জীবনের ভারার্পণ করিতে পারি নাই ; ঈশ্বরও আমাদের জীবনের পরিচালক নহেন। আমরা যদি আমাদের মনকে জিজ্ঞাসা করি—হে মন, তুমি কাহার দ্বারা পরিচালিত হও ? মন বলিয়া উঠিবে—আমি আমার প্রবৃত্তির দ্বারা, আমার সুখ-স্পৃহা দ্বারাই পরিচালিত হই। কিন্তু আত্মচিন্তা, আত্মসংযম এবং প্রার্থনার দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ; নচেৎ কিরূপে ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিবে ? এ বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "মাঘোৎসবের উপদেশ" শীর্ষক গ্রন্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কিছুদিন পূর্ব্বে আমার অন্তরে কোনও একটি বিশেষ সুখের জন্য লালসার উদয় হয়। যে সুখটির প্রতি আমার বাসনা জন্মে। তাহার মধ্যে কোন পাপ কামনা বা অবিশুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ দেখিলাম যে, যে কয়েকদিন সেই ইচ্ছা আমার অন্তরে প্রবল রহিল সেই কয়েকদিন আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষ মলিন বোধ হইতে লাগিল ; অর্থাৎ আর দৈনিক উপাসনাতে পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি অনুভব করি না ; যাহা করি, যেখানে যাই, প্রাণটা বিরস বোধ হয় ; দর্পণের উপর জলীয় বাষ্প পড়িলে তাহা যেমন ম্লান ভাব ধারণ করে এবং তাহাতে আর পার্থিব পদার্থের প্রতিবিম্ব যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ কোনও গূঢ় কারণে আমার চিত্তেরও সেই অবস্থা ঘটিল। আর তাহাতে প্রেমময়ের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইলাম না। এই অবস্থাতে আমার অন্তর অত্যন্ত অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। চিত্তের ম্লান ভাবের কারণ কি ? গভীররূপে এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। নগরের কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন উদ্যানে আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলাম। গভীর আত্মানুসন্ধানের পর অবশেষে

একটি মহা সত্য প্রতীত হইল। আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম। যে সুখটি আমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম, সেই সুখের ইচ্ছা করিবার সময় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত কি না—এ চিন্তা মনে উদিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেবলমাত্র স্বীয় আসক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ সুখ কামনা করিতেছিলাম। তখন আমি মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, আচ্ছা ঐ সুখ যে আমার আত্মার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা কে বলিল? প্রভু কি ইচ্ছা করেন ঐ সুখ আমি পাই? সুখ আমি কেন চাহিব? সেবাই যাঁহার লক্ষ্য, সুখ ত তাহার লক্ষ্য নয়। ঐ সুখ দিতে হয় তিনি দেবেন, না দিতে হয় না দেবেন, আমি চাহিব কেন? তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, অবিশ্বাসী নাস্তিকের ন্যায় তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আসক্তির জন্য সুখ কামনা করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মন মলিন হইয়া গিয়াছিল।"

এই উক্তির দ্বারা আমাদের কথাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত না হইয়া শুধু আপনার বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখের কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া হৃদয় প্রেমহীন ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আবার যখনই তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তখনই অন্তরের প্রেম ভক্তি অন্তরে ফিরিয়া আসিল। সুতরাং ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের হস্তেই জীবনের ভারার্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার ইচ্ছা ও বিবেকে প্রকাশিত আদেশবাণীর দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করিতে হইবে।

ধর্ম্মলাভের উপায় সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক বলিয়া লাভ কি? অল্প কথাই যদি কাজে পরিণত করা যায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সরমা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণের সায়াহ্ন। সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সমস্ত দিনই টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। রাস্তা ঘাট কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সহজে

চলিবার যো নাই। আকাশ এখনো ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন, বোধ হইতেছে যেন মুহূর্ত্তে পৃথিবী ভাসাইয়া দিবে। রাস্তায় লোক জন নাই বলিলেই হয়। এমন কি কুলি মজুর পর্য্যন্ত তাহাদের কুটীর ছাড়িয়া আজ পথে বাহির হয় নাই। ক্বচিৎ দু'একটা কুকুর আশ্রয় অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে এই দুর্য্যোগে কেহ বাটীর বাহির হয় না। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঐ আসিতেছে কাহারা—উহারা আমাদের দেশের অভিশপ্ত কেরাণী—পুরাতন ছিন্ন ছত্রে মস্তক ঢাকিয়া, প্রাণসম প্রিয়তম পাদুকাগুলিকে কেহ হস্তে, কেহ কুক্ষি দেশে ধারণ করিয়া অতি সংযতবসনে, ধীর নগ্ন পদে ভগবানের বিচারের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে সেই কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে চলিয়াছে—উহাদের পক্ষে জলঝড় দুর্য্যোগ যেন কিছুই নয়—উহাদের শরীর যেন পাষাণে গঠিত। হায় দুর্ভাগ্য কেরাণী! হায় দাসত্ব!

প্রফুল্ল আজ কোর্টে যায় নাই। সারাদিন বাটীতে থাকিয়া তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে একটি ছাতা লইয়া হরিপদর বাটীর উদ্দেশে পথে বাহির হইল; মনে ভাবিল এখনি ফিরিয়া আসিবে। তখন সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া কালো মেঘের গায় পড়িয়া ধরণীর উপর নিবিড় কালিমা ঢালিয়া দিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া হরিপদর বাটীতে প্রবেশ করিল।

কমলা দালানে দাঁড়াইয়া সবে মাত্র গাল দুটি ফুলাইয়া হস্তস্থিত শঙ্খটির অধর চুম্বন করিতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে প্রফুল্লকে দেখিয়া চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মেনকাকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"মেনু শাঁখটা বাজা তো, আমি তুলসী তলায় সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।" কমলা মনে মনে বলিল—'রূপের কী তেজ! মুখের দিকে চাওয়া যায় না—বিধাতা সার্থক মানুষ গড়েচেন। যেমন রূপ তেমনি গুণ, যথার্থ বন্ধু বটে।'

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিলেন,—"তা বাবা এসেছ বেশ হয়েচে, আমি মনে করছিলুম আজো বুঝি আস্‌তে পারবে না। যে জল ঝড়! পোড়া আকাশ যেন ভেঙে পড়েচে।"

"একদিন না এলে আপনি যে করেন,—সেই জন্যেই এলুম।"

"সত্যি বাবা তোমাকে একদিন না দেখ্‌তে পেলে প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে, তাই কৈলিসীকে দিয়ে ডেকে পাঠাই। কাল আসনি কেন বাবা?"

"কাল মা সর্দ্দি হয়ে শরীরটা বড় ভার হয়েছিল, সেই জন্যে আস্‌তে পারিনি।"

"আজ কেমন আছ বাবা ?"

"ভালো আছি মা।"

"একটু না হয় চা খাও শরীরটা বেশ ঝর্‌ঝরে হবে এখন। বৌমা, একটু চা করে দাও।"

"তা না হয় দিন।"

মেনকা চা ও চিনি আনিতে ছুটিল—কমলা চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"হাঁ বাবা, হরিপদর আর কোনো চিঠি পত্র পাওনি ?"

"না মা এখন তো আর তার চিঠি পত্র পাব না—বিশেষ দরকার হলে বল্‌বেন আমি টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবো।"

"বিশেষ দরকার আর কি—তবে ভালো আছে ত ?"

"ভালো থাক্‌বে না কেন, সে সেখানে বেশ আছে, আপনি অত উতলা হ'ন কেন ?"

"না বাবা তোমাকে পেয়েই আমি তাকে ভুলে আছি, তা না হলে কি আমি দু'দিনও বাঁচতুম ?"

মেনকা চা আনিয়া বলিল,—"পিকু দাদা চা খাও।" কমলা পানের ডিবাটি প্রফুল্লের সম্মুখে রাখিয়া গেল। প্রফুল্ল চা পান করিয়া একটি পান তুলিয়া লইল। মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রফুল্ল বলিল,—"মা, জল এল—আমি এখন আসি।"

"বাপ্‌রে এই জলে কি মানুষ বাড়ির বার হয় ? কৈলিসী তুই গিয়ে বৌমাকে বলে আয় যে, এই জল ঝড়ে বাছা আমার যেতে পারবে না—যদি জল না থামে তো আজ এখানেই থাক্‌বে।"

কৈলিসী তাড়াতাড়ি টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইল—প্রফুল্ল সম্প্রতি তাহাকে এক জোড়া কাপড় দিয়াছিল।

প্রফুল্ল কহিল—"মা এখানে থাকা কি সুবি……"

হরিপদর মাতা কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"বাবা তোমার ঘর তোমার দোর, যে ঘরে তোমার ইচ্ছে সেই ঘরেই থাক্‌বে। বৌমা, ঐ বড় ঘরে বিছানা করে দাও। আর খানকতক গরম গরম লুচি ভেজে দিয়ো।"

কমলা লুচি ভাজিবার জোগাড় করিতে লাগিল—মেনকা বলিল,—"পিকু

দাদা, এক দিন আমাদের থিয়েটার দেখাতে হবে।"

"তা বেশ তো—মা আপনিও যাবেন।"

"আর বাবা, এখন হরিনাম করে মরতে পার্‌লেই বাঁচি - আমার আবার থিয়েটার দেখা। তবে ওদের একদিন দেখিয়ে এনো।"

"যে দিন চৈতন্যলীলা কি প্রহ্লাদচরিত্র হবে সেই দিন আপনাকে নিয়ে যাব।"

মেনকা কহিল,—"তবে আমাদের কবে নিয়ে যাবে পিফু দাদা ?"

"তোমাদেরও সেই দিনে নিয়ে যাব।"

"ঐ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভালো—প্রহ্লাদচরিত্র নয় ?"

"আচ্ছা যে দিন প্রহ্লাদচরিত্র হবে, সেই দিনই তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব কেমন ?"

"তা আমি জানিনে, যে দিন ভালো হবে সেই দিন আমাদের নিয়ে যেয়ো।"

"তাই হবে।"

"আচ্ছা পিফু দাদা, এক দিন আমাদের দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতে নিয়ে যাবে।"

মেনকার মাতা কন্যার প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"মেনু তোর কেমন আক্কেল—তোর পিফু দাদার কি আর কোনো কাজ কর্ম্ম নেই কেবল তোদের হেথায় সেথায় নিয়ে বেড়াবে—বলিস্ কেমন করে ?"

প্রফুল্ল কহিল,—"যে ক'টা দিন এখানে আছে সেই ক'টা দিন একটু হেসে খেলে বেড়িয়ে নিক্—শ্বশুর-বাড়ি গেলে আর কি বাড়ি থেকে বেরুতে পাবে ?"

শ্বশুর-বাড়ির কথায় মেনকার মুখের উপর লজ্জার অরুণ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে কমলার নিকট চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মেনকা ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"পিফু দাদা ওট, ঠাঁই হয়েচে।"

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"তুমি বাবা, রান্নাঘরে গিয়া বস, এক একখানি ভেজে দেবে আর এক একখানি খাবে। আমি এখানে বসে বসে দেখ্‌চি।"

প্রফুল্ল রান্নাঘরে আসনের উপর আসিয়া বসিল। মেনকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা এক একখানি করিয়া পাতে দিতে লাগিল। হঠাৎ একখানি গরম লুচি প্রফুল্লের হাতের উপর পড়িয়া গেল; প্রফুল্ল উহু করিয়া উঠিল—কমলা মৃদুস্বরে বলিল,—"মেনু একটু বাতাস কর হাতটা বুঝি পুড়ে গেছে"—প্রফুল্ল একটু হাসিয়া বলিল,—"এত ঠাট্টাও আপনি জানেন—আমার হাতটা জ্বালা করবে আর আপনি মুখ টিপে টিপে হাস্‌বেন।"

কমলা মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"আহা ফোস্কা হ'ল বুঝি দেখ্ তো মেনু।"

"না ফোস্কা হয় নি তবে আর দু'চার খানা ঐ রকম ভাবে পড়লে যে ফোস্কা না, হবে তার কোনো মানে নেই। আচ্ছা সে দিনকার চুড়ী জোড়াটা আপনার পছন্দ হ'ল কি না তার তো কোনো খবর পেলুম না।"

নতমুখী কমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া মেনকা কহিল,—"সে চুড়ী বৌদির খুব পছন্দ হয়েচে।"

কমলা মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আপনি আমাদের জন্যে আর কিছু আনবেন না।"

"এত বড় অভিশাপটা হটাৎ আমার উপর এসে পড়্ল কেন?" বলিয়া প্রফুল্ল কমলার দিকে চহিল।

কমলা মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"তবে আন্‌বেন।"

প্রফুল্ল সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"মেনু, কাল তোমাদের আঙুলের মাপ দিয়ো আংটী গড়িয়ে দেবো।"

মেনকা পাঁচটি আঙুল দেখাইয়া বলিল,—"পিফু দাদা, কোন আঙুলের মাপ চাই?"

"তা আমি জানি না।"

মেনকাকে একটু লজ্জিতা দেখিয়া কমলা ইঙ্গিতে আপনার নিকটে ডাকিয়া কানে কানে বলিল,—"হাবি কিছু জান না কোন্ আঙুলে আংটী পরে, শ্বশুর-বাড়ি গেলে ঘর করবে কি করে? ঐ দেখ তোমার পিফুদাদার কোন্ আঙুলে আংটী আছে।"

মেনকা একগাল হাসিয়া বলিল,—"ও—বুঝেচি।"

প্রফুল্লকে উঠিতে দেখিয়া "করেন কি একটু বসুন ও ঘর থেকে দুধটা এনে দিই" বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া প্রফুল্লের সম্মুখে রাখিল।

"আমার পেটে আর একটুও যায়গা নাই" বলিয়া প্রফুল্ল উঠিবার উপক্রম করিল।

মেনকা তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল,—"দুধটুকু খেতেই হবে, না খেলে মাকে ডেকে দেবো।"

"আর ডাক্তে হবে না" বলিয়া প্রফুল্ল দুগ্ধের বাটিটি নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল।

তখন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা বাতাস উঠিয়া ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। প্রফুল্ল যখন হরিপদর মাতার নিকটে আসিয়া বসিল তখন তিনি মালা জপিতে জপিতে ঢুলিতেছিলেন।

প্রফুল্ল ডাকিল,—"মেনু!"

মেনকা এক ডিবা পান লইয়া ছুটিয়া আসিল, তাহার পদ-ধ্বনিতে হরিপদর মাতার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রফুল্ল।

মেনকা পানের ডিবাটি প্রফুল্লের হাতে দিয়া তাহার বৌদির কার্য্যের সহায়তা করিতে চলিয়া গেল। কমলা তখন বড় ঘরে প্রফুল্লের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল।

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"খাওয়া হয়েচে বাবা।"

"হ্যাঁ মা হয়েচে।"

"দেখ্‌লে বাবা, জলের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝড় উটেচে—এই জল ঝড়ে তুমি বাড়ি যাবে বলছিলে—তা হ'লে কি আর প্রাণটা আজ থাক্‌তো?"

"তাই তো মা বৃষ্টি ধরে যাবার তো এখনো কোনো সম্ভাবনা দেখ্‌চি না।"

"না বাবা—দেখচ না ক্রমেই বাড়চে?"

মেনকা আসিয়া বলিল,—"পিনু দাদা বড় ঘরে বিছানা হয়েচে।"

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"তবে শোওগে বাবা—কাল সর্দ্দি হয়েছিল আর এই ঠাণ্ডা হাওয়াতে এখানে বসে থেকো না।"

প্রফুল্ল বড় ঘরে চলিয়া গেল।

সারি সারি তিনটি ঘর, প্রথম ঘরে হরিপদর মাতা ও মেনকা থাকে। দ্বিতীয় ঘরটিই বড় ঘর। এই ঘরটিতে হরিপদর পিতা থাকিতেন এখন উহা খালি পড়িয়া থাকে। ইহার পার্শ্বেই কমলার ঘর। সকল ঘরের ভিতরে একটি করিয়া দরজা আছে তাহাতে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়া যায়। দরজা কয়টি সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। সম্মুখে দরদালান।

প্রফুল্ল দেখিল আড়ম্বরবিহীন ঘরটি সাদাসিদা ভাবে পরিপাটিরূপে সাজানো। গৃহের একপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র টেবিল, তাহার উপর কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়া আছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ার—টেবিল ও চেয়ারটি হরিপদর পিতার আমলের অতি পুরাতন কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অপর পার্শ্বে এক খানি পালঙ্ক। এই পালঙ্কের উপর প্রফুল্লর জন্য মল্লিকার ন্যায় শুভ্র শয্যা প্রস্তুত।

দেয়ালের উপর কয়েকখানি পুরাতন জীর্ণ দেব-দেবীর ছবি যেন গৃহটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। একটা ঘড়ি ব্রাকেটে বসিয়া মাথার উপর অবিরাম টিক্ টিক্ করিতেছে। দীপাধারে একটি দীপ জ্বলিতেছে। প্রফুল্ল চেয়ারে বসিয়া পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিল—প্রথম খানি টডের রাজস্থান—ভালো লাগিল না, রাখিয়া দিল আর একখানি লইল—এখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস—নাম দেখিয়াই পুস্তক বন্ধ করিল। তার পর আর একখানি হইল—এখানি বাংলা কবিতা পুস্তক, নাম "কুসুম" নামের নীচেই দুই ছত্র লেখা আছে,—

"বুকে রাখা বিনা জানে কি কুসুম?
কুসুমের সুখ সমীরে ঝরা!"

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর প্রাণস্পর্শী! অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পবিত্র! পুস্তকখানি পাইয়া প্রফুল্লের বড়ই আনন্দ হইল—সে তন্ময় হইয়া উহা পড়িতে লাগিল—যখন তাহার পড়া শেষ হইল তখন ঘড়িতে দশটা বাজিল। প্রফুল্ল প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। একটা চলিত কথায় আছে—"ঠাঁইনাড়া"—ঠাঁইনাড়া হইলে নিদ্রা হয় না। প্রফুল্লেরও তাহাই হইল। স্থানভ্রষ্ট প্রফুল্ল আজ নিদ্রা দেবীর মোহন স্পর্শে বঞ্চিত হইল। সে অলসভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল—কত চিন্তার লহরী তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার চক্ষের পাতায় ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিল না। এমন ভাবে শুইয়া থাকা তাহার অসহ্য বোধ হইল, সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল—তখন ঘড়িটা টুং করিয়া একটি শব্দ করিয়া রাত্রির গভীরতা জানাইয়া দিল। প্রফুল্ল শয্যা ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরজা খুলিল—তখন বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত ঝড় হইতেছিল—একটা প্রবল বায়ু ভীমবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল ঝড়ের দাপট দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধ বায়ু গৃহের জানালা দরজায় ধাক্কা দিল—সেই ধাক্কায় কমলার কক্ষের দরজাটি ঈষৎ খুলিয়া গেল। বলা বাহুল্য এই দরজাটির অর্গল ছিল না। দরজার সম্মুখে একখানি কাষ্ঠের আন্‌লা বসানো ছিল—তাহাতে খানকয়েক কাপড় সাজানো ছিল।

প্রফুল্লের দৃষ্টি সহসা কমলার গৃহের মধ্যে পতিত হইল। সে দেখিল—কমলার মস্তকের নিকট প্রদীপটি এখনো জ্বলিতেছে—সে বুঝি কি একখানা পুস্তক পড়িতেছিল, উহা তাহার একপার্শ্বে পড়িয়া আছে। শ্লথবসনা কমলা গভীর নিদ্রায়

নিমগ্ন। প্রফুল্ল দীপালোকে তাহার সেই বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—আজ আমি এ কী দেখিলাম! এ রূপের তুলনা নাই। এ অতুল রূপরাশি কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, আমি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই চাহি না—চাহি শুধু কমলার ঐ আরক্তিম গণ্ডস্থলে একবার অধর স্পর্শ—একটি চুম্বন! প্রফুল্ল নির্নিমেষ নয়নে কমলার নিদ্রালস শিথিল দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। কে জানে কি বিষ তাহাতে ছিল, সে যেন মোহ-মদিরা-পানে মত্ত হইয়া উঠিল! কে যেন প্রফুল্লকে ডাকিয়া বলিল—মূঢ়, সাবধান হ'! এখনো সময় আছে! কিন্তু হতভাগ্য সে বিবেক-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া এক পদ অগ্রসর হইল। তখনি তাহার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি মারিতে লাগিল—তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল—সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। প্রফুল্ল সরিয়া আসিল। দরজাটি বন্ধ করিয়া নিজের পালঙ্কে আসিয়া বসিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রফুল্ল ভাবিতে লাগিল—আমারো তো স্ত্রী আছে, তবে কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হইল—কমলা আমার প্রাণদাতা বন্ধুর পত্নী—আমি কী পাপিষ্ঠ—নরাধম! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কূট যুক্তি আসিয়া তাহার অন্তরে স্থান পাইল। সে মনে মনে উহার জবাবে বলিতে লাগিল - প্রাণদাতা বন্ধু—প্রাণ কে কাহাকে দিতে পারে? আমার অদৃষ্টে মৃত্যু ছিল না—আমি মরি নাই; হরিপদ উপলক্ষ মাত্র। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই হইবে, কে তাহার অন্যথা করিতে পারে? আমি কে? অদৃষ্টের দাস! অদৃষ্টের তর্জ্জনী-তাড়নায় ঘুরিতেছি ফিরিতেছি! আমার নিজের কোনো ক্ষমতা নাই। ক্রমে কু চিন্তার তাড়নায় প্রফুল্ল ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িল। সে প্রাণের ভিতর শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল আবার উঠিল, ধীরে ধীরে আসিয়া নিঃশব্দে দরজাটি খুলিল। নির্ব্বানো-মুখ দীপ-শিখার সাহায্যে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে সেই শিথিলবসনা কমলাকে সেই ভাবেই দেখিল। পিপাসা বাড়িয়া উঠিল। প্রফুল্ল গৃহমধ্যে দুইপদ অগ্রসর হইল। তাহার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সে তিন পদ অগ্রসর হয়, দুইপদ পিছাইয়া আসে; এইরূপে কম্পিত-কলেবরে উন্মত্ত প্রফুল্ল সেই নিদ্রামগ্না কমলার কপোলে অধর স্পর্শ করিল! প্রফুল্লের স্পর্শে কমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, কমলা প্রফুল্লকে দেখিয়া তেমনি শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের ভিতর

একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—ত্বরিতে বসন সংযত করিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল কি বলিবে কি করিবে সহসা সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না! একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাহার প্রাণটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। কমলার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না—সে একবার প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিল—কী কঠোর সে চাহনী! কী তীব্র তাহার জ্বালা! সে চাহনীতে বজ্রের সহিত বিদ্যুৎ মিশানো ছিল! প্রফুল্ল তখন কাঁপিতে ছিল। যুপ-কাষ্ঠের সম্মুখে ছাগ-শিশু যেমন করিয়া কাঁপিয়া থাকে, পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লও তেমনি করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কমলা মৃদু-গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান। আপনাকে আমি ভালো বলেই জানতুম। এখন দেখচি আপনি রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হ'তে উদ্যত হয়েচেন। আপনি জানেন—উপরে ভগবান বলে' একজন আছেন। তিনিই এর বিচার করবেন। আপনি বিশ্বাসঘাতক—আপনার নরকেও স্থা········"

কমলার কথায় বাধা দিয়া প্রফুল্ল কম্পিতকণ্ঠে দীনভাবে বলিল,—"কমলা, আমি আজ তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়েচি বটে, কিন্তু তার মূল কে? তোমার ঐ অতুল রূপরাশি! আজ যদি তুমি আমার জন্যে এখানে শয্যা রচনা না করতে, দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ যদি তোমার অসামান্য রূপ-লাবণ্য না দেখতুম তা হলে কে বল্‌তে পারে আজ আমি তোমার জন্যে পাগল হতুম! কমলা, আমায় মাপ কর আমি চলে যাচ্চি, একবার বল - তুমি আমার হবে।" প্রফুল্ল কমলার মুখের দিকে চাহিল—সে চাহনিতে কতই কাতরতা, কতই বেদনা, কতই ব্যাকুলতা! তাহার সজল নয়ন দুটি যেন চাহিতেছে একটি ভিক্ষা!—একবিন্দু করুণা!

কমলা রুক্ষস্বরে বলিল,—"আপনি বলচেন কি? আপনি কি সত্যই পাগল হলেন! আমার রূপে আপনি মুগ্ধ হবেন আগে জান্‌লে এ পোড়ার মুখে কালী মেখে শুয়ে থাকতুম।"

"সত্যিই কমলা আমি পাগল হয়েচি—তুমিই আমাকে পাগল করেছ। একবার বল কমলা—তুমি আমার হবে" বলিয়া প্রফুল্ল কমলার পদদ্বয়ে আপনার মস্তক স্থাপন করিল, দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িল।

কমলা পা দু'খানি টানিয়া লইয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিল,—"আপনি এখনি চলে যান বলচি—না যান তো আমি মাকে ডাকি।"

প্রফুল্ল নিমেষ-মধ্যে জামার পকেট হইতে একখানি ছোট ছুরিকা বাহির করিল। প্রদীপের ক্ষীণালোকে তাহার ফলাটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। প্রফুল্ল ছুরিখানি আপনার বক্ষের উপর ধরিয়া বলিল—“কমলা, মাকে ডাক—আমার এই তুচ্ছ প্রাণ তোমার চরণে ঢেলে দিয়ে চলে যাই ” কমলা মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। অতি নম্রভাবে সে প্রফুল্লকে বলিল—“আপনি যার দেহের লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েচেন তাকে বরং ঐ ছুরিতে বধ করুন, সকল আপদ ঘুচে যাক্ !”

প্রফুল্ল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কমলার হাতদুটি ধরিয়া বলিল,—“বল কমলা, তুমি আমার ?”

কমলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—“আপনি এখনি চলে যান—আমার মাথা ঘুরচে।”

“আমি তোমায় বাতাস করচি।”

“আমায় বাতাস করতে হবে না—আপনি চলে যান, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করচে।” কমলা কাঁদিয়া ফেলিল !

প্রফুল্ল কাতরস্বরে বলিল—“কমলা কাঁদ্‌লে তুমি—তোমার চোখে জল—আমার প্রাণটা যে ফেটে যায়—তোমার কী চাই বল—আমি প্রাণ দিয়েও কি তোমার...”কথায় বাধা দিয়া ক্রন্দন জড়িতস্বরে কমলা বলিল—“ক্ষমা করুন, আমি কিছুই চাই না—কেবল মরণ ! আপনি এখন যান আমার বড় কষ্ট হচ্চে।”

“আচ্ছা যাই—কমলা, আমার হবে ?”

নিরূপায় হইয়া কমলা বলিল—“আচ্ছা হব,—”মনে মনে বলিল—“যদি কাল বেঁচে থাকি।”

প্রফুল্ল সানন্দে আসিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

কমলার প্রাণের ভিতর তখন কি হইতেছিল কে জানে—সে শয্যায় পড়িয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রফুল্ল ভাবিল অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে। কার সাধ্য অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করিতে পারে ?

মুহূর্ত্তের পদস্খলনে মানব দানবে পরিণত হয়। হায় ! প্রফুল্ল, কি অশুভক্ষণেই আজ তুমি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে—তোমার অনাবিল হৃদয়ে আজ এ কী কালিমার ছাপ পড়িল? হায় ! রমনীর রূপ কী স্নিগ্ধ ! কী মধুর ! কী ভীষণ! মানব স্বেচ্ছায় সেই রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়া অহরহ পুড়িয়া মরিতেছে।

(ক্রমশ)

অভিভাষণ

২০শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনন্দ সম্মিলনে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত বক্তৃতা

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মত সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকী এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু কিছু যশের খোরাকী প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ্‌খোরাকী বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই ত গেল দিনের খোরাক—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে ত মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগামশোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে সে দালালী আদায় করিয়া লয়। কবি যত বড় কবিই

হউক তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্ত্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং পুরুষটার বালাই থাকে না—তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই ত ঐ দুর্ব্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এই জন্যই ত মনু বলিয়াছেন—"সম্মানকে বিষের মত জানিবে, অপমানই অমৃত।" সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভাল।

আমার ত বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে ত কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগশিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেই-খানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাহাকে আমার অহঙ্কারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায় প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য ত ঘোড়া আর প্রবীনতাই সারথী। সারথীহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি ত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার

সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরম রহস্যময়ী—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্য্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু অবসানের দিনান্ত কালেরও অনন্ত জীবনের পরম রহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কি? অতএব বার্দ্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীন বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এ বয়সেও তরুণেরপ্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাব কিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেককাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই—যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কত বড় আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা শস্তা জিনিষ নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিষটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না—কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুল চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি—তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিষ্ট, তাঁহারা মানসিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে কাছে ঘেঁসিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এই জন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পাড়িয়াছে। যিনি অমরত্ব রথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মাণিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মত সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কষ্টম্ হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্ত গুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান্ দেওয়া গেছে,

তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল ত এই দেখিতেছি, অন্তত প্রাচুর্য্যের দ্বারাতেও বর্ত্তমান কালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে কালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে;—অদ্যকার সম্বর্দ্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারি করিয়া তোলা যায়—যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি,—দর অপেক্ষা দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই সকল ফাঁকি জ্ঞানে-অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে—সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মত করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মত করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক্ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না। আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক

সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুসি করা যায়—কিন্তু সেই খুসিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুসির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ বিদায় তাহাও আমাকে বারবার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনো দিন স্থায়ী কল্যাণলাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরিউপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই ;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এই খানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত মর্ম্মান্তিক ; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এই জন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে, যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন ;—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধূলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্দ্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না। [ভারতী, ফাল্গুন]

প্রত্যাবর্ত্তন (৮)

গাজীপুরের নৃত্যগোপাল বাবু সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা না বলিলে এখানে আসিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বুঝা যাইবে না। যদিও কথাটি বিশেষ তথাপি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোধ হয় একেবারেই অনর্থক নহে।

সংসারে জ্ঞানীজনের সঙ্গলাভ করা একটি সৌভাগ্যের বিষয়। আবার যদি কখনো প্রকৃত ভক্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তবে ভক্ত চরিতের নিষ্ঠাযুক্ত সেবা ভক্তির লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া সেবা শিক্ষা হয়। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন বিবিধ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সম-সঙ্গী সাধকদলের যে এক শ্রেণীকে প্রেরিত প্রচারক আর একশ্রেণীকে গৃহস্থ বৈরাগী আখ্যা প্রদান করেন এবং শেষ জীবনে নবসংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের বাসগৃহ, পরিবার পরিজন, দাস দাসী, আহার বিহার, বিষয় কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান, সাধন ভজনাদি সমস্ত জীবনের একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, সেই চিহ্নিত গৃহস্থ-বৈরাগী দলের মধ্যে নৃত্যগোপাল বাবুও একজন; ইঁহাদের জীবন এক একখানি মূর্ত্তিমান নবসংহিতা বিশেষ। আজ এই ভক্তের গৃহে আসিয়া বুঝিলাম একটি বিশেষ স্থানে আসিয়াছি।

পরদিন প্রাতে আমাকে লইয়া নৃত্যগোপাল বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া, উপাসনা-সমাজগৃহ প্রভৃতি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। স্নানান্তে তাঁহার পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। আমি আজই এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা করি শুনিয়া তিনি কোর্টে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নিজেই আমার অবস্থা বুঝিয়া দুইটি টাকা পাথেয় দিয়া অত্যন্ত যত্ন ও প্রীতির সহিত ঘরের গাড়িতে করিয়া আমাকে ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিলেন।

গঙ্গাপার হইয়া তেরিঘাট হইতে ব্র্যাঞ্চ্ লাইনে বেলা একটার পর দিলদার নগর ষ্টেশনে আসিয়া মেন লাইনে ট্রেণ ধরিলাম। প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের জামাতা আমাকে এখানে দেখিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমার থাকা সম্ভবপর হইল না।

অপরাহ্নে কৈলোরে বাবু ষষ্ঠিদাস মল্লিকের বাসায় আসিলাম। ষষ্ঠী বাবু হিন্দু-সমাজের নমঃশূদ্র শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে আসিয়া কেশব-চন্দ্র প্রমুখ সাধক মণ্ডলীতে আকৃষ্ট হইয়া উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করেন। তাঁহাকে দেখিলে এই কথাই মনে আসে ;—"চণ্ডালঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ," এখন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেও মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে, কৈলোরে ষষ্ঠীবাবুর এখানে প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন অমৃতলাল বসু মহাশয় সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি আসিয়া অমৃত বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু আমার সেই পরিব্রাজক বেশ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন আমি আমার প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া এই ভ্রমণ ব্যাপার সমাধা করিয়া আসিলাম ; তাই প্রথমে একটু তীব্র ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। শেষ কংখল ঘণ্টা কুটীরের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সে ভাব অনেকটা দূর হইল। পরদিন উপাসনা কালীন আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বেলা ১০টার পর আহারাদি করিয়া একত্রেই বাঁকিপুর রওনা হইলাম। তিনি বাঁকিপুর জামাতৃগৃহে গেলেন।

বাঁকিপুরে ডাক্তার কামাখ্যা বাবুর ঠিকানায় আমার নামে পত্র আসিবার কথা ছিল ; আমি প্রথমেই ষ্টেশন ও ডাকঘর সন্নিহিত তাঁহার গৃহে আসিয়া শুনিলাম, আমার নামে একখানি পত্র আসিয়া ডাক পিওণের নিকট আছে। কিছুক্ষণ পরে পত্র পাইলাম ; খুলনা হইতে আমার স্ত্রী লিখিয়াছেন, "চণ্ডীবাবুর স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া কয়েক ঘণ্টা বাদে মারা গেলেন।" সংবাদ শুনিয়া মন বড়ই অস্থির হইল। শীঘ্র ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে হইতে লাগিল।

আজই এখান হইতে যাইতে হইবে, কিন্তু মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাওয়া ভিন্ন অন্য সুবিধা নাই। টাইম টেবল্ দেখিয়া জানিলাম আমার নিকট মোজুত বাদে আর পাঁচ আনা ট্রেণ ভাড়ার অভাব হইবে। একবার সহর বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর কামাখ্যা বাবুর গৃহে কিছু আহার করিয়া যাত্রা কালীন তাঁহাকে ঐ পাঁচ আনা

অভাবের কথা জানাইলাম কিন্তু সে সময় তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণ হইতেছিল, মজুর দিগের মজুরী দিয়া সেদিন তাঁহার নিকট এমন কিছুই ছিল না, যাহাতে আমাকে ঐ সামান্য সাহায্য করিতে পারেন। এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন; আমিও যেন একটু অপ্রতিভ হইলাম। যাহাহউক তখন আর উপায় কি? ষ্টেশনে আসিলাম। রাত্রে অত্যন্ত কম্ কনে শীতে মনে হইতে লাগিল ফিরিয়া যাইব কি? কামাখ্যা বাবুর বাড়ি ঘর ভাঙ্গা—নিতান্ত স্থানাভাব—এখন সহরে যাওয়াও সহজ নয়—কি করি ষ্টেশনে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। রাত্রি দশটার পর ট্রেণ; তখন বোধ হয় নয়টা বাজিয়াছে, এমন সময় একটি মধ্যবিৎ রকমের মুসলমান ভদ্র লোকের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার সহৃদয় ভাবের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে কেমন একটা ভাব আসিল। তাঁহাকে বলিলাম;—"আমার পাঁচ আনা ট্রেণ ভাড়ার অভাব আছে আপনি আমার এই লোটাটা লইয়া উহা দিতে পারেন কি?" তিনি বলিলেন—"সে কি? আপনি এই নিন্—লোটা চাই না।"

প্রাতে মুঙ্গেরে আসিয়া অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। বৃন্দাবনে আলাপী গৌরাঙ্গ বাবুকে সদর রাস্তার উপর তাঁহার ডিস্‌পেন্সেরীতে দেখিতে পাইলাম। তিনিও পুনরায় আমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার পিতা অন্নদা বাবুর সঙ্গে শীঘ্রই বেশ আলাপ হইল। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধ সেবক দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়কে সমাজ-বাড়িতেই দেখিয়া আসিলাম। বাগচি মহাশয় তখন পীড়িতাবস্থায় ছিলেন।

অন্নদা বাবুও যেমন, গৌরাঙ্গ বাবুও তেমন, পিতা পুত্রে আমার প্রতি কতই যত্ন আদর প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমার মন ব্যস্ত হইয়াছে সত্বরভাবে প্রস্তুত হইয়া বেলা একটার মধ্যে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ ভাড়ার জন্য গৌরাঙ্গ বাবুর নিকট ৮০ আনা চাহিয়া লইলাম।

মুঙ্গের হইতে প্রায় অপরাহ্ণে ভাগলপুরে বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আসিলাম। আজ ৮ই পৌষ রবিবার, সমাজে উপাসনায় গেলাম। ষ্টেশনে দেখি আমার প্রতিবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ভায়া এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার। ৯ই পৌষ নিবারণ বাবুর নিকট একটাকা পাইয়া শশী ভায়ার নিকট আর দুই টাকা লইয়া রাত্রির গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

আমার এই প্রায় চারিমাস কালব্যাপী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইখানে শেষ হইল।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে

অশ্রু

অয়ি সাধ্বী পতিব্রতা করুণাকোমল,
তেয়াগি এ মরধরা, পুণ্য পদতল
স্পর্শিল কি রম্য ভূমি—যেই দেশে হায়,
ধরণীর পাপ তাপ পশিতে না পায়!
আঁধারি গোবরডাঙ্গা ছাড়িয়া সকল
গেছ চলি, আজি মোরা ফেলি অশ্রুজল
স্মরি' ও মূরতি তব—লক্ষ্মী-স্বরূপিনী।
বিতরিয়া স্নেহ-সুধা পুণ্য-নির্ঝরিণী,
আজিরে শুকায়ে গেছে আঁধারি' অবনী।
কি কারুণা, স্নেহ, দয়া, নিষ্ঠা দেবতায়!
রোগে জর জর তবু পূজাহ্নিক হায়—
ছাড়োনি দিনেক তরে! অনাথ আতুরে
ক্ষুধায় দিয়েছ অন্ন মাতৃ-স্নেহভরে!
কি সৌজন্য! কি বাৎসল্য! স্মরি' সে সকলে
আজি এ প্রবাসে বসি' তিতি অশ্রু জলে!
বাজা'য়ে মঙ্গল-শঙ্খ দিগঙ্গনাগণ,
সীতা সাবিত্রীর অঙ্কে করেছে বরণ!
সাঙ্গ পুণ্য ব্রত মা গো পূর্ণ মনস্কাম;
"শৈলেন্দ্র" "সরলা"-পাশে লভেছ বিশ্রাম।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

বর্ষ-শেষ

"কুশদহ"র আর একটি বৎসর পূর্ণ হইল। দীন-দাসের পক্ষে আজ আনন্দের দিন। সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া, আজ আমার স্বদেশ-বাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব 'কুশদহ'র পৃষ্ঠপোষক সাহায্যকারী গ্রাহক গ্রাহিকা-গণের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা প্রীতি এবং শুভকামনা প্রকাশ করিতেছি। এত যে বিঘ্ন বিপদ-পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া "কুশদহ"র তিনটি বৎসর গত হইল, সে কেবল একমাত্র ভগবানের করুণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁহার নাম করিয়া কার্য্য করিলে তাহাকে তিনি কখনই প্রত্যাখ্যান করেন না। যে তাঁহার মুখের দিকে চায় তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করেন।

ভগবানের প্রেরণা হইতেই যে "কুশদহ" মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি। যখনই তিনি ইঙ্গিত করিলেন তখনই "কুশদহ" প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাস হইতে ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম বর্ষ পূর্ণ হয়। তৎপরে কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়া, ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে বর্ষ পূর্ণ হয়। এই সময় এই অযোগ্য দাসের শরীর ভগ্ন এবং অর্থাভাবে কাগজ বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। অনেক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু 'তাঁহার' নামে মরা মানুষ বাঁচে, আবার নবীন বর্ষে ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখে তৃতীয় বর্ষ "কুশদহ" বাহির হইল। এত অর্থাভাবের মধ্যেও ভগবানের একান্ত করুণাতেই প্রতি মাসের প্রথম দিবসে কাগজ বাহির হইয়াছে। এজন্য ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী বন্ধুগণ যথেষ্ট সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন। সম্পাদন-কার্য্যে বন্ধুভাবে যিনি যে পরিমাণে ইহার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই দীন দাসের প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই সম্বল নাই; ভগবান তাঁহাদেরও মঙ্গল করুন। আর যে শুভ উদ্দেশ্যে 'কুশদহ' পত্রের জন্ম, ভগবান সেই কুশদহ বাসীর মঙ্গল করুন, দাসের এইমাত্র প্রার্থনা।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

বারাসাত এবং বসিরহাটের মধ্যস্থিত ধান্যকুড়িয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ত্রিশ বৎসরাধিক হইতে এই গ্রামের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইতে হয়। এখানকার রাস্তা ঘাট, উচ্চ ইংরাজি ইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, চতুষ্পাঠী যাহা কিছু সকলই স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউয়ের একান্ত যত্নের ফল। দেশের জমিদারবর্গ এবং প্রধান ব্যক্তিগণ যদি দেশের উন্নতির ঐরূপ কিছু কিছু চেষ্টা করিতেন তবে আজ পল্লীগ্রামের এত দুরবস্থা হইত না।

সম্প্রতি ধান্যকুড়িয়ার নূতন ইস্কুল বাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মাননীয় কলিন্স সাহেব সভাপতি থাকিয়া বলেন,—"দেখা যায় অধিকাংশ ধনিগণ কলিকাতায় থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করেন ও তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন, কিন্তু ধান্যকুড়িয়ার ভূম্যধিকারিগণ সেরূপ নহেন, ***" এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ, (যাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ এখনো দেশের কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন,) এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গাইন মহাশয়গণ এই বিদ্যালয়ের জন্য এ যাবত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

শিক্ষিত সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই প্রায় সহর বাসী; সুতরাং পল্লীর বাড়ি ঘর গুলি জঙ্গলাবৃত ভগ্নাবস্থা। এমন দিনে কাহাকেও দেশের প্রতি আস্থাবান দেখিলে স্বভাবত আহ্লাদ হয়। গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি দেশের বাড়ি-সংস্কার করিয়া উপস্থিত দোল-উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণকে সমারোহ পূর্ব্বক ভুরি ভোজন করাইয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ধীরাজ বাবু বাড়ির নিকটস্থ পুরাতন আমগাছ গুলির মায়া কাটাইয়া অনেকটা জঙ্গল পরিস্কার করাইয়াছেন। যাঁহাদের নিস্ফল পুরাতন বাগানগুলি গ্রাম অন্ধকার করিয়া আছে, তাঁহারা যদি উহা কাটাইয়া নূতন ফলের এবং তরকারি বাগান করেন, তবে তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে এবং গ্রামের স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হইবার সম্ভব।

এবার গোবরডাঙ্গা মিউনিসিসালিটী কয়েকটি প্রধান রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত করিয়া পথের অন্ধকার দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এত অল্প আলোতে 'আলো আঁধার লাগা' নূতন আর একটি অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, আশা করা যায় এ অভাব ক্রমে দূর হইবে।

সম্প্রতি খাঁটুরানিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ আশের কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রক্ষিতের পুত্রের বিবাহ বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর ধনিগণ নিতান্ত নাবালক পুত্রের বিবাহ দেওয়া এবং তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করা যেমন একটি অতীব কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করেন, তৎপরিবর্ত্তে যদি পুত্রের শিক্ষা এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য দায়ীত্ব বোধ এবং অর্থ ব্যয় করিতেন তবে শীঘ্রই সমাজের উন্নতির আশা করা যাইত।

বিনিময়-প্রাপ্ত-পত্রিকাদি

এ বৎসর আমরা বিনিময়ে যে সকল পত্রিকাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিলাম। কিন্তু এতগুলি মাসিকের মধ্যে 'ভারতী', 'দেবালয়' এবং 'তত্ত্ব-বোধিনী' ভিন্ন মাসের প্রথম দিবসে আর কোনো খানি প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। এমন কি মাসের মধ্যেও সকল গুলি বাহির হয় না, কতকগুলি দুই তিন মাস পিছাইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলির সকল মাসের পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ বাংলা মাসিক গুলির এইরূপ অবস্থা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। সহযোগীবৃন্দ এ বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে ভালো হয়। তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিয়মিতরূপে কাগজ বাহির করিতে একেবারেই যে পারেন না, তাহা মনে হয় না। আবার অনেকগুলি দুই মাসের একত্রে বাহির হয়, আমাদের বিবেচনায় ইহাও অত্যন্ত অন্যায়; যখন নাম মাসিক, তখন মাসে একখানি বাহির করাই কর্ত্তব্য।

সপ্তাহিক

১। Unity and the minister, ২। বঙ্গবাসী, ৩। সঞ্জীবনী ৪। বসুমতী, ৫। সময়, ৬। এডুকেশন গেজেট, ৭। প্রসূন, ৮। মেদিনীপুর হিতৈষী, ৯। সঞ্জয়, ১০। ত্রিশূল, ১১।১২। ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদী, (পাক্ষিক)

মাসিক

১৩। ভারতী, ১৪। দেবালয়, ১৫। তত্ত্ব-বোধিনী, ১৬। সুপ্রভাত, ১৭। ভারত-মহিলা, ১৮। অর্চ্চনা, ১৯। প্রকৃতি, ২০। প্রতিভা, ২১। মহাজন-বন্ধু,

২২। জন্মভূমি, ২৩। গৃহস্থ, ২৪। বামা-বোধিনী, ২৫। মুকুল, (ভাদ্র পর্য্যন্ত) ২৬। কোহিনুর, (আশ্বিন পর্য্যন্ত) ২৭। প্রতিবাসী, (অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত) ২৮। যমুনা, (কার্ত্তিক পর্য্যন্ত) ২৯। জাহ্নবী, শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত) ৩০। তাম্বুলী-সমাজ ৩১। মাহিষ্য-সমাজ, ৩২। কায়স্থ-পত্রিকা, ৩৩। সমাজ, ৩৪। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব, ৩৫। প্রচার, ৩৬। বিজয়া, ৩৭। যুবক, ৩৮। তিলি-বান্ধব, (আশ্বিন পর্য্যন্ত) ৩৯। বিজ্ঞান, (জানুয়ারী) ৪০। সোপান, (পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন) ৪১। Calcutta University magazine. ৪২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

প্রাপ্তি-স্বীকার

১৩১৮ সাল—তৃতীয় বর্ষ "কুশদহ"র বার্ষিক চাঁদা, প্রত্যেক নামে প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে পৃষ্ঠায় অনেক স্থানের প্রয়োজন; এজন্য আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, অধিকাংশ গ্রাহকের চাঁদা প্রাপ্ত হইয়াছি। অল্প সংখ্যক যাঁহাদের নিকট বাকি আছে, আশা করি তাঁহারা আপন আপন দেয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া শীঘ্রই প্রদান করিবেন। যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (হাটখোলা) ১০৲, কানাইলাল সেন ৬৲, অশোকচন্দ্র রক্ষিত ২৲, নগেন্দ্রনাথ দে ৩৲, ললিতমোহন নাগ চৌধুরী ২৲, সুরেন্দ্রনাথ পাল ও খগেন্দ্রনাথ পাল ৪৲, নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, পঞ্চাননপাল (কালিপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট) ২৲, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (আহিরীটোলা) ৮৲, নীরোদলাল চট্টোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীমন্ত সেন ২৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় (কাশ্মীর) ৪৲, বিরজাপ্রসাদ রক্ষিত ২৲, শরৎচন্দ্র রক্ষিত ৪৲, যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৲, ভূপেশ্বর শ্রীমানি এটর্ণি ২৲, চার্লস্ এস, প্যাটারসন্ (কলেজ ষ্ট্রীট, Y. M. C. A. ২৲,) পি, এন, বোস স্কোয়্যার ৪ , শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ২৲, কাজী আব্দাল গাফার ডাক্তার ২৲, প্রফেসার মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ২৲, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুর) ৬৲, কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায় (গৈপুর) ২৲, স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ১৲, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় ২৲, গোষ্ঠবিহারী হালদার ২৲, বসন্তকুমার দত্ত ২৲, গিরিন্দ্রচন্দ্র রায় (যশোর) ৫৲, সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৪৲, ডাক্তার সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চারবাট) ৪৲, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শিবদাস কুণ্ডু ২৲